মহানবীর (সাঃ)
মহাজীবন

وإنك لعلى خلق عظيم

আবু জাফর

এই বইটি মহানবী (সাঃ)কে নিয়ে লেখা কোন গতানুগতিক জীবনীগ্রন্থ নয়। এখানে লেখকের দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি একটু আলাদাভাবে প্রতিফলিত। আসলে আধুনিক জীবন ও আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সমস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য মহানবীর (সাঃ) জীবন-যে কত বার বার জরুরিভাবে অবলোকনের বিষয়, সেইকথা মনে রেখেই বইটি যথোচিত মনোযোগ ও মুহাব্বতের সঙ্গে প্রণীত হয়েছে। রাসূল (সাঃ) রাহমাতুল্লিল আলামীন– সমগ্র বিশ্বের আশীর্বাদ ; অথচ কী-বিস্ময়, তাঁর চিরঞ্জীব আদর্শ সর্বদা ও সর্বত্র সগৌরবে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, পৃথিবী-তো বটেই, মুসলিম উম্মাহও আজ ঘোরতরভাবে দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের শিকার। এর কারণ এই নয় যে, মুসলমান তাদের নবীকে (সাঃ) ভুলে গেছে ; কারণ একটাই, এবং তাহলো, দ্বৈপ্রহরিক আহরান্তে 'কাইলুলা' ধরনের কিছু সুন্নাত ছাড়া, তাঁর মহিমান্বিত জীবনের কোন জরুরি-পয়গামই আজ আর জরুরি বলে গৃহীত ও অনুসৃত হচ্ছে না। কোন সন্দেহ নেই, মুসলিম-উম্মাহর সকল জিল্লতি ও যন্ত্রণার প্রকৃত হেতু এইখানেই নিহিত। বর্তমান এই 'মহানবীর (সাঃ) মহাজীবন' বইটিতে এই দিকটিই নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থকারের লক্ষ্য একটাই, মহানবী (সাঃ)এর শাশ্বত সংগ্রামী আদর্শের আলো ও অনুরাগ নিয়ে মুসলিম-উম্মাহ আবার যেন তাঁর হৃতগৌরব ও গরিমা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয় ; অন্তত পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন ও সংকল্প ও হিম্মত যেন জেগে ওঠে।

www.pathagar.com

আবু জাফর দীর্ঘকাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছেন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন দু'হাজার সালে। তাঁর সম্পর্কে একটি যে-কথা অবশ্য-জ্ঞাতব্য তাহলো, '৯৫ সালে হজ্বব্রত পালনের পূর্ব-পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের সঙ্গীতাঙ্গনে নিয়মিত গুঞ্জনরত এক আত্মমুগ্ধ আত্মবিস্মৃত গীতপতঙ্গ। কিন্তু আল্লাহপাকের বিশেষ রহমত, সেই বদনসীব, সেই কৃষ্ণ-গহবর থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেছেন ; এবং আল্লাহর অনুগ্রহপুষ্ট এই মুক্তি এতটাই নিরঙ্কুশ যে, পশ্চাতের সেই কুহক-ভরা অন্ধকার দিনগুলির কথা এখন আর ভাল-করে মনেও পড়ে না। এমকি তাঁর নিজের লেখা ও সুরারোপিত গান, পুরাতন বন্ধুদের স্মৃতি, সবকিছুর উপরই আজ এক নিরতিশয় বিস্মৃতির আস্তরণ। সার্বিক অর্থেই আবু জাফরের এ-এক নবজন্ম। বিশেষ কোন জাগতিক অভিলাষ নেই, আল্লাহপাকের কাছে এখন আবু জাফরের একটিই প্রার্থনা : ঈমানদার অনুগত অনুগ্রহপ্রাপ্ত কৃতজ্ঞ বান্দাহদের তালিকায়, সর্বপশ্চাতে হলেও, তার নামটিও যেন লিপিবদ্ধ থাকে। পৃথিবী নিয়ে কোন ভয় নেই ; কারণ পার্থিব কোন সমস্যা এখন আর আবু জাফরকে আদৌ বিচলিত করে না ; একটিই মাত্র ভয়, অত্যাসন্ন আখেরাতের অনন্ত জিন্দিগীতে অবশেষে কী-হয় না-হয় ! পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জগতে আল্লাহপাকই একমাত্র হেফাজতকারী।

ক্যালিগ্রাফি ও ডিজাইন : আরিফুর রহমান
কালার ক্রিয়েশন ৮৩১৬৫৮৬

www.pathagar.com

মহানবীর (সাঃ) মহাজীবন

আবু জাফর

পালাবদল পাবলিকেশন্স
১১৯/৪ ফকিরাপুল (৩য় তলা)
ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

মহানবীর (সাঃ) মহাজীবন
MahaNabeer Mahajiban

স্বত্ব :
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক :
আবদুস সালাম
পালাবদল পাবলিকেশন্স লিঃ
১১৯/৪ ফকিরাপুল (৩য় তলা)
ঢাকা

পরিবেশক :
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান

প্রকাশকাল :
সেপ্টেম্বর, ২০০২

মূল্য :
দুইশত টাকা মাত্র
Price : $ 10.00

www.pathagar.com

উৎসর্গ :

অশেষ শ্রদ্ধাসহ
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
অধ্যক্ষ মাওলানা কামালুদ্দীন জাফরী
মাওলানা রুহুল আমীন খান
এবং
মাওলানা আবুল কালাম আযাদ-কে।
ইয়া আল্লাহ্,
তোমাকে ও তোমার প্রিয়তম হাবীব-কে
যাঁরা ভালোবাসেন,
আমি তাঁদেরকে ভালোবাসি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা:৭-১২

রাসুল (সাঃ)এর আবির্ভাব ও সমসাময়িক বিশ্বপ্রেক্ষাপট : ১৩ মহানবী (সাঃ) এর জীবন ঃ তিন পর্বের সংক্ষিপ্ত কথা : ২৩ পবিত্র মিরাজ ও মদীনা সনদ : ৭৬ রাসুল (সাঃ)এর জীবন ও সহিষ্ণুতা : ৮২ মহানবীর (সাঃ) জীবন জিহাদী জীবন : ৮৯ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসুল (সাঃ)এর অবদান : ৯৬ সভ্যতার বিপর্যয় এবং রাসুল (সাঃ)এর সমাজ-সংস্কার : ১০৫ আধুনিক রাষ্ট্রগঠনে রাসুল (সাঃ)এর অবদান : ১১০ তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দরতম : ১১৫ মোহাম্মদ (সাঃ) নবী ও বিশ্বনবী : ১২৫ মহানবী (সাঃ) এর কথা ও মর্মকথা : ১৩০ প্রিয়তম নবী ঃ প্রকৃষ্টতম পথ : ১৪৪ রাসুল (সাঃ)এর মোযেজা : ১৫৪ নবী মোহাম্মদ (সাঃ)এর দাম্পত্য-জীবন : ১৭১ মোহাম্মদ (সাঃ) ঃ পূর্ণ প্রস্ফুটিত মানব-প্রসূন : ১৭৯ নবীজীবনের প্রকৃষ্ট পরিচয় হলো আল হাদীস : ১৮৩ রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে আল্লাহপাক স্বয়ং কী বলেন : ১৯১ মহানবীর (সাঃ) সুন্দরতম শতনাম : ১৯৮ প্রিয়তম নবী : সর্বোচ্চ মর্যাদায় তুমি সমাসীন : ২০৭

(পরিশিষ্ট) নবী মোহাম্মদ (সাঃ) ২১৭

www.pathagar.com

প্রাপ্তিস্থান :

পালাবদল পাবলিকেশন্স লিঃ
১১৯/৪ ফকিরাপুল (৩য় তলা), ঢাকা।

আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (নীচ তলা), ঢাকা।

কাঁটাবন বুক কর্ণার
কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেট, ঢাকা।

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
টি এন্ড টি রোড, কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিসমিল্লাহ হিররাহমানির রাহিম। প্রথমেই উল্লেখ করি, 'রাসুল (সাঃ)এর জীবন ও তিন-পর্বের সংক্ষিপ্ত কথা' শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা যদিও এই বইয়ে বিদ্যমান, কিন্তু 'মহানবীর (সাঃ) মহাজীবন' কোন গতানুগতিক জীবনী গ্রন্থ নয়। বর্তমান লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল, বিশ্ব-মানচিত্রে রাসুল (সাঃ)এর যে-অনন্যতা, যে-অপরিহার্যতা ও ধরাপৃষ্ঠে তাঁর আগমনের যে-অবশ্যম্ভাবিতা, তাকেই প্রস্ফুটিত করে তোলা। নিঃসন্দেহে এই কাজ অত্যন্ত দুরূহ। আমি আল্লাহপাকের উপর সর্বাত্মক ভরসা ও নির্ভরতাসহ চেষ্টা করেছি মাত্র; কতটুকু সফল হয়েছি অথবা আদৌ হয়েছি কিনা, আল্লাহপাক জানেন। অবশ্য সাফল্য ব্যর্থতা যেহেতু আল্লাহপাকের হাতে এবং তিনিই যেহেতু চূড়ান্ত বিচারক, বইয়ের গুণাগুণ নিয়ে আমার মধ্যে কোন পেরেশানি নেই। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে আমি-যে তাঁর প্রিয়তম হাবীবকে নিয়ে কিছু লেখার চেষ্টা করলাম, এটাই আমার কাছে বড় কথা। পাঠক নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এই ধরনের কাজে এক সহস্রাংশ সাফল্যও, এমনকি পুরোপুরি ব্যর্থতাও, একটি বিরাট সম্পদ। আর আমরা আল্লাহপাকের জন্য কতটুকুই-বা করতে পারি; যেটুকু-যা করি সেটুকুও-তো তাঁরই দান। আর আল্লাহপাক-তো কারো মুখাপেক্ষী নন; এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস-পরীক্ষকদের মতও নন যে, তথ্য উপাত্তের সমাবেশ দেখে, ভাষা ও বর্ণনার ওজস্বিতা কি নৈপুন্য দেখে মুগ্ধ হবেন। তিনি চান, আল্লাহর ভয়ে ভীত শিরকমুক্ত একটি কৃতজ্ঞ অনুগত অন্তর। এটাই পরীক্ষা; এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মুমেনদের ইহজীবনের সাধনা।

যাই হোক, বহুদিন ধরেই আমার মধ্যে এমন একটি বই তৈরী করার প্রবল ইচ্ছা ছিল, যে-বইয়ে রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে আমার সকল ভাবনা ও ভালোবাসাকে একত্রিত করতে পারি। আল্লাহপাক বড় সদয় ও অনুগ্রহপরায়ন; তিনি আমার ইচ্ছাকে আজ দৃশ্যরূপ দান করলেন। অবশ্য এটা বলা খুবই আবশ্যক যে, রাসুল (সাঃ)এর জীবন ও কর্ম ও চরিত্রের যে-অতলান্তিক গভীরতা, যে-নক্ষত্রচুম্বী মহিমা, তা কোন আলোচনার মধ্যে প্রস্ফুটিত

www.pathagar.com

করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়; আমার মত সদ্যদীক্ষিত নও-মুসলিমের পক্ষে-তো নয়ই। তবুও আল্লাহপাকের কী অশেষ রহমত, আমার এই খোশনসীব যে, সর্বাধিক অক্ষমতা সত্ত্বেও আমি আমার সবটুকু অনুরাগ নিয়ে বর্তমান এই বইটি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছি।

অনেকে আশ্চর্য হন, আমি নিজে-তো হই-ই, আমার দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) ও তাঁর দ্বীনের এতসব কথা লেখা সম্ভব হয় কী-করে? এক্ষেত্রে আমার না-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আছে, না তেমন ইল্‌ম, না আল্লাহতায়ালার বুজুর্গজনের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঘনিষ্ঠতা ও ওঠাবসা। এসব কিছুইতো নেই। আসলে বার বার শুধু উল্লেখ করতে হয়, এটা নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহপাকের অভিপ্রায় ও রহমত। নাহলে আমার-তো লেখার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথ কি জীবনানন্দ কি ন্যাড়ার-ফকির লালনকে নিয়ে কোন বই; আগে-তো এইসবই লিখতাম। আল্লাহপাক স্বীয় অনুগ্রহে আমার চক্ষু ও হৃদয় থেকে সেই সকল কুহক ও কুজ্ঝটিকার আবরণ সরিয়ে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

ইসলামে প্রবেশের পর আমি মাঝে মাঝেই একটি খুব স্বাভাবিক প্রশ্নের সম্মুখীন হই যে, আমি হঠাৎ কী-কারণে আমার বহুদিনের অভ্যস্ত সঙ্গীতকেন্দ্রিক জীবনকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করলাম। এ-প্রশ্ন আমার নিজের কাছে নিজেরও। অবশ্য আল্লাহপাক কোন কারণ ছাড়াই তাঁর নিজ পবিত্র খেয়ালে যাকে যখন ইচ্ছা সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারেন। অতএব কোন কারণ নয়, আল্লাহপাকের অভিপ্রায়ই আসল কথা। তবু এক ধরনের মানবিক কৌতূহলবশত আমি বার বার অনুসন্ধান করি, আল্লাহপাক কেন তাঁর এই নগণ্যতম বান্দাহকে এত অসীম অনুগ্রহদানে ধন্য করলেন, বাধিত করলেন! দুটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পাঠরত আমার এক ছাত্র খ্রীস্টান হয়ে যায়। আমি তাকে ডেকে এ-বিষয়ে জানতে চেয়ে বললাম, 'তুমি- কি ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানো না? তোমার এই দুর্গতি হলো কেন'? সে খুব আস্থার সঙ্গে বললো, 'আমি মাদরাসা থেকে কামিল পাশ; যথেষ্ট জেনে বুঝেই খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি'। বুঝলাম, আমার এই ছাত্রটি প্রকৃতই ইবলিস; এবং বললাম, 'ইবলিসও জেনে-বুঝেই ইবলিস হয়েছে এবং ইবলিসও কামেল পাশ ছিল'। ছেলেটি কথায় কথায় রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে একটি গুরুতর কটুক্তি করে বসলো। আমি তাকে তার কিছু সহপাঠীকে সাক্ষ্য রেখে বললাম, 'এই কথা তুমি যদি দ্বিতীয়বার কখনো আমার সম্মুখে উচ্চারণ করো, With all the risk আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করবো'। সেই শেষ, তারপরে তাকে আর কখনো দেখি নি। শুনেছি, মুস্তাফিজ নামের এই মুরতাদ যুবকটি এখন খ্রীস্টানদের কোন খোঁয়াড়ে চাকুরি করে দিনাতিপাত করে। এই একটি ঘটনা।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো '৮৯ সালের। উইলিয়াম এ.ডিপ্রি তখন বাংলাদেশে মার্কিন

www.pathagar.com

এ্যামবাসাডর। খুলনার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক জনাব এ.ইউ. আহমেদ-এর মধ্যস্থতায় তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা তৈরী হয়। এবং সেই ঘনিষ্ঠতা স্বল্প সময়েই এত ঘন ও প্রগাঢ় রূপ ধারণ করে যে, তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমাদেরকে নিয়ে তাঁর গৃহে আমাদের জন্য একটি বড় মাপের উঁচু মানসম্পন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়াই ছিল ডিপ্রি সাহেবের মূল উদ্দেশ্য। আমি খুবই অভিভূত এবং এক ধরনের আত্মশ্লাঘায় মুহ্যমান। কিন্তু সমস্যা হলো, যে ব্যক্তি এত কিছু করছেন, তাঁর জন্য কী-উপহার নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া যায়। অনেক ভেবে স্থির করলাম, লালন ফকিরের একটি পোট্রেট নিয়ে গেলেই যথাযথ হবে, সুন্দরও হবে। অতএব কালক্ষেপ না-করে লালনের একটি রৌপ্যনির্মিত প্রতিকৃতি সংগ্রহ করলাম। কিন্তু কী-যে হলো, মনের মধ্যে একটি তীব্র অপরাধবোধ জেগে উঠলো। কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না, যে-কোন ধরনের মূর্তি ও প্রতিকৃতি সম্পূর্ণরূপে হারাম; আর সেই রকম একটি কুৎসিত নিষিদ্ধ বস্তু আমি নিজে হাতে কাউকে উপহার দেব! মনে হচ্ছিলো, বেশি হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন হবে না, জাহান্নামে প্রবেশের জন্য পাথেয় হিসাবে এটাই যথেষ্ট হবে। আল্লাহপাক অনুগ্রহ করলেন, ভয়ে ভয়ে অনেকটা ক্ষতিস্বীকার করেও আমি রূপোয়-গড়া লালনের সুদৃশ্য পোট্রেটখানা নির্মাতাকে ফিরিয়ে দিলাম। তারপর স্বরচিত চার লাইনের একটি ইংরাজী কবিতা বাঁধিয়ে নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। ডিপ্রি খুব আনন্দিত হয়ে তাঁর মার্কিনী উচ্চারণ শৈলীতে যখন কবিতাটি মাইক্রোফোনে সবাইকে আবৃত্তি করে শোনালেন, আমার হিল্লোলিত মন তখন তৃপ্তির আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ। সঠিক বলা সম্ভব নয়, তবে একটু একটু ধারণা হয়, এই দুটি ঘটনার কারণেই হয়ত আল্লাহপাক স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর এই নগণ্যতম বান্দাহকে সব অনুচিত আকর্ষণ তুচ্ছজ্ঞান করবার তওফিক এনায়েত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

বিনীতভাবে উল্লেখ করি, এই ধরনের বই লিখতে হলে পবিত্র কোরআন হাদীস-সহ রাসুল (সাঃ)এর জীবনী ও সমসাময়িক ইতিহাস গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা অত্যন্ত জরুরি; আমি যথাসাধ্য সেই চেষ্টা করেছি। কোথাও কোন অসুবিধা হলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবুল কালাম পাটোয়ারি এবং অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম আমাকে সাহায্য করেছেন। তবু ভুলবশত, অসতর্কতাবশত এবং ইল্‌ম ও জ্ঞানবুদ্ধির অপ্রতুলতাবশত কোথাও কোন গুরুতর তথ্যপ্রমাদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ-রকম তথ্যবিভ্রাট চোখে পড়লে পাঠক যদি আমাকে অবহিত করেন, আমি বিশেষভাবে বাধিত হবো।

নানা ধরনের সুখ দুঃখ নিয়ে আমার জীবন। বিশেষ করে, আমার অতীত জীবনাচারকে ঘৃণাভরে পুরোপুরি ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করার পর, আমার জীবনে কিছু জাগতিক সমস্যা ও সংকট ও নিঃসঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছে। কখনো ভাবি, এটা আমার প্রাপ্য দণ্ড; কখনো মনে

www.pathagar.com

হয় পরীক্ষা। আল্লাহপাক আহকামুল হাকিমীন, অতএব পরীক্ষাই হোক আর অবশ্যপ্রাপ্য দন্ডই হোক, প্রভু পরওয়ার-দিগারের নিকট থেকে যা-আসে, তাকে পরম ধৈর্যে ও পরম আনুগত্যে গ্রহণ করাই বান্দাহর কর্তব্য। তবু এইকথার মধ্যে একটু একটু কষ্ট ও অভিমানের নিশ্বনও হয়ত শোনা যাচ্ছে; কিন্তু না, আল্লাহপাকের এতই অফুরান রহমত যে,আমার সমস্যাগুলিই আমার ঐশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার আপাত-নিঃসঙ্গতা পূর্ণ হয়ে উঠেছে আমার মহান প্রতিপালকের অপার অফুরন্ত করুণাধারায়। বুঝতে পারি, নিঃসঙ্গতাও কত মধুর সঙ্গময় হয়ে ওঠে! আল্লাহপাকের কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে, তিনি তাঁর এই নগন্য বান্দাহকে এমন এক হিল্লোলিত রোমাঞ্চকর জীবন দান করেছেন, যেখানে দুঃখ নেই উদ্বেগ নেই, আল্লাহর ভয় ছাড়া কোন ভয়ও নেই। এখন বুঝতে পারি, আগে যা-চেয়েছি, সেই খ্যাতি ও অর্থের আকাঙ্ক্ষা ছিল কতই না অসার; যা এমনকি বৃটেন-আমেরিকার অনেক চতুষ্পদ গৃহপালিত প্রাণীও অক্লেশে অর্জন করে থাকে। অনেকের মনে আছে, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের ঘনিষ্ঠ সফরসঙ্গী হয়ে কর্ণেল পদমর্যাদার একটি কুকুর এসেছিল, যাকে দেখে মার্কিনী ক্যাপ্টেন ও লেঃ কর্ণেলরা স্যালুট প্রদান করে কিনা জানি-না, তবে এখানে পাঁচ তারকা সোনার গাঁ হোটেলে তার জন্য সুসজ্জিত কক্ষসহ অত্যুচ্চমানের আপ্যায়নের সুবন্দোবস্ত ছিল। অর্থাৎ কুকুরও পাঁচ-তারকা হোটেলে থাকে, বিদেশ ভ্রমণ করে, উঁচুপদে চাকুরিও করে। অথচ এইগুলিই আজ আধুনিক মানুষের সার্বক্ষণিক স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ধিক আধুনিক সভ্যতা, ধিক আধুনিক মানুষের জীবন-উপলব্ধি!

অনেকের মুখে অনেক সময়ই এইকথা শুনতে পাই যে, আমার লেখা ভাষাগতভাবে একটু বেশ দুরূহ, যা অপেক্ষাকৃত সহজ হলে ভালো হতো। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য, বাক্যগঠনে আমি যদিও একটি নিজস্ব শৈলী রক্ষা করি, কিন্তু সেটা আদৌ জটিল কিছু নয়। আমাদের পরিচিত বাকভঙ্গির সঙ্গে তার খুব একটা দূরত্ব নেই। আসলে অনেক পাঠকের যেখানে অসুবিধা হয়, সেটা হলো আমার শব্দ-ব্যবহার। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ঋষভ' এবং 'বলদ' শব্দদুটির অর্থ একই, কিন্তু আমি 'ঋষভ' ব্যবহার করি। করি এইজন্য যে, 'বলদ' বললে যে-একটি স্থূল গালির ভাবটা ফুটে ওঠে, 'ঋষভ'-এর মধ্যে সেই ভাবটা নেই। এবং ঠিক একই কারণে 'মিথ্যাবাদী'র পরিবর্তে আমাকে 'অনৃতভাষী' লিখতে হয়। অনুমান করি, এইরকম কিছু অপ্রচলিত শব্দ-ব্যবহারের কারণেই কিছু পাঠক একটু সমস্যাগ্রস্ত হন। কিন্তু এক্ষেত্রে করবার কিছু নেই, কারণ লেখার মধ্যে শুধু বক্তব্যই থাকে না, বক্তব্যের সঙ্গে লেখকের তৈরী একটি নিজস্ব শৈলী ও ভাষাগত আবহও থাকে, যা-থেকে সহজতা ও সহজবোধ্যতার প্রয়োজনে বেরিয়ে আসা সম্ভবও নয়, সমীচীনও নয়। অতএব পাঠক যদি একটু সহানুভূতিশীল হন, আমি মনে করি, তাহলে বিশেষ আর কোন সমস্যা থাকে না।

www.pathagar.com

যাই হোক, মহান আল্লাহপাকের রহমতে আমার সৌভাগ্য যে, স্বল্পসময়েই আমার প্রতি আগ্রহী ও অনুরাগী একটি ছোটখাটো পাঠকগোষ্ঠী তৈরী হয়েছে; যে-কারণে অনেক পাঠকই আমার যে-কোন রচনার প্রতি মনোযোগী ও প্রীতিপ্রবণ হয়ে ওঠেন। আমার পূর্ব-প্রকাশিত তিনটি বইয়ের ক্ষেত্রেই পাঠকের এই প্রীতি সমানভাবে অনুভব করেছি। আশা করি, আল্লাহপাকের ইচ্ছায় বর্তমান বইটিও পাঠকের প্রীতি থেকে মাহরুম থাকবে না।

বর্তমান বই সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো দু'একটি কথা বলি। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই বইয়ের সব লেখাই 'মাসিক পৃথিবী' এবং 'পাক্ষিক পালাবদল'-এ ইতিপূর্বে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। পত্রিকা-দুটির সম্মানিত সম্পাদকদ্বয়কে আমি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বইয়ের পরিশিষ্টে যুক্ত একটি অনুবাদকর্ম-সহ আরো দু'একটি লেখা আমার 'তুমি পথ প্রিয়তম নবী তুমিই পাথেয়' বই থেকে গৃহীত হয়েছে। রাসুল (সাঃ)কে নিয়ে আমার সকল কথা ও ভাবনার সামগ্রিক ও ঐক্যবদ্ধ গ্রন্থনার জন্য এই গ্রহণ অপরিহার্য ছিল। যাই হোক, অনেকের অনেক ভালোবাসা ও সপ্রীতি সহযোগিতার দৃশ্যরূপ এই বই। উল্লেখ করি, 'পাক্ষিক পালাবদল'-এর সম্পাদক আলহাজ্ব আবদুস সালাম শুধু বর্তমান বইয়ের ক্ষেত্রে নয়, আমার সকল লেখালেখি ও তৎসন্নিহিত সুবিধা অসুবিধার ক্ষেত্রে যে-সার্বক্ষণিক সহায়তা ও প্রীতিদানে বাধিত করেছেন, তা অমূল্য। আহসান পাবলিকেশন-এর স্বত্বাধিকারী জনাব গোলাম কিবরিয়া এবং কাঁটাবন বুক কর্ণার-এর মালিক জনাব রফিকুল ইসলাম সরদার আমাকে নানাভাবে অনেকদিন থেকেই নিঃস্বার্থ সহযোগিতা করে চলেছেন; আমি তাঁদের কাছে গভীরভাবে ঋণী। আমার লেখার ক্ষেত্রে আমি যাতে স্বাচ্ছন্দ্য পাই ও উপকৃত হই এই ভেবে, কুষ্টিয়া শহরের একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতিমনস্ক ধর্মপ্রাণ মানুষ জনাব বাশার এবং রেডিও বাংলাদেশ-এর অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক আমার এক বড় ভাই জনাব এ.কে. মোহাম্মদ আলী আমাকে অনেক মূল্যবান বই দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করেছেন। মাশরিকী জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজার আমার বন্ধু আলহাজ্ব কাজী আবদুল্লাহ হারুনও আমাকে প্রয়োজনীয় অনেক বই উপহার দিয়েছেন। এই তিনজন উদার ও মহৎপ্রাণ শুভানুধ্যায়ীর ভালোবাসা না-পেলে এই গ্রন্থ আমি আমার মনের মত করে প্রণয়ন করতে পারতাম না। আর একজন মানুষ জনাব মোহাম্মদ আসাফউদ্দৌলাহ। দৃশ্যত কিছু করুন না-করুন, এটা আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া খুবই অসম্ভব যে, তার ভালোবাসা আমাকে সততই গোপনে গোপনে প্রাণিত করে। বিশেষ করে এই ধরনের গ্রন্থরচনার প্রথম প্রবেশমুখে তিনি-যে আমাকে সাহস ও সহায়তা দান করেছিলেন, সে-কথা মৃত্যুকাল পর্যন্ত মনে থাকবে। মাশরিকী জুট মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব খন্দকার রইসউদ্দিন আহমদ-এর কথাও বিশেষভাবে স্মরণ করি; তিনি বরাবরই আমার কাজে এমন সপ্রীতি আগ্রহ ও কৌতূহল রক্ষা করে আসছেন, যা আমাকে খুবই সাহস জোগায়

www.pathagar.com

ও অবিচল রাখে। এতদ্‌সঙ্গে আমার আরো যে-কতিপয় বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীর কথা উল্লেখ করতে হয়, তাঁরা হলেন প্রাক্তন এমপি জনাব আবদুল ওয়াহেদ, জনাব নূরুল ইসলাম খলীফা, অধ্যাপক তোহুর আহমদ হিলালী, মেজর লিয়াকত, হাফেজ মাওলানা মোস্তফা কামাল এবং আমার স্নেহভাজন সুজাউদ্দীন জোয়ার্দার। নানাভাবে নানা কারণে এঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী। আমার এই ধরনের কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হলে আমার ছেলেমেয়েরা সবাই খুব আনন্দিত হয়; তাদের এই আনন্দ আমার জন্য আল্লাহপাকের একটি রহমত ও প্রেরণা। বস্তুত, অনেক মানুষের অনেক মমতা ও ভালোবাসাই জড়িয়ে আছে আমার এই বইটির সঙ্গে। দোয়া করি, আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে সার্বিক কল্যাণ দান করুন।

যাই হোক, বইটি লেখা হলো, একভাবে প্রকাশিতও হলো; কিন্তু এটা আসল কিছু নয়। আসল কথা হলো, আল্লাহপাকের ক্ষমা ও অনুগ্রহ। অতএব আকুলচিত্তে আমার সেই মহান প্রভু ও প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা জানাই, হে আমার প্রতিপালক, আপনার ক্ষমা ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত কৃতজ্ঞ বান্দাহদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিন; আখেরাতের সেই ভয়াবহ দুঃসময়ে আপনার সন্তুষ্টির ছায়াতলে আশ্রয়লাভের নসীব এনায়েত করুন। আপনার ভাষাতেই আপনার কাছে প্রার্থনা করি : 'রাব্বানা লাতুজিগকুলুবানা বাদাইজ হাদাইতানা ওয়াহাব্‌লানা মিল্‌লাদুন্‌কা রাহমাহ্‌ ইন্নাকা আন্‌তাল ওয়াহ্‌হাব' হেদায়াত ও পথপ্রাপ্তির পর আবার যেন আমরা ভ্রান্তির কুটিল আবর্তে নিক্ষিপ্ত না-হই; আবার যেন শয়তানের মনোরম হাতছানিতে আমরা অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হয়ে না-পড়ি। আল্লাহ হাফিজ।

আবু জাফর
১০৯ এস. বি.রোড, কুষ্টিয়া
জুন,

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ)এর আবির্ভাব ও সমসাময়িক বিশ্ব-প্রেক্ষাপট

এক.

রাসূল (সাঃ)এর জন্ম ষষ্ঠ শতাব্দীর তৃতীয়-পাদের একেবারে শেষদিকে (৫৭০ খ্রীঃ)। হযরত ঈসা (আঃ)এর পর দীর্ঘ প্রায় সাড়ে-পাঁচ'শ বছরের মধ্যে আর কোন নবী আসেন নি। আল্লাহ্‌র রাসূল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)ই সর্বশেষ নবী। অবশ্য কেন তিনিই সর্বশেষ, অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থাকতে, কেন তাঁকে প্রায় ইতিহাস ও ঐতিহ্যরিক্ত একটি ঊষর মরুদেশে পাঠানো হলো, কেন এ-রকম একটি এতীম, অসহায় ও নিরক্ষর মানুষকে আল্লাহ্‌পাক নির্বাচন করলেন, এ-সকল প্রশ্ন, প্রশ্ন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ-সব একেবারেই ইবলিসী প্ররোচনা। কারণ আল্লাহ্‌পাকের নির্বাচন ও সময়জ্ঞান নিয়ে, হিকমত নিয়ে যে-কোন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা শুধু মূর্খতা নয়, রীতিমত কুফরি। কোন সন্দেহ নেই, তিনি যথাসময়ে ও যথাস্থলেই তাঁর প্রিয়তম হাবীবকে প্রেরণ করেছেন। তবে আল্লাহ্‌পাক যেহেতু তাঁকে পরিপূর্ণ হেদায়েতের আলোকবর্তিকা দিয়ে সমগ্র বিশ্বমানবের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য পাঠিয়েছেন, সর্বাত্মক আনুগত্য নিয়ে তাঁকে মান্য ও অনুসরণ করা যেহেতু ফরজ, কৌতূহল নিবারণার্থে তাঁর সমসাময়িক সময় ও বিশ্বকে কিছু পরিমাণে হলেও অবলোকন ও অনুধাবন করা অপরিহার্য।

যাই হোক, যে আরবদেশে রাসূল (সাঃ)এর জন্ম সেই দেশটির তখন বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্যতাই ছিল না। থাকার কথাও নয়, কারণ ভৌগোলিক আয়তনে যত বিশালই হোক, বহির্বিশ্বের কাছে আরব নিতান্তই একটি বিশুষ্ক বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এখানে যারা বাস করে তারা অধিকাংশই ভ্রাম্যমান বেদুঈন। অধিকাংশেরই উপজীবিকা পশুপালন এবং কখনো কখনো রাহাজানি। কিছু মানুষ সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল; কিন্তু কিছু মানুষ আবার এমনও ছিল, যারা দূরাগত কাফেলা লুটপাট করে সংসার নির্বাহ করতো। অবশ্য পবিত্র কাবাগৃহের কারণে মক্কার একটি আলাদা মর্যাদা ছিল; এবং এটাও সত্য, এই নগরী ও নগরতলীর অধিবাসীরা বংশ ও গোত্রগত বিভেদ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও একটা মোটামুটি স্থিতিশীল জীবনযাপন করতো। মক্কা থেকে বেশ দূরে ইয়াসরিব, যার পরবর্তী নাম মদীনাতুন্নবী, ইয়েমেন এবং মক্কার অদূরবর্তী তায়েফ এলাকা ছাড়া সমগ্র আরবে তখন উল্লেখ করার মত উর্বর অঞ্চলই ছিল না। অনেকটা সত্য, প্রাকৃতিক এই রুক্ষতা ও অবাসযোগ্যতার কারণেই আরবদেশের প্রতি বহির্বিশ্বের দৃষ্টি তখন আদৌ আকৃষ্ট হয় নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ইয়েমেন, ইয়েমেন তখন পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন। আর যে-কোন কারণেই হোক খেজুর ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের মত কিছুটা উর্বরতা থাকা সত্ত্বেও মদীনাও ছিল বহিঃপ্রভাবমুক্ত। নিজেদের মধ্যে নানা

www.pathagar.com

গোত্রগত দ্বন্দ্ব ছিল এবং এখানে কুসীদজীবী ইহুদিদের এক ধরনের প্রভাব ও শোষণও কার্যকর ছিল, কিন্তু কোন বহিঃশক্তির কোন আধিপত্য ছিল না। অর্থাৎ পর্বতময় মরুবিস্তৃত এই অনুর্বর বিশাল আরব ভূখণ্ডের প্রতি বহির্জগত ছিল উদাসীন। অবশ্য শুধু আগ্রহ বা উৎসাহেরই অভাব নয়, সাহসেরও অভাব ছিল। কারণ অতীতে এমন দু'একটি বিপজ্জনক ঘটনা এই মক্কা ও মদীনাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে, যা থেকে বাইরের কোন আগ্রাসী শক্তি আরবে অভিযান চালানোর ক্ষেত্রে তেমন সাহস ও উৎসাহ পায় নি। মক্কার দিকে আগ্রাসন চালানো যে কত বিপজ্জনক, আবরাহা তার, সর্বশেষ উদাহরণ। ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা একবার হঠকারিতা দেখিয়ে তার হস্তিবাহিনী ও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কেমন চর্বিত তৃণের মত ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল, সে ইতিহাস আমাদের জানা। আসলে এটা বরাবরই মহান আল্লাহপাকের প্রতিশ্রুত সেই *"বালাদীল আমীন"* সুরক্ষিত নগরী।

আর ইয়াসরিবও যেহেতু একদিন রাসূল (সাঃ)-এর মোবারক পদস্পর্শে ধন্য হবে, সুরভিত হবে, মদীনাকেও আল্লাহ্পাক একটা রূহানী মর্যাদায় পূর্ব থেকেই সুরক্ষা দান করেছেন। ইহুদিরা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল যে, এখানে একদিন সর্বশেষ নবীর আগমন ঘটবে; যে-কারণে তারা সবাইকে বহু আগে থেকেই সতর্ক করে রেখেছিল। একবার-তো এক রাজা এই পথ দিয়ে অতিক্রম করবার প্রাক্কালে পরম শ্রদ্ধেয় শেষ নবীর উদ্দেশ্যে কিছু অগ্রিম উপহারসহ একটি ভক্তিলিপি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন, যা বংশানুক্রমে হজরত আইয়ুব আনসারীর হাতে আসে। আল্লাহ্পাকের কী অলৌকিক মহিমা, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) মদীনায় এসে এই আবু আইয়ুব আসনারীর (রাঃ) গৃহেই প্রথম আতিথ্য গ্রহণ করেন।

যাই হোক, রাসূল (সাঃ)-এর জন্মস্থানের কথায় আসি। এটা সত্য যে, পবিত্র কাবাগৃহের কারণে সেই হজরত ইবরাহিমের (আঃ)-এর সময় থেকেই মক্কার এমন একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় ও অব্যাহত থাকে, যে-কারণে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে মক্কাবাসীকে গ্রহণ করেছিল। প্রাকৃতিক বৈরিতা ও অভাব-অনটন যাই থাক, আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়ে মক্কা পরিণত হয়েছিল সুবিশাল আরবদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির অপরিহার্য কেন্দ্রস্থলরূপে। দ্বিতীয়ত, সারা পৃথিবীই তখন স্থলবাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল এবং বহির্দেশ থেকে বহু বাণিজ্য কাফেলাকে এই আরবের উপর দিয়েই নানাদেশে যাতায়াত করতে হতো। তাছাড়া আরবদের নিজেরও অনেক বাণিজ্যবহর এদিক ওদিক যাতায়াত করতো। এ-থেকে একটা বড় সুবিধা এই হয়েছিল যে, বহির্জগতের সঙ্গে আরবের একটি পরিচয় এবং সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরী হতে কোন অসুবিধা হয়নি। এবং প্রাকৃতিক আনুকূল্য না-থাকলেও এই বাণিজ্যপথের অপরিহার্যতার কারণেও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের কাছে আরবের একটা স্থায়ী

www.pathagar.com

গুরুত্ব ছিল।

আরবের ভৌগোলিক অবস্থাটা বড় চমৎকার। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার যে-কোন প্রান্তবর্তী স্থান থেকে আরবদেশ প্রায় সমদূরত্বে অবস্থিত একেবারে কেন্দ্রবর্তী একটি দেশ। আল্লাহ্‌পাক এমনভাবে এই দেশটির অবস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেখান থেকে চীন, ভারতবর্ষ, ইয়োরোপ ও আফ্রিকার দূরতম অঞ্চলগুলো নিয়ে একটি বেশ ডিম্বাকৃতি পরিধি অংকন করা যায়; এবং এ-কথা স্থলপথে যেমন সত্য, জলপথেও একই রকম সত্য । আরবের অপর একটি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হলো দশ লক্ষ বা ততোধিক বর্গমাইল এলাকা নিয়ে এমন বিশালাকৃতি উপদ্বীপ পৃথিবীতে আর নেই। একদিকে লোহিত সাগর, অন্যদিকে আরব সাগর, এবং প্রায় সমগ্র পূর্ব ও উত্তর দু'দিকের সীমান্ত জুড়ে পারস্য উপসাগর এই দেশটিকে প্রায় অলৌকিক উপবৃত্তাকার বেষ্টনীর মধ্যে ধারণ করে আছে। এটাও একটা উল্লেখযোগ্য হেতু, যে কারণে বাইরের কোন দেশ ও জাতি আরবদেশে কোনরূপ অভিযান চালানোর সুযোগও পায়নি, সাহসও পায়নি।

রাসূল (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সমকালীন রাজনৈতিক যে-প্রেক্ষাপট সেটা হলো, পৃথিবীতে তখন দু'টি বিশাল পরাশক্তি বিদ্যমান। একটি রোমান অপরটি পারসিক। এবং বেশ চমকপ্রদ যে, রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য দুটোই আরব ভূখণ্ডের তিন দিক বেষ্টন করে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে আছে। অথচ আরব কারো দ্বারাই কোনভাবে উপদ্রুত হয় নি। এই দুই শক্তির মধ্যে আধিপত্যবিস্তার ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাঝে মাঝে ছোট বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়, দুই পক্ষে জয়-পরাজয়ের ঘটনাও ঘটে; কিন্তু তৎকালীন সময়ে পৃথিবীতে এমন আর কোন তৃতীয় শক্তি ছিল না, যার দ্বারা রোমান বা পারস্য সাম্রাজ্য আক্রান্ত হতে পারে। আর এই সময়ে আরবরা নিজেদের গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-কোন্দল নিয়ে নানারকম কলহ-কোলাহলে মত্ত ছিল বটে, কিন্তু বহিঃশক্তির প্রশ্নে কোনদিকেই কোনরূপ না-জড়িয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে। এমনকি আরবভূখণ্ডে বসবাসবরত ইহুদিদের মধ্যেও এই নিরপেক্ষতা বজায় ছিল। তারা যেহেতু আহ্‌লেকেতাব অর্থাৎ মূসা (আঃ)এর তওরাতপন্থী, পারসিকদের প্রতি তাদের কোন দুর্বলতা ছিল না। অপরদিকে রোমান খ্রীষ্টানদের নির্মম নির্যাতনে তারা এক সময় এমনভাবে বিতাড়িত ও পর্যুদস্ত হয়েছিল যে, রোমানদের প্রতি তারা ছিল শত্রুভাবাপন্ন। অতএব ইহুদিরাও কোনদিকে না-ঝুঁকে মদীনা ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলসমূহকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে নানা ধরনের শয়তানী তৎপরতা যদিও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বড় কোন ঝুঁকির মধ্যে না-গিয়ে শুধু আরবদের ক্ষতিসাধনে সেই তৎপরতা খুব চাতুর্যের সঙ্গে সীমাবদ্ধ রেখেছিল; এবং দৃশ্যত তারাও ছিল নিরপেক্ষ।

রোমান সাম্রাজ্যের তখন দু'টি অংশ। পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ ইয়োরোপের একটা বড়

www.pathagar.com

এলাকা, আর এদিকে সিরিয়া, জেরুজালেম, মিশর, মরক্কো, আবিসিনিয়া ইত্যাদি নিয়ে এক বিরাট পূর্বাঞ্চল। ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নর নিয়োগ করে শাসনকার্য পরিচালিত হতো। পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এই যে সুবিশাল রোমান সাম্রাজ্য, তার একচ্ছত্র অধিপতি ছিল কাইজার। অপরদিকে ইরাক, ইয়েমেন এবং আরো অনেক এলাকা এমনকি উত্তরে রাশিয়ার কিছু অংশ ও আফগানিস্তান অতিক্রম করে সিন্ধুনদের পশ্চিম প্রান্তবর্তী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল পারস্য সাম্রাজ্য, বংশানুক্রমে যার মূল শাসক ছিল খসরু। রোমান সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের কিছু অংশ ছাড়া পুরো আফ্রিকা তখন সভ্যতা বিবর্জিত আদিম অন্ধকারে নিমজ্জিত। এদিকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থাও খুব ভালো নয়। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব নিয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব অশোকের সময়ে যে-সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অশোকের মৃত্যুর পর-পরই তা ভেঙ্গে পড়ে।

তারপর, রাসূল (সাঃ)-এর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে, হর্ষবর্ধন বিশাল ভারতকে এককেন্দ্রিক রাজনৈতিক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন, বেঁধেও ছিলেন; কিন্তু সেই বন্ধনও স্থায়ী হয় নি। নানা অন্তর্দ্বন্দ্বে বহুধাবিভক্ত ভারতবর্ষ তখন অসংখ্য আঞ্চলিক শাসকের দ্বারা শাসিত ও খণ্ড বিখণ্ড। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, সিন্ধু থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত পুরো ভারতবর্ষেরই তখন এই অবস্থা। রাশিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়া, জাপান এদের ভৌগোলিক আয়তন ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে-রকমই হোক, রোমান কি পারসিকদের মত বৃহৎ কোন ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে, অন্তত ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে, তাদের কোন সম্ভ্রমযোগ্য পরিচয় ছিল না। এ-সব দেশ ছিল ক্ষুদ্র নাতিক্ষুদ্র রাজতন্ত্রশাসিত । আমেরিকা তখন আবিষ্কৃতই হয়নি। অতএব তার কথা তখন সুদূর অজানা ইতিহাসের গর্ভে লুক্কায়িত; এবং অষ্ট্রেলিয়াও তখন সভ্যপৃথিবীর আড়ালে আমেরিকার মতই অনাবিষ্কৃত। আর বর্তমানের যে বহু-বিখ্যাত বৃটেন, আলোচ্য সময়ে সেই বৃটেন ছিল রোমান সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী কিন্তু বহির্ভূত, সমুদ্রবেষ্টিত ধীবর ও জলদস্যুদের আখড়া, একটি অখ্যাত-উপেক্ষিত দ্বীপজনপদ।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর আবির্ভাবকালে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় এই হলো মোটামুটি তৎকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা

দুই.

পৃথিবীতে ক্ষমতা ও রাজনীতির যে-বিন্যাস, তার সঙ্গে ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি কুশলি যোগ বরাবরই বর্তমান ছিল, এখনো আছে। এই কারণেই ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির উপর পাদ্রী-পুরোহিতদের যেমন বিশদ প্রভাব ছিল, গীর্জা-মন্দিরের পুরোহিত-পাদ্রীরাও একই রকম রাজক্ষমতার অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতো। পারস্পরিক স্বার্থে এটা একটা, কিছু প্রকাশ্য কিছু গোপন অলিখিত চুক্তির মতো।

www.pathagar.com

ধর্মনীতিকে তার মূল লক্ষ্য ও দায়িত্ব থেকে বিযুক্ত করে ধর্মের নামে রাজশক্তির সমর্থন জোগানো এবং সর্বসাধারণকে শোষণ করা ছিল ধর্মব্যবসায়ীদের একটা ধর্মীয় চালাকি। আর রাজশক্তি মানব-শোষণের সহজ কৌশল হিসেবে এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতো। বর্তমান সময়ে রূপ কিছুটা বদল হয়েছে, কিন্তু শোষণ প্রক্রিয়া প্রায় পূর্বের মতই অব্যাহত আছে। ইসলামপূর্ব কালে এই ব্যাপারটা খুবই জমজমাট ছিল। অর্থাৎ ধর্ম ছিল, কিন্তু ধর্মের নামে শোষণ ছিল আরো বেশি। এবং এটাও উল্লেখযোগ্য যে, কোনো প্রধান ধর্মই এই অনৈতিক স্বার্থপ্রক্রিয়া ও যোগসাজশ থেকে মুক্ত ছিল না। অবশ্য অদ্যকার সময়ে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলে যে একটি ইবলিসী ধর্ম চালু হয়েছে, অথবা সমাজতন্ত্রের মোড়কে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ধর্মহীন নাস্তিকতা, এ-রকম উদ্ভট ব্যবস্থা ও মতবাদ তখন রাসূল (সাঃ)-এর সময়ে কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। এটা নিতান্তই ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর নিজস্ব এক অভিনব আবিষ্কার। ঠিক অভিনব বলাও সঠিক হয় না, এটা আসলে ফরাসী বিপ্লবের উদরজাত অর্বাচীন গণতন্ত্র এবং ইহুদিসন্তান কার্ল মার্কসের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কম্যুনিজমেরই এক-একটি অশুভ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও বাই-প্রোডাক্ট।

মহানবী (সাঃ) যখন জন্মগ্রহণ করেন এবং নবুয়ত লাভ করেন, তখন মোটামুটি যে-কয়েকটি ধর্মের বিশেষ আধিপত্য ছিল, সেগুলো হলো খ্রীষ্ট ধর্ম, পৌত্তলিকতা, অগ্নিউপাসনা ও বৌদ্ধধর্ম। আদিম অসভ্য উপজাতিদের মধ্যে যে-এক ধরনের ভীতি ও সংস্কারাশ্রিত উপ-ধর্মের প্রচলন ছিল, তাকে 'প্রকৃতিপূজা' বললেই বোধ হয় যথার্থ হয়। সাপ, ব্যাঙ যাদু-টোনা বনদেবী এমন কি গুবরে-পোকাও ছিল এই প্রকৃতিপূজার তাৎক্ষণিক লক্ষ্য বা উপকরণ বা বিষয়বস্তু। অনুধাবন করা কষ্টকর নয়, তারা তাদের জীবনধারণ-প্রণালীর কারণেই এই জাতীয় প্রকৃতি-বিশ্বাসের উপর তাদের পূজা ও ধর্মবোধ গড়ে তুলেছিল। যাই হোক, আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে এই ধরনের আদিম উপধর্ম নিয়ে আলোচনার বিশেষ আবশ্যকতা নেই। যে প্রধান চারটি ধর্মের কথা উল্লেখ করেছি, মনে করি তার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত; কারণ আমাদের মূল লক্ষ্য পৃথিবীর বিশদ ধর্মতাত্ত্বিক ইতিহাস নয়, লক্ষ্য সমসাময়িক পার্থিব দৃশ্যপটে মহানবীর (সাঃ)-এর মহাজীবন।

রাসূল (সাঃ)-এর আবির্ভাবকালে ইহুদিরা ছিল, ইহুদিদের ধর্মও ছিল; কিন্তু খ্রীস্টানদের চাপে তার অবস্থান তখন খুবই দুর্বল। আর ইহুদিদের যেহেতু নিজস্ব কোনো দেশ বা ভৌগোলিক-রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না, তারা ধর্মটাকে আঁকড়ে ধরে প্রায় অর্ধ-যাযাবর জীবন যাপন করতো। সন্দেহ নেই, ইহুদিদের এক সময় খুব সক্রিয় প্রভাব ছিল, দৌরাত্ম্য প্রতিপত্তিও ছিল; কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের (হজরত ঈসা(আঃ) বিদায়ের পর চতুর সেন্ট পল ও তার কিছু শিষ্যের চেষ্টা-প্ররোচনায় রোমানরা যখন দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে শুরু করলো, তখন থেকেই রোমান রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় একদিকে খ্রীষ্টধর্মের উত্থান, অন্যদিকে বিকৃত তওরাত-নির্ভর (Old Testament) ইহুদি ও ইহুদিধর্মের পতন শুরু হলো।

রোমানরা প্রথমে ছিল পৌত্তলিক, বিশেষ করে সূর্যদেবতার উপাসক; কিন্তু পরবর্তীতে পুরোপুরি খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টান মানে হজরত ঈসা (আঃ) প্রচারিত একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান নয়, সেন্ট পল প্রবর্তিত ধর্মাধর্ম বাছ-বিচারহীন এক সহজিয়া খ্রীষ্টান; যীশুখ্রীষ্টের আনীত প্রকৃত 'সুসংবাদ' এর (Gospel) সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টান। মহানবী (সাঃ)-এর সময়েও ছিল, বর্তমান পৃথিবীতেও এই খ্রীষ্টধর্মই এখনো সদম্ভে বিরাজমান। এই খ্রীষ্টধর্মের অনুসারীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যীশু ঈশ্বরের জাতপুত্র; এবং বিশ্বাস করে তাদের কোনো পাপ নেই, কারণ যীশু নিজে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তাঁর অনুসারীদের সকল পাপ নিঃশেষে মোচন করে গিয়েছেন। ইহুদিরাও কম নয়, তারা যীশু খ্রীষ্ট বা হজরত ঈসা (আঃ)কে নবী বলে স্বীকার তো করেই না, উপরন্তু হজরত উজায়ের (আঃ)-কে বলে খোদার পুত্র। আর হজরত মূসা (আঃ)-আনীত তওরাতকে তারা এমনভাবে বিকৃত করে ফেললো, যা সেন্টপল ও পরবর্তী বাইবেল রচয়িতাদের হাতে মূল ইঞ্জিলের যে দুরবস্থা হয়েছে, তাওরাতও হুবহু একইভাবে একই রকম একটি বানোয়াট বইয়ে পরিণত হলো। রাসূল (সাঃ)-এর সময়ে এই ধর্মভ্রষ্ট ঐশী-আলোক-বঞ্চিত ইহুদিরা বসবাস করতো মদীনায় ও মদীনার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে। আরবের নিজস্ব অধিবাসীদের কথায় পরে আসছি ; তার আগে অন্যতম বৃহৎশক্তি পারস্য সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করি। পারসিকরা ছিল পুরোপুরি অগ্নিউপাসক; তাদের ধর্মগ্রন্থ হলো 'জেন্দাবেস্তা', কেউ কেউ বলে 'দীঘানিকা'। জরথ্রুস্ট প্রবর্তিত পারসিকদের এই ধর্মমতে অগ্নিই হলো একমাত্র উপাস্যশক্তি। এই ধর্ম এখন বিলুপ্তির পথে বটে, কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর আবির্ভাবকালে এই অগ্নিউপাসকদের সংখ্যাও ছিল অগণিত, প্রভাবও ছিল জমজমাট। এমন জমজমাট যে, হাজার বছর ধরে একাদিক্রমে সম্রাট ও সর্বসাধারণের উপাস্যবস্তু ছিল এক-একটি অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড।

ভারতবর্ষে তখন পৌত্তলিকতার জয়জয়াকার। অনেক আগে বেদ-উপনিষদে বর্ণিত একেশ্বরবাদের বার্তা বহন করে আর্যরা ভারতে আগমন করেছিল। কিন্তু স্বীয় স্বার্থে ভূমিপুত্রদের আদিম পৌত্তলিকতা ও প্রকৃতিপূজার বিরুদ্ধাচরণ না-করে, আর্যরা নিজেই বহু রকম কল্পিত দেবদেবীর মিথ্যা-মাহাত্ম্য সৃষ্টি করে ভারতবর্ষকে পুরোপুরি পৌত্তলিকতার নিগড়ে বেঁধে ফেললো। কোথায় গেল একমেবাদ্বিতীয়ম, আর কোথায় গেল বেদ-উপনিষদের মরমিয়া মর্মবাণী। বরং অপেক্ষাকৃত আদিবাসী জনগণকে (তাদের ভাষায় অনার্য) শোষণ ও প্রতারণার লক্ষ্যে ধর্মের নামে এক চতুর্বর্ণীয় দীর্ঘস্থায়ী বিভাজন ও পৌত্তলিকতার পাকাপাকি ধর্মদর্শন প্রতিষ্ঠিত হলো। এই পর্যায়ে বুদ্ধদেবের

www.pathagar.com

কথাটি উল্লেখযোগ্য। গৌতম বুদ্ধের এক জাতীয় মানবিকতা-সমৃদ্ধ অহিংস বাণীর প্রভাব নিয়ে খ্রীস্টপূর্ব অশোকের পর বৌদ্ধরা আবার পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সে-প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আসলে গৌতমবুদ্ধের ধর্ম দৃশ্যত নিরীহ মনে হলেও সেটা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী অপকৌশলজাত চতুর্বর্ণীয় ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে কার্যত একটি বিপ্লব, একটি প্রতিবাদ। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির মোকাবিলায় তারা টিকতে পারে নি। উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের নির্মম অত্যাচারে বৌদ্ধরা ভারত থেকে প্রায় পুরোপুরি উৎখাতই হয়ে গেল। তারা পালিয়ে গেল চীন, জাপানে। চীন জাপান তখন কনফুসিয়াস-ধর্মাবলম্বী। কিন্তু কনফুসিয়াসের স্বজাতিকেন্দ্রিক ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে নির্বাণবাদী, জন্মান্তরবাদী বৌদ্ধদের অহিংস বাণীর খুব একটা বিরোধ সৃষ্টি হয় নি। বরং একটা সখ্য ও সমন্বয়ই সাধিত হলো। অবশ্য এতদসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আদিতে যদিও বৌদ্ধধর্মে কোনরূপ কোনো মূর্তি উপাসনার কথা ছিল না, কিন্তু নানা কারণে, নানা প্রভাবে বৌদ্ধরাও ঘোরতরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো প্রায় হিন্দুদের মতই পৌত্তলিকতা দ্বারা। যা হোক, এই হলো রাসূল (সাঃ)-এর আবির্ভাবকালের অব্যবহিত পূর্বাপর পৃথিবীর মোটামুটি ধর্মীয় রূপ।

এটা সত্য ও বাস্তব যে, ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কৃতিও গড়ে ওঠে। একেবারে বিশুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি বলে কিছু হয় না; হলেও সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ('Art for Arts sake') শিল্প শিল্পেরই জন্য, বিনোদন বিনোদনেরই জন্য, একথা খুবই আধুনিক কালের। সংস্কৃতির এই সংজ্ঞা ও অভিজ্ঞানের মধ্যে যৎসামান্য সারবস্তু থাকলেও, সংস্কৃতি এককভাবে নিজের পায়ে অধিক সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তাকে কোনো-না কোনো বিষয়বস্তুর অবলম্বন করতে হয়। তার সেই আশ্রয় বা অবলম্বন যদি হয় ধর্ম, তাহলে তার স্থায়িত্ব নিয়ে আর বিশেষ দুর্ভাবনা থাকেনা। বিশদ আলোচনায় না-গিয়ে একটি-দু'টি উদাহরণ থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার অনুধাবন করা সম্ভব। বৈষ্ণব পদাবলী যে দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করেছে, তার মূল কারণ রাধা-কৃষ্ণের ধর্মাশ্রিত জীবাত্মা-পরমাত্মার সখ্য-সাধনার অভিব্যক্তি ধারণ করেছে বলেই। অন্যথায় শুধু মানবিক প্রেমের নির্যাস নিয়ে জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের গান বোধ হয় এতদিন টিকতো না। 'রাখীবন্ধন' কি 'ভাইফোঁটা' এ-সব নিতান্তই এক একটি মানবিক আনুষ্ঠানিকতা; কিন্তু এগুলোকে স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন হয়েছে ধর্মীয় আবরণ। এইজন্যই চতুর সংস্কৃতিজীবীরা ধর্মের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতিকে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করে; যেহেতু মানুষ স্বভাবতই একটু ধর্মানুরাগী, এই চেষ্টা বহুলাংশে সফলও হয়। বোঝার সুবিধার্থে আরো উল্লেখ করতে পারি, রবীন্দ্র সঙ্গীত বা লালনগীতি-যে বাঙ্গালীর কাছে দিনে দিনে অপরিহার্য হয়ে উঠলো, তার কারণ শুধু নান্দনিক উৎকর্ষ নয়; মূল কারণ হলো, এই সঙ্গীতের সুর ও বাণী ও গায়কীর মধ্যে এমন এক ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার অভ্যন্তরে শির্ক-বিদআত ও অশ্লীলতা

www.pathagar.com

যতই থাক, অনেকের কাছেই মনে হচ্ছে এর একটা ধর্মীয় মূল্য আছে, এই সঙ্গীত একটা আত্মমুক্তির সাধনা। এবং এই কারণেই কেউ কেউ এটাকে 'ইবাদত' বলেও গণ্য করেন। এ-এক কঠিন সংকট।

বিশুদ্ধ বিনোদন, তা যতই অশ্লীল ও ক্ষতিকর হোক, একসময় তা-থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব; কিন্তু এই জাতীয় ধর্মের মুখোশ-পরানো বিপজ্জনক সংস্কৃতির ইবলিসী চক্রজাল থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। অনেক মন্দিরে একসময় ঈশ্বরের সেবাদাসীরূপে মেয়েদেরকে নিয়োগ করা হতো। দক্ষিণ ভারতে এখনো কোথাও কোথাও এটা আছে। অথচ তার মূল লক্ষ্য ধর্মও নয়, ঈশ্বরও নয়; মূল লক্ষ্য পুরোহিত ও পাণ্ডাদের রিরংসাবৃত্তির তৃপ্তিসাধন। ধর্মের নামে ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই ধরনের লাম্পট্য ও প্রতারণার বহু উদাহরণ উল্লেখ করা যায়, যা-থেকে সৃষ্টি হয়েছে 'ধর্মানুমোদিত' বহু ধরনের ধর্মীয় নৃত্যগীত, বহু ধরনের চূড়ান্ত শির্ক ও অশ্লীলতা। পারস্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে মুসলমানদের ধর্মেও ধর্মীয় খোলসে বহু গর্হিত সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পীরপূজা, মাজারপূজা, গানবাদ্য সহকারে 'হালকায়ে জিকর' এসব-তো আছেই, এখন এমনকি মুসলমানরূপী ন্যাড়ার ফকিররা গঞ্জিকা-সেবনকেও ধর্মের অনুপান হিসেবে বিবেচনা করে। যা হোক যা বলতে চাই তাহলো, ধর্মের আড়াল নিয়ে সর্বধর্মেই আবহমান কাল থেকে এমন সব নানাবর্ণীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে; যা ধর্মের মূল প্রেরণার সাথেই শুধু সম্পর্কহীন নয়, সঙ্গে সঙ্গে 'মোক্ষ ও সাধনার' নামে শিরক্ ও অশ্লীলতা, শোষণ ও লাম্পট্যের এক-একটি চমৎকার নান্দনিক উপায় ও কৌশলও বটে। এ-বিষয়ে অবশ্য অনেক দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আছে। কিন্তু তা-থেকে আমরা নিবৃত্ত থাকতে চাই। কারণ নানাদিক থেকে সংক্ষেপে যেটুকু যা বলার বলা হয়েছে। এখন আলোচনা দীর্ঘ না করে দেখতে চাই, রাসূল (সাঃ)-এর সমসাময়িক আরবের বিশেষত মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃশ্যাবলী কেমন ছিল।

রাসূল (সাঃ)-এর আগমনের বহুকাল পূর্ব থেকে পবিত্র কাবাগৃহ আল্লাহ্‌র ঘর হিসাব সমগ্র আরববাসীর কাছেই ছিল পরম সম্মানিত। কিন্তু তাওহিদী বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠতম ও প্রথমতম স্মারকগৃহ আল্লাহ্‌র এই ঘরকে কেন্দ্র করে নানা রূপ ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তৈরী হয়েছিল এমন একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা, যার মধ্যে তাওহীদের নামগন্ধও ছিল না। বরং এই ধর্মীয়-সংস্কৃতি ও উপাসনা-শৈলীর প্রাণকেন্দ্র ও প্রাণসম্পদ হয়ে উঠেছিল নিরঙ্কুশ পৌত্তলিকতা দ্বারা কলুষিত। যে-হজরত ইবরাহিম (আঃ) কুঠারাঘাতে আপন পিতা আজর কর্তৃক নির্মিত মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করেছিলেন; তাওহীদের আমানত রক্ষাকল্পে যিনি হাসিমুখে প্রবেশ করেছিলেন নমরুদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে; যিনি একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদতের জন্য পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে তৈরী

www.pathagar.com

করেছিলেন কাবাগৃহ ; রাসূল (সাঃ) দেখতে পেলেন, সেই ইবরাহিম (আঃ)-এর তাওহিদী ধর্মমত পরিত্যাগ করে মক্কাসহ সমগ্র আরব জড়িয়ে পড়েছে পৌত্তলিকতার নিদারুণ জটাজালে। যে-তাওহিদকে প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্পাক অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এই ধরাপৃষ্ঠে, রাসূল (সাঃ) দেখলেন তার ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই। তিনি দেখলেন, খুবই নগণ্যসংখ্যক ব্যক্তি বহু কষ্টে ইবরাহিমী-ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু পুরো আরবই মূর্তিপূজায় আপাদমস্তক আচ্ছন্ন। লাত-মানাত, উজ্জা-হোবল ইত্যাদি কত নামের কত-যে মূর্তি তার কোন ইয়ত্তা নেই। আর পবিত্র কাবাগৃহ ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ চত্বরও কত-যে অসংখ্য মূর্তির সমারোহে পরিকীর্ণ, তারও কোনো সীমাসংখ্যা নেই। কেউ বলেন, তিনশ'ত ষাট, কেউ বলেন আরো বেশি। অথচ মানুষের জীবনে পৌত্তলিকতা ও অংশীবাদের চেয়ে বড় কোন জুলুম নেই; বড় কোন জাহেলিয়াতও নেই। এই জুলুম ও জাহেলিয়াতের অভিশপ্ত কারাগারে সমগ্র আরববিশ্ব তখন বন্দী। আল্লাহ্র অস্তিত্বকে তারা অস্বীকার করে না, কিন্তু শির্ক ও পৌত্তলিকতার যা-বৈশিষ্ট্য, আরো অসংখ্য উপাস্য দেবতাও তাদের কাছে আল্লাহ্র সমস্থানীয়।

উল্লেখ করা বাহুল্য,এই ধরনের জাহেলিয়াত থেকে যা উৎপন্ন হয়, তা-সবই এক একটি অভিশপ্ত বিষবৃক্ষ। এজন্যই কাব্যবৈদগ্ধ্য বিশ্বস্ততা, ওয়াদারক্ষা, আতিথেয়তা, সাহসিকতা ইত্যাদি অনেক সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তৎকালীন আরবদের মধ্যে ঘন হয়ে জাঁকিয়ে বসেছিল এক নিবিড় নিশ্ছিদ্র জুলমাত। এমন অকথ্য জুলমাত যে, হানাহানি, গোত্রীয়-লড়াই, সন্ত্রাস, ব্যভিচার, দস্যুতা, লুণ্ঠন, নারী-নির্যাতন এসব তো ছিলই, এমনকি আপন ঔরসজাত মাসুম কন্যাকে নির্দয়ভাবে জীবন্ত মাটিচাপা দিয়ে হত্যা করতেও তারা কোনরূপ দ্বিধা করতো না। আর এই সঙ্গে এই বিবেকহীন অন্ধকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে অস্বাভাবিক সংস্কৃতি আরবদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, তা ছিল উলঙ্গপনা, মদ্যপান, জুয়া ভাগ্যগণনা, বেহায়াপনা ও অকথ্য অশ্লীলতা। বিনোদনের জন্য আরবদের কাছে কাব্যচর্চা ছিল সর্বাধিক প্রিয় ও মুখ্যবস্তু; এবং কাব্যরচনা ও কবিতার সমঝদার হিসেবে আরবদের খুব খ্যাতিও ছিল। আসলে আরবি ভাষা ও আরব্য-জীবনের এটা একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও বটে। কিন্তু প্রাক-ইসলামী যুগে আরব্য-কবিতা পুরোটাই ছিল অশ্লীল। ইমরুল কয়েসদের মত অনেক বড় বড় কবি ছিল, কিন্তু তাদের রচনার উপজীব্য ছিল শুধুমাত্র নারী, গোত্রগৌরব ও অশ্লীলতা। এবং শুধু কবি ও কাব্য রসিকদের ক্ষেত্রে নয়, অশ্লীলতার নিকৃষ্ট অভিব্যক্তি সমাজের সর্বস্তরে এত ব্যাপক ও ভয়ংকরভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, এমনকি হজ্ব করতে এসেও ঢাকঢোল বাজিয়ে সম্পূর্ণ বা অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় নারী-পুরুষ একত্র নাচতে নাচতে পবিত্র কাবাগৃহ তওয়াফ করতো। এবং এটাই ছিল তাদের সংস্কৃতি ও পুণ্যসঞ্চয়ের গৌরবময় ধর্মীয় সংস্কৃতি। মোটামুটি এই হলো তৎকালীন আরবদের বাস্তব অবস্থা। নৈতিক মান অধঃপাতের এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ঐতিহাসিকেরা সময়টাকে অভিহিত করেছেন 'আইয়ামে

www.pathagar.com

জাহেলিয়াত'। কিন্তু শুধু আরব নয়, পূর্ববর্ণিত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, শাসন-শোষণ, সীমাহীন নৈতিক অধঃপাত, অশ্লীলতা অংশীবাদ ও বেইনসাফী, সুদ জুয়া ব্যভিচার, ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন ধর্মব্যবসা, মানবিক দায়িত্বশূন্যতা, নারীর অপমান, বিপর্যস্ত মানবাধিকার ইত্যাদি নিয়ে পুরো জগৎটাই তখন জাহেলিয়াতের ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত ।

এই দুঃসহ, দুর্বিসহ, মানবতার জন্য ক্রন্দনরত এই অন্ধকার অভিশপ্ত পৃথিবীতে আগমন করলেন আল্লাহ্-প্রেরিত এক মহামানব, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) । তিনি আসলেন সমগ্র বিশ্বের আশীর্বাদ-স্বরূপ 'রাহমাতাল্লিল আলামীন' রূপে, আসলেন নিখাদ কল্যাণ ও সত্য শুভত্বের আলোকবর্তিকা হাতে। 'ইন্না আরসালনাকা বিল হাক্কি বাশিরাউ ওয়া নাজীরা' (সূরা বাকারা) তিনি আসলেন সত্যদ্বীনসহ সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী রূপে। শুধু সুসংবাদবাহী ও ভয়প্রদর্শক হিসাবেই নয়, অবতীর্ণ হলেন সমগ্র মানবগোষ্ঠীর একমাত্র অনুসরণযোগ্য সার্বিক জীবনের সর্বোত্তম আদর্শরূপে। তিনি আসলেন পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জিন্দিগীর সাফল্য-বার্থতার সুস্পষ্ট পয়গাম ও পথরেখা নিয়ে; আসলেন সর্বপ্রকার অংশীবাদমুক্ত আল্লাহ্র একক অখণ্ড সার্বভৌমত্ব তথা নিরঙ্কুশ তাওহিদী-বিশ্ব প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে। আসলেন মনগড়া পৃথিবীর সকল অসাম্য, অবিচার নিরারণকল্পে সমগ্র মানবমুক্তি ও বিশ্বশান্তির অব্যর্থ সওগাত নিয়ে। এইজন্যই আবহমান মানবসভ্যতার ইতিহাসে আবহমান বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে সর্বাধিক ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বৎসর ৫৭০ ও ৬১০ খ্রীষ্টাব্দ। একটি জন্মবৎসর, একটি আলোকিত গিরিগুহায় নবুয়তলাভের সূচনা-বৎসর। বলাই বাহুল্য, আকাশে বাতাসে ভূমিতে অন্তরীক্ষে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহের দান। সত্যই কী আছে এই বিশ্বে, এই ধরাপৃষ্ঠে, যা আল্লাহপাকের অফুরন্ত করুণা ও রহমতের সাক্ষ্য বহন করে না ? কিন্তু এতদপ্রসঙ্গে একটি বিষয় সীমাহীন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করা অতীব জরুরি। সমগ্র মানববংশ ও সমগ্র মানব-পৃথিবীর জন্য আল্লাহ্পাকের শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত হলো দু'টি; একটি 'কিতাবুম মুবীন' আল কোরআন, অপরটি 'কাদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূরুঁউ' আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে আগত আলোকবর্তিকা মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বড় খোশনসীব, মুসলিম মিল্লাত এই দুই শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, এই দুই শ্রেষ্ঠতম নেয়ামতের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। আলহামদুলিল্লাহ্,আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ)এর জীবন : তিন পর্বের সংক্ষিপ্ত কথা

প্রথম পর্ব

রাসুল (সাঃ)এর প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি দিনই এত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্ডিত যে, এক-একটি দিন যেন এক-একটি শতাব্দী। তবু আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বলতে পারি, তিনটি বিশেষ অধ্যায়ের সমন্বয়ে রাসুল (সাঃ)এর এই পার্থিব জীবন। প্রথম অংশটি হলো, পবিত্র মাতৃগর্ভ থেকে ভুমিষ্ঠ হবার পর নবুয়ত-পূর্ব চল্লিশ বছর। দ্বিতীয়াংশ, তেরো বছরের নবুয়তি মক্কী-জিন্দিগী; এবং শেষাংশ হলো, হিজরত-উত্তর ওফাতকাল পর্যন্ত দশ বছরের নবুয়তি মাদানী-জীবন।

চল্লিশ বছরের প্রথমাংশটি নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বটে, অনেক অলৌকিক ইশারা ও ঘটনার তাৎপর্যপূর্ণ সমাহার এই জীবনেও বর্তমান, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাধারণভাবে এই জীবন ছিল শান্ত ও অবৈপ্লবিক ও অন্য দশজনের মতই অনেকটা উত্তেজনাহীন নিরবচ্ছিন্নরূপে সাংসারিক। তিনি হজরত ঈসা (আঃ)এর মতো ভূমিষ্ঠ হয়েই না কথা বলেছেন, না হজরত ইব্রাহীম (আঃ)এর মতো 'পূজ্যপাদ' মূর্তিগুলোকে নিধন করে আকস্মিকভাবে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। হজরত দাউদ (আঃ) প্রথম তারুণ্যে একাকী মহাশক্তিধর জালুতকে হত্যা করে সসম্মান খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ; মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) কর্তৃক সে-রকম রোমাঞ্চকর বীরোচিত ঘটনা সংঘটিত হয় নি। হজরত মূসা (আঃ) এর মতো কোনো দুর্মতিগ্রস্ত যুবককে মুষ্টাঘাতে নিহত করে তিনি সমাজে কোনো হৈ চৈ ফেলে দেন-নি, অথবা অলৌকিক কোন লাঠিরও তিনি অধিকারী ছিলেন না। অর্থাৎ সাধারণ চোখে যা-খুব সহজেই দৃশ্যমান, এই জাতীয় কোন রোমাঞ্চকর অভিনবত্ব তাঁর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় নি। তিনিও আরবের অন্য শিশুদের মতই ধাত্রীক্রোড়ে বেড়ে উঠেছেন; পিতামহ ও পিতৃব্যের আশ্রয়ে অন্য মরুবালকদের মতো তিনিও বকরি চরিয়েছেন, ব্যবসা করেছেন, বিবাহ করেছেন, সংসারযাত্রা নির্বাহ করেছেন। জীবনীকারদের নির্ভরযোগ্য সকল বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, সমস্যা সংকট অভাব-অসহায়ত্ব, কষ্ট সুখ দুঃখ ইত্যাদি নিয়ে মোহাম্মদ (সাঃ)এর জীবন ছিল সাধারণ স্বাভাবিক এক আরব্য-জীবন। সুরা আদ-দোহায় আল্লাহপাক তাঁর রাসূল (সাঃ)এর নবুয়তপূর্ব এই প্রাথমিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুন্দর পরিচয় তুলে ধরেছেন। 'তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অসহায় অবস্থা থেকে আশ্রয় দান করেন নি? তিনি আপনাকে পথ-না-জানা অবস্থা থেকে পথের সঠিক সন্ধান দিয়েছেন, দান করেছেন দারিদ্র্যের পরে সচ্ছলতা'। অর্থাৎ আল্লাহপাক স্বয়ং এরশাদ করছেন, মোহাম্মদ (সাঃ)এর নবুয়তপূর্ব চল্লিশ বছর সময়কালে দর্শনীয় কোন চমৎকারিত্ব ছিল না।

তবে একটা জিনিষ ছিল ; সেটা হলো, আল্লাহপাক তাঁকে ও তাঁর প্রতিটি মুহূর্তকে

www.pathagar.com

এমনভাবে হেফাযত করেছেন যে, ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম কোনো পাপ কি অশ্লীলতা তাঁকে স্পর্শই করতে পারে নি। সকল জীবনীকার এ-বিষয়ে একমত যে, প্রচণ্ড জাহেলিয়াতের মধ্যেও এই একটি মানুষ, যিনি ছিলেন মানবিক যে-কোন ত্রুটি থেকে মুক্ত, ছিলেন সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক ও অপাপবিদ্ধ। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী; এবং এতটাই বিশ্বস্ত ও সত্যাশ্রয়ী যে, আগামীকাল সুর্য না-উঠলেও না-উঠতে পারে, কিন্তু মোহাম্মদ (সাঃ)এর বিশ্বস্ততা ও সত্যপরায়নতা ও ওয়াদারক্ষায় কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। মক্কাবাসীরা এইজন্য তাঁকে উপাধি দিয়েছিল 'আল আমীন'। আর একটি বিষয় ছিল; সেটা হলো, মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন খুবই ভাবুক প্রকৃতির। বলা যায়, একেবারে বাল্যকাল ও কৈশোর থেকেই একটি গভীর চিন্তা তাঁকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখতো। মক্কাবাসীদের নজর এড়ায়-নি, যত দিন অতিবাহিত হয়েছে, তাঁর চিন্তার তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত এমন হলো যে, নিজ গৃহ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরবর্তী জাবাল-এ-নূর-এর নির্জন একটি গুহায় তিনি একাকী ধ্যানমগ্ন হয়ে কাটাতে লাগলেন।

কিন্তু এমন নিরবচ্ছিন্ন তাঁর এই একাকী গভীর চিন্তার বিষয়বস্তু কী? কী লক্ষ্যে তাঁর এই কঠিন আত্মমগ্নতা? কী পেতে চান তিনি? তিনি কি গৌতমবুদ্ধের মত জরা-মৃত্যু ও ব্যাধিকে জয় করবার কোনো পথের সন্ধানী ছিলেন? তিনি কি কোনো পরশপাথর খুঁজে পেতে চান, যা সারা পৃথিবীর মৃত্তিকাকে সোনায় মুড়িয়ে দিতে পারে? না, এসব কোনো কিছুই নয়। তাহলে তিনি কি হজরত ইব্রাহীম (আঃ)এর মত সৃষ্টিকর্তাকে অনুসন্ধান করছিলেন? না, তাও নয়। কারণ মোহাম্মদ (সাঃ)তো বটেই, তৎকালীন মক্কাবাসীদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, যারা আল্লাহকে মোটামুটি বুঝতো। বুঝতো এইজন্য যে, নবী-পরম্পরায় বাহিত এই জ্ঞান তাদের ছিল যে, আল্লাহ একজন আছেন এবং তিনিই সর্বশক্তির আধার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর সঙ্গে নিদারুণভাবে শিরক মিশ্রিত করার কারণেই তারা পরিণত হয়েছিল মার্জনাহীন মুশরিকে। স্মরণযোগ্য যে, আবরাহার কাবাশরীফ ধ্বংসের উন্মত্ত আক্রমণ যখন অত্যাসন্ন, কাবাশরীফের তত্ত্বাবধায়ক খাজা আবদুল মুত্তালিব তখন নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশকরত কাবাশরীফকে রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহর উপরই সমর্পণ করেছিলেন। কুখ্যাত কাফের আবু জেহেলও বদর-যুদ্ধের প্রাক্কালে আল্লাহর উপরই সত্যের অনুকূলে ফয়সালা-দানের প্রার্থনা পেশ করেছিল। ইতিহাস বলছে, এবং কুরআনুল কারীমে আল্লাহপাকও বলছেন,এমন কেউ বড়-একটা ছিল না, যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে আধুনিক কালের নাস্তিকদের মত পুরোপুরি অস্বীকার করতো। তারা যে-কঠিন জুলমাতের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, সেটা হলো অংশীবাদ; আল্লাহর অখণ্ড ও একক সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তারা ছিল অন্ধ-অংশীবাদে আক্রান্ত শোচনীয়রূপে মুশরিক ও শোচনীয়রূপে পথভ্রষ্ট। কাজেই হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হজরত ইসমাইল (আঃ)এর প্রত্যক্ষ বংশধর মোহাম্মদ (সাঃ)

www.pathagar.com

এটা ভালোভাবেই জানতেন যে, এই পৃথিবীর মালিক ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। এবং শুধু জানতেন তাই নয়, তিনি ছিলেন অক্ষেত্রে যথেষ্টই অগ্রসর-চেতনার অধিকারী; মুশরিক পরিবৃত পরিবেশেও পুরোপুরি তাওহিদী-চেতনার উদাহরণ। অতএব আল্লাহর অস্তিত্ব ও সার্বভৌম-ক্ষমতার প্রশ্নে তাঁর মধ্যে আদৌ কোনো সংশয় কি দোদুল্যমানতা ছিল না। এক্ষেত্রে মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করেও তিনি ছিলেন শির্‌কমুক্ত স্বভাব-ঈমানদার।

বস্তুত মোহাম্মদ (সাঃ)এর চিন্তা ও উদ্বেগ ও অস্থিরতার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল পারিপার্শ্বিক জাহেলিয়াত। তিনি দেখলেন, পৃথিবীর মানুষ এক নিবিড় জুলমাতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত, সকল নিরাপত্তা ও কল্যাণের স্পর্শ থেকে মাহরুম, দেখলেন মানবজাতির সমগ্র ব্যবস্থাপনা এক কঠিন সর্বনাশের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই দুর্ভাগ্য থেকে অব্যাহতির উপায় কী, কিসে মুক্তি, কী-ভাবে কোন্ পথে এই পৃথিবীকে একটি সুষম সর্বকল্যাণময় বাসযোগ্য পৃথিবীতে পরিণত করা যায়, এটাই ছিল তাঁর সকল চিন্তা ও ধ্যানের বিষয়বস্তু। আপন বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে তিনি নিজে কিছু চেষ্টা করেছেন, গঠন করেছেন 'হিলফুল ফজুল', স্বীয় চরিত্র মাধুর্যের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন করেছেন; কিন্তু দেখলেন, এ-দিয়ে জগৎকে বদলানো যায় না। তিনি দেখলেন, কোনো কিছু দিয়েই মানুষের কোনো স্থায়ী উপকার হয় না, মানবসমাজে দৃঢ়ভাবে-প্রোথিত অসাম্য অবিচার ও অকল্যাণের যে দুরারোগ্য ব্যাধি, শতচেষ্টা-সত্ত্বেও সেই ব্যাধির কিঞ্চিত্তম নিরাময়ও ঘটে না। তিনি উপলব্ধি করলেন, মানববুদ্ধি-প্রসূত যে-সমাধান, ব্যাদিত-বিস্তৃত পৃথিবীময় সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে তার মূল্য ও ভূমিকা একটি অতিক্ষুদ্র জোনাকীর চেয়েও নগণ্য। বলা সমীচীন, কেবল আল্লাহপাকের অভিপ্রায়হেতুই, শুধু মানসিক অস্থিরতা এবং এই কষ্টে-কষ্টেই মোহম্মদ (সাঃ) এর কেটে গেল অনেক দিন অনেক বছর। তারপর এটাও আল্লাহর ইচ্ছা যে, তিনি হেরা-পর্বতের নির্জন গুহাভ্যন্তরে মৌন-মগ্ন এক ধ্যানসমাহিত তপস্যাব্রত গ্রহণ করলেন।

বলা আবশ্যক, এই ধ্যানমগ্নতার কারণ এই নয় যে, তিনি নিভৃতে অনুসন্ধান করছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত মানবমুক্তির পথ ও উপায়। তাঁর এই নিভৃত-নির্জন সাধনা ও তন্ময় আত্মমগ্নতার অর্থ হলো, এতদিনের সকল অস্থিরতা ও অনুসন্ধানকে বিসর্জন দিয়ে মহান আল্লাহপাকের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসর্মপণ। কারণ মোহাম্মদ (সাঃ), তাঁর এতদিনের যেটুকু যা উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা, তা থেকে বুঝেছেন, মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে, মানুষ তার ভালোবাসা বিছিয়ে দিতে পারে, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ নিয়ে দুঃখে-দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করতে পারে বিনিদ্র রজনী, কিন্তু সমগ্র মানববংশের জন্য নির্ভুল কোনো পথ ও পথনির্দেশ নির্মাণ করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়; মোহাম্মদ (সাঃ)এর পক্ষেও নয়। এই আলোকোজ্জ্বল পথ, এই হেদায়াত, বাসযোগ্য

www.pathagar.com

পৃথিবীর এই নির্ভুল নীলনকশা (Blue Print) একমাত্র আল্লাহপাকের হাতে। অতএব আল্লাহপাক যদি স্বীয় অনুগ্রহে জানিয়ে দেন, তাহলেই শুধু মানুষের পক্ষে সম্ভব এই শ্রীহীন কুৎসিত মানবসমাজকে সত্য ন্যায় ও ইনসাফের আশীর্বাদপ্লাবিত এক আদর্শ মানবসমাজরূপি গড়ে তোলা। আল্লাহপাকের সরাসরি প্রেরিত হেদায়াত ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন মুক্তির পথ নেই। আল্লাহপাকেরই ইচ্ছা, এই উপলব্ধির তীব্র তাগিদেই মোহাম্মদ (সাঃ) হেরা পর্বতের কন্দরে অনেক আশা ও পিপাসায় গভীর তন্ময়তা নিয়ে চেয়ে থাকেন, কখন সত্য এসে ধরা দেয়। চেয়ে থাকেন, কখন কীভাবে মানুষের সার্বিক মুক্তির নির্ভুল পথরেখা তিনি দেখতে পান। এইভাবেই মানবমুক্তি-পিয়াসী একাগ্রচিত্ত একটি মানুষের কেটে গেল অনেক দিন। তারপর মোহাম্মদ (সাঃ)এর বয়স যখন চল্লিশ বছর এক দিন, ১২ ই রবিউল আউয়াল, সকল উদ্বেগ ও অস্থিরতা ও আকণ্ঠ তৃষ্ণার্ত প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো। আল্লাহপাকের তরফ থেকে বার্তাবহ হজরত জিব্রাইল (আঃ) আবির্ভূত হলেন স্বয়ং আল্লাহপাক-প্রণীত মানবমুক্তির একমাত্র নির্ভুল পয়গাম নিয়ে; জানালেন, 'মোহাম্মদ আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন।' আপনি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত রাসূল, আমি জিব্রাইল।' মোহাম্মদ (সাঃ) নবুয়তলাভের মহিমায় অভিষিক্ত হলেন; আল্লাহপাক তাঁকে মনোনয়ন দান করলেন আবহমান বিশ্ব-মানব ইতিহাসের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলরূপে। এতোদিন যিনি ছিলেন শুধুই মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ, নবরূপে নতুন অভিজ্ঞানে তিনি এখন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)। সমাপ্ত হলো জীবনের একটি অধ্যায়, সমাপ্ত হলো শৈশব-কৈশোর-যৌবনের সমন্বয়ে নানা বর্ণে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান মোহাম্মদ (সাঃ)এর চার দশকের নবুয়তপূর্ব জীবন।

দ্বিতীয় পর্ব

এবার শুরু হলো দ্বিতীয় পর্ব, শুরু হলো নবুয়ত-উত্তর মক্কী জিন্দিগী। আরম্ভটাই বড় আকস্মিক ও অভাবনীয়। রাসুল (সাঃ) ভাবতেই পারেন নি, এইভাবে এমন কল্পনাতীতভাবে তিনি এক রহস্যময় আলোর জগতে প্রবেশ করবেন। অভাবনীয়ই বটে। কিন্তু এটা আল্লাহপাকের একান্ত মনোনয়ন। এর সঙ্গে না মানুষের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা জড়িত, না কোনো ফেরেশতার সুপরামর্শ। এটা আল্লাহপাকের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাধীন একটি মনোনয়ন (Selection) । আসলে মানুষ তার আকাঙ্ক্ষাকে উন্মুখ ও জাগ্রত রাখতে পারে; চেষ্টা শ্রম ও স্বপ্ন নিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় থাকতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্রবৃহৎ যে-কোনো ক্ষেত্রে, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সাফল্য কি ব্যর্থতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহপাকের হাতে। মানুষ যুগপৎ আত্মম্ভরী ও অদূরদর্শী। সাফল্য লাভ করলে, সে মনে করে তার আপন কৃতিত্ব, মনে করে সাধনালব্ধ অবধারিত ফসল; ব্যর্থতাকেও সে এই একইভাবে বিচার ও

www.pathagar.com

মূল্যায়ন করে। মানুষ যে, কয়েকটি গুরুতর মূঢ়তা দ্বারা চালিত, তার মধ্যে এই অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক আত্মবিশ্বাস একটি। এবং যে-কয়েক ধরনের ক্ষমাহীন অকৃতজ্ঞতায় অধিকাংশ মানুষ ব্যাধিগ্রস্ত, তার মধ্যে আল্লাহ-প্রদত্ত নেয়ামতকে নিজের কৃতিত্ব বলে ধারণা ও দাবী করা সর্বাপেক্ষা জঘন্য। বলাই বাহুল্য, ইতিহাসে এমন সাক্ষ্য বহু বিদ্যমান যে, এই জঘন্য কৃতঘ্নতার পরিণতিও বড় জঘন্য। যাই হোক, এ-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা যায়, তার প্রয়োজনও আছে; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সেটা যেহেতু কথঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক, আমরা বরং আমাদের মূল প্রতিপাদ্যে ফিরে আসতে পারি।

পৃথিবীতে একটা সময় ছিল, যখন শুদ্ধ-অশুদ্ধ মৌলিক বা হাতে-বানানো যাই হোক, একটা-কোন ধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো সমাজ ও রাষ্ট্র। অর্থাৎ রাষ্ট্রিক ও সামাজিক উভয় শক্তিকেই বাহ্যত নির্ভর করতে হতো অপরিহার্যরূপে কোনো না কোনো ধর্মের উপর,সে-ধর্ম যত প্রতারণাপূর্ণই হোক এবং তার যৌক্তিক ভিত্তি যত দুর্বলই হোক। এইজন্যই নমরুদ কি ফেরাউন খোদাদ্রোহী ছিল, কিন্তু একেবারে ধর্মহীন ছিল না। জুলিয়াস সিজর বীর ছিল, নানাদিক থেকে স্বেচ্ছাচারীও ছিল কিন্তু যতদূর জানা যায়, সিজরের একটি ধর্মও ছিল। এমনকি সক্রেটিস-যে বিষপানে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেটাও ধর্মের জন্যই; আর তিনি-যে নিশ্চিত সুযোগ ও সহায়তা পেয়েও পালিয়ে যেতে অস্বীকার করেছেন, সেটাও ধর্মের জন্য। এবং মধ্যযুগের ইতিহাসতো খুবই স্পষ্ট, বহু কবি লেখক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী লাঞ্ছিত নিগৃহীত ও নিহত হয়েছে শুধু এই অপরাধের কারণে যে, তাঁদের চিন্তা ও কথা ও সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা ও জ্ঞান ও অনুশাসনের অমিল ধরা পড়েছে। আসলে পৃথিবী কখনোই একেবারে ধর্মহীন ছিল না; সব দেশে সর্বদায়ই কোন-না কোনো ধর্মকে অবলম্বন করেই রাষ্ট্র ও সমাজজীবন পরিচালিত হতো, ধর্মের নামেই জনগণকে রাখা হতো একটা মোটামুটি নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে শান্ত ও স্থিতিশীল। খুব সংক্ষেপে এই বিষয়টি উল্লেখ করতে হলো এই কারণে যে, মোহাম্মদ (সাঃ)কে আল্লাহপাক যখন রাসুল হিসেবে মনোনীত করলেন, মক্কায় ও মক্কার দূরে-অদূরে তখন এক বা একাধিক ধর্ম বিদ্যমান ছিল; সব মানুষের মধ্যেই কোনো-না কোনো রূপে ধর্মবিশ্বাসও ছিল।

অতএব এই মানুষদের কাছে মোহাম্মদ (সাঃ) যখন একটি নতুন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে রাসূলরূপে আবির্ভূত হলেন, তারা পুরোমাত্রায় শঙ্কিত হয়ে উঠলো। শঙ্কার কারণ দুটি। প্রথমত, পুরুষানুক্রমে আগত তাদের এতদিনের অনুসৃত ধর্মের প্রতি যে-অনুরাগ ও ভালোবাসা, তা বিনষ্ট হতে পারে। এবং দ্বিতীয়, প্রচলিত ধর্মকেন্দ্রিক তাদের যে-প্রভাব ও প্রতিপত্তি আয়-উপার্জন ও মোটামুটি যে-সুস্থির অভ্যস্ত জীবনধারা, সেখানে অকস্মাৎ একটি নতুন জীবনব্যবস্থা বা দ্বীনের বিজয় ঘটলে, এতদিনের সবকিছু একেবারে তছনছ হয়ে যাবে। এই দুটি আশঙ্কার জন্যই, কোন কথাবার্তা শোনা বা

www.pathagar.com

সত্যাসত্য ভালোমন্দ বিচারের কোন দরকারই হলো না, শুরু না-হতেই আল্লাহর নবীর কণ্ঠস্বরকে পুরোপুরি স্তব্ধ করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করলো সবাই। এক ঘোরতর শত্রুতা নিয়ে সমগ্র মক্কাবাসী একতাবদ্ধ হলো রাসূল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে; এবং সম্ভব অসম্ভব সকল উপায়ে রাসূল (সাঃ)কে সর্বাত্মকভাবে প্রতিরোধ করাই হয়ে উঠলো মক্কাবাসীদের সার্বক্ষণিক কর্ম ও সংকল্প। আমরা মক্কাবাসী কাফেরদের এই গর্হিত ও অসহিষ্ণু আচরণকে মূঢ়তা বলতে পারি, কিন্তু বলতে পারি-না এটা অস্বাভাবিক। কারণ ভুল হোক, অন্যায় অনুচিত যাই হোক, অন্তরের মধ্যে পুরুষানুক্রমে লালিত কোনো বিশ্বাসকে উৎখাত করে নতুন ও বিপরীত কোন চৈতন্যকে গ্রহণ করা সহজ নয়। আর এই বিশ্বাস-বদলের সঙ্গে যতই জড়িত থাক সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন, যদি ধারণা হয় জীবন ও সমাজের পুরোনো ব্যবস্থা এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট বহু বিষয় একেবারে মূলোৎপাটিত হয়ে যেতে পারে, তাহলে-তো বিশ্বাস-বদল একেবারে প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে সমাজপতি ও বর্তমান অবস্থায় যারা সুবিধাভোগী, তাদের কাছে কোনরূপ কোনো পরিবর্তনকে মেনে নেয়া রীতিমত আত্মঘাতী বলেই বিবেচিত হবে। এটাই মানবস্বভাব, চিরদিন এইরকমই হয়েছে। নূহ (আঃ)এর সময় হয়েছে; হজরত ইবরাহিম হজরত মূসা হজরত ঈসা সকলেই এই একই বৈরিতার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। অতএব মোহাম্মদ (সাঃ)এর ক্ষেত্রে আলাদা কিছু ঘটবে, সেটাই বরং অস্বাভাবিক।

রাসুল (সাঃ) অবশ্য প্রথমে এই দিকটি গুরুত্ব-সহকারে চিন্তা করেন নি। এবং যেহেতু আল্লাহপাক, একেবারে প্রথমদিকে, এই ধরনের কোনো ইংগিত প্রদান থেকে বিরত ছিলেন, নবুয়ত-জীবনের শুরুতে রাসুল (সোঃ)এর মনে কোনোরূপ কোনো সংশয় ও আশঙ্কার উদ্ভব ঘটেনি। তাঁর ধারণা ছিল, মানুষের চূড়ান্ত কল্যাণের জন্য আল্লাহপাকের নিকট থেকে আগত যে-নিখাদ পথনির্দেশ, তাকে মানুষ আশীর্বাদরূপেই গণ্য ও গ্রহণ করবে, স্বত:স্ফূর্তভাবেই সর্বান্ত:করণে বরণ করে নেবে। কিন্তু অচিরেই দেখতে পেলেন, আমাদের জননী হযরত খাদীজা (রাঃ)এর পিতৃব্যপুত্র ওরাকা ইবনে নওফেলের কথাই ঠিক, তাওহিদের আহ্বান শুনামাত্র সমগ্র মক্কাবাসী একযোগে রাসুল (সাঃ)এর প্রাণঘাতী দুশমনে পরিণত হলো। এবং এই শত্রুতা এমন সাংঘাতিকভাবে সর্বতোমুখী ও সার্বক্ষণিক হয়ে উঠলো যে, মক্কার সকল মুশরিক আবাল বৃদ্ধবনিতার যেন আর কোন কাজই নেই, একমাত্র কাজ মোহাম্মদ(সাঃ)কে নিস্তব্ধ করে দেয়া, তাওহিদের আওয়াজকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলা। সম্পূর্ণ একাকী নিঃসঙ্গ একটি মানুষ, এক প্রচণ্ড ঝড়ের মোকাবিলায় স্থির অচঞ্চল পদে ধীরে ধীরে শুরু করলেন তাঁর যাত্রা। তাঁকে যেতে হবে অনেক দূর অনেক পথ, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কোনরূপ শৈথিল্য কি ভয় কি হতাশা এই একাকী মানুষটির জন্য হারাম। কারণ আল্লাহপাকের অভিপ্রায় ও মনোনয়নক্রমে এক কঠিন দায়িত্বভার তাঁর উপর অর্পিত। সমগ্র মানবকল্যাণের যে-সার্বিক রূপরেখা, যা স্বয়ং আল্লাহপাক কর্তৃক নিখুঁতভাবে প্রণীত,

www.pathagar.com

সেই প্রোগ্রাম ও মিশনকে সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই রাসুল (সাঃ)এর একমাত্র কাজ। এই কাজে পশ্চাদপসরণের চিন্তা একেবারেই অবান্তর। যতই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠুক প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতা, যত ভীতি ভ্রান্তি কুহেলিকা ছড়িয়ে থাক পথের দু'ধারে, রাসুল (সাঃ) এর আমৃত্যু কোন বিরাম নেই, একদিনের জন্যও অবসর কি অব্যাহতি নেই। এইভাবেই শুরু; একদিকে মক্কা ও তৎসংলগ্ন মুশরিকদের নৃশংসতম দুশমনি, অন্যদিকে আল্লাহর দ্বীন-বিজয়ের লক্ষ্যে একটি একাকী মানুষের অবিচল একাগ্রতা।

মহানবী (সাঃ) যেদিন প্রথম সাফা-পাহাড়ের পাদদেশে সবাইকে ডেকে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন, সেই প্রথম দিনই তিনি আহত হলেন আপন পিতৃব্য আবু লাহাব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রাঘাতে। কিছুদিন বাদে নিজগৃহে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে আপন আত্মীয় স্বজনের সামনে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করলেন; সেদিনও তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করলো না। কী নিদারুণ উপেক্ষা, আপনজনদের নিকট থেকেও কী সীমাহীন অসূয়াতাড়িত অবজ্ঞা! নিঃসন্দেহে নৈরাশ্যজনক, কিন্তু রাসুল (সাঃ)তো তাঁর মিশন বন্ধ রাখতে পারেন না। দায়িত্ব যত বড়, বিপদ মুসিবতের আক্রমণও ততই অবিরাম ও অপ্রতিহত। এই কঠিন সময়ে প্রতিপক্ষের সকল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে, সম্পদ ঐশ্বর্য এবং সর্বোচ্চ প্রেম ও বিশ্বাস নিয়ে রাসূল (সাঃ)এর পাশে দাঁড়িয়ে শুধু এক অকুতোভয় মহিয়ষী নারী, তিনি আমাদের জননী হজরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আন্হা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের পবিত্র হস্তে, দীপ্যমান মানবকল্যাণের একমাত্র আলোকবর্তিকা, সংঘবদ্ধ দুশমন কাফেররা চাইছে এই আলো নিভিয়ে দিতে, আর আমাদের মা খাদীজা চাইছেন এই আলো এবং আলোর মশালবাহী মানুষটিকে সর্বশক্তি দিয়ে আগলে রাখতে। কী অনুপম অসাধারণ এই চিত্র, আবহমান মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম দৃশ্য!

জননী খাদীজার বয়স তখন পঞ্চান্ন; ইন্তেকালের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই পূতপবিত্র মহিলা রাসূল (সাঃ) ও তাঁর আনীত দ্বীনের জন্য যে-কোরবানী পেশ করেছেন, ইসলামের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভালোবাসায় যেভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন আল্লাহর রাহে, তার কোন দ্বিতীয় নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। এই কঠিন দুঃসময়ে আর যে দু'একজন পূর্ণ বিশ্বাস ও সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমা নিয়ে রাসূল (সাঃ)এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা হলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং বালক হজরত আলী (রাঃ)। আর একজন ছিলেন, তিনি রাসূল (সাঃ)এর প্রিয়তম পিতৃব্য খাজা আবু তালিব। আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করেন-নি, কিন্তু সুখে দু:খে বিপদে সংকটে ছায়ার মত তিনিও ছিলেন।

যাই হোক, এই তিন-চার জনের বাহিনী নিয়েই রাসূল (সাঃ)এর নবুয়তি জিন্দিগীর যাত্রা শুরু। দু'একজন করে ইসলামে প্রবেশ করছেন সত্য, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এত নগণ্য, জাগতিক বিবেচনায় যা খুবই নৈরাশ্যকর। এতটাই নৈরাশ্যকর যে,

www.pathagar.com

নবুয়তের পঞ্চম বর্ষ অতিবাহিত হওয়ার প্রাক্কালে সদ্যদীক্ষিত হজরত উমার বিন খাত্তাবকে নিয়ে মুসলমানের সর্বমোট সংখ্যা মাত্র চল্লিশ। তবু গতি যত মন্থরই হোক, যেহেতু এক-দুজন করে মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে; এবং সহস্র রকম অকথ্য নির্যাতন সত্ত্বেও কেউই যখন রাসূল (সাঃ)এর দল ছেড়ে চলে আসছে না, কাফের মুশরিকদের ঘুম আক্ষরিক অর্থেই হারাম হয়ে গেল। তারা জ্যামিতিক হারে বাড়িয়ে দিল তাদের নিগ্রহ-নির্যাতনের মাত্রা। এবং একইসঙ্গে এই প্রস্তাবও তারা পেশ করলো যে, মোহাম্মদ যদি কালেমার দাওয়াত বন্ধ করে, তাহলে অর্থ সম্পদ নারী সব-সহ সকল ক্ষমতা তাঁর হাতে তুলে দেয়া হবে। এবং এই অভিনব হাস্যকর একটি প্রস্তাবও পেশ করা হলো যে, এটাই সকলের জন্য সর্বোত্তম পন্থা— কিছু সময়ের জন্য আমরা সবাই মুশরিক হয়ে থাকি, কিছু সময়ের জন্য তাওহিদবাদী হয়ে যাই। কিন্তু মুশরিকরা যত কথাই বলুক, রাসূল (সাঃ)এর এক জবাব, 'লাকুম দিনুকুম অলিয়া দ্বীন'তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার (সূরা কাফিরুন)। অর্থাৎ আলো-অন্ধকার সত্য-মিথ্যা হক-বাতিলের সহাবস্থান অসম্ভব; একই হৃদয়ে ঈমান ও কুফর, নূর ও জুলমাত, ইলম ও গোমরাহি, তাওহিদ ও শিরকের একত্রবাস কোনোদিন সম্ভব নয়।

কাফেররা পরিষ্কার বুঝতে পারলো, মোহাম্মদকে তাঁর সত্য ও তাওহিদের পয়গাম থেকে শত চেষ্টাতেও নিবৃত্ত রাখা সম্ভব নয়। পর্বতকেও হয়ত জায়গা বদলে রাজী করানো যায়, কিন্তু মোহাম্মদকে চুল পরিমানও এদিক-ওদিক করা যাবে না। অতএব তৃতীয় কোনো বিকল্প নেই; মুশরিকদের সামনে এখন দুটিই মাত্র পথ, ইসলামকে স্বীকার করে নিয়ে মোহাম্মদের দলভুক্ত হওয়া, নাহলে মোহাম্মদ ও তাঁর শিষ্যভক্তসহ ইসলামকে সমূলে উৎখাত করা। আল্লাহপাকের অনুগ্রহপ্রাপ্ত কিছুসংখ্যক ভাগ্যবান ছাড়া সব কাফের মুশরিক ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় পথটিই গ্রহণ করলো। অর্থাৎ ইসলামের উৎখাতকল্পে তারা বেছে নিল নৃশংসতম অত্যাচারের পথ। খাজা আবু তালিবের সর্বাত্মক প্রতিরোধের কারণে রাসূল(সাঃ)কে সরাসরি আক্রমণের সাহস না-পেলেও, মুশরিকদের হাত থেকে অন্যেরা রেহাই পান-নি। হজরত সুমাইয়া (রাঃ) হজরত ইয়াসির (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীরা দুঃসহতম নির্যাতনে শাহাদাত বরণ করলেন। কতভাবে কত সাহাবীর উপর-যে লোমহর্ষক অত্যাচার চলতে থাকলো, তার কোন সীমা পরিসীমা নেই।

রাসূল (সাঃ) অবশ্য জানতেন, এই দ্বীন যেহেতু আল্লাহর প্রেরিত দ্বীন,এই মিশন যেহেতু আল্লাহর নিজস্ব মিশন, অতএব বিজয় অবধারিত। সামনেই অপেক্ষা করছে সর্বমানবিক কল্যাণে উদ্ভাসিত এক আলোকোজ্জ্বল দিন, যেদিন একাকী একজন সালংকারা সুন্দরী মহিলা সানা থেকে হাদরামাউথ পর্যন্ত সফর করবে নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে ও নিশ্চিন্তমনে। সত্য বটে, কিন্তু কতদিন, আর কত কোরবানী আর কত রক্তের নজরানা, নিগ্রহের যূপকাষ্ঠে আর কত নীরব আত্মদান! বিপ্লবের মহানায়ক, আল্লাহর

www.pathagar.com

দ্বীনের অকুতোভয় সিপাহসালার রাসূল (সাঃ) কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ মান্য ও পালন করা ছাড়া তাঁর নিজের-তো কিছু করার নেই। আশা করেছিলেন, হজরত হামজা এবং হজরত উমারের ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফেরদের সহস্রমুখী-নৃশংসতার হয়ত কিছু উপশম ঘটবে। কিন্তু না, অত্যাচারের মাত্রা আরো বহুগুণ বেড়ে গেল। রাসুল (সাঃ) ভেঙ্গে পড়েন-নি, কিছুমাত্র অধৈর্যও হন-নি, কারো বিরুদ্ধে অভিসম্পাতও করেন-নি; কারণ আল্লাহ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত এই-ই তাঁর প্রাপ্য, এই দুঃখ তাঁর সর্বাঙ্গের অলংকার। ধীর ও নম্র ও নিষ্কম্প চরণে রাসূল (সাঃ) অবিরাম এগিয়ে চলেছেন নির্ধারিত লক্ষ্যের পানে।

দ্বীনের জন্য, তাওহিদের আওয়াজকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে, নিরপরাধ মানুষের কোরবানী বোধ হয় আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম সামগ্রী। এবং এই কোরবানী, এই সর্বস্বত্যাগী সহিষ্ণু সংগ্রামী ভূমিকার জন্যই মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, ফেরেশতাদের চেয়েও অনেক উচ্চে মানুষের স্থান। কারণ ফেরেশতাদের জীবনে নিঃশর্ত নির্বিকার আনুগত্য আছে, কিন্তু আল্লাহর পথে কোরবাণী নেই, আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে অশুভ শক্তির মোকাবিলায় জিহাদ ও ধৈর্যের কোন পরীক্ষা নেই। যাই হোক, আবু জেহেল আবু লাহাবদের অত্যাচার এমন সীমা ছাড়িয়ে গেল যে, অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল (সাঃ)এর নির্দেশ ও অনুমতিক্রমে দেশ ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হলেন বহু সাহাবী। কিন্তু এতেও মুশরিকদের জিঘাংসা এতটুকু প্রশমিত হলো না, বরং আরো বেশি ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো। মুশরিকরা উদ্ভাবন করলো একটি নতুন পরিকল্পনা। রাসুল (সাঃ)কে তাঁর সকল সাহাবী ও আত্মীয় পরিজনসহ নির্মম ও নিশ্ছিদ্রভাবে বয়কট করা হলো। তাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করলেন 'শিয়াবে আবু তালিব' নামক একটি গিরিকন্দরে। এই সর্বতোমুখী বয়কট দীর্ঘ তিন বৎসর একাদিক্রমে অব্যাহত ছিল। কী দুঃসহ কষ্টের এই দিনগুলি! গাছের পাতা, চামড়া-ভেজানো পানি এইসব খেয়ে দিনের পর দিন নিবারণ করতে হয়েছে ক্ষুধা ও পিপাসা। যে-মোহাম্মদকে মক্কাবাসী সর্বদা মাথায় তুলে রাখতে প্রস্তুত, শুধু সত্যের জন্য, শুধু আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য, সেই মোহাম্মদই হয়ে গেলেন মক্কাবাসীদের সর্বতোমুখী আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। আজ যখন আলেম-উলামা পীর মাশায়েখ ও ইসলামপ্রেমীদের তাবলিগী তৎপরতা অবলোকন করি, সত্যই বড় তামাশার মত লাগে। দৃশ্যপট সম্পূর্ণ আলাদা ; মুশরিক মুনাফিকরা তাদেরকে ডিনার খাওয়ায়, চা-পানে আপ্যায়িত করে, দোয়ার মাহফিলে শরীক হয়, এমনকি ইসলাম-প্রচারে সাহায্য সহযোগিতাও করে। রাসুল (সাঃ)এর নবুয়তি-জিন্দিগীর সেই প্রথম দিনগুলোর কথা ভাবলে বড় অবাক লাগে, আজ আমরা কী-ইসলাম নিয়ে যে আছি, আল্লাহপাক জানেন।

যাই হোক, আল্লাহর অভিপ্রায়, কিছু সুস্থবুদ্ধি যুবকের চেষ্টায় এই নির্দয় অমানবিক বয়কট একদিন প্রত্যাহৃত হলো। রাসল (সাঃ) সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন মক্কায়। কিন্তু

www.pathagar.com

এখন কী করবেন? এই ঘনঘোর দুশমনি তমসার মধ্যে শুধুই নৈরাশ্যের প্রতিধ্বনি। কীভাবে তিনি পালন করবেন তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব! রাসুল (সাঃ) চিন্তান্বিত, সমস্যার শেষ কোথায়? অকস্মাৎ এই সময়ে ইন্তেকাল করলেন পিতৃব্য আবু তালিব, বয়কট-অবরোধের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারলেন না তিনি। শুধু আবু তালিব নয়, আমাদের জননী খাদীজা রাদিআল্লাহু আনহাও অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে ইন্তেকাল করলেন। শোকে-সংকটে এক দুর্বহ অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিপন্ন দৃষ্টিতে রাসূল (সাঃ) তাকিয়ে আছেন পৃথিবীর দিকে! নিঃসন্দেহে আল্লাহই একমাত্র ভরসা ও আশ্রয়স্থল; কিন্তু পার্থিব নিয়মে এই দুটি মৃত্যু রাসুল (সাঃ)কে মক্কার জমীনে একেবারে নিরাশ্রয় করে দিল। তিনি যেন দ্বিতীয়বার এক সর্বহারা নি:সম্বল এতীমে পরিণত হলেন। তাঁর আজন্ম ভালোবাসার হৃদয়তীর্থ, তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবনের স্মৃতিবিজড়িত পরম আদরের মক্কা আজ এক মমতাহীন প্রাণঘাতী লোকালয়। ধৈর্য হারানোর প্রশ্ন নয়, নবী রাসুলদের ধৈর্য অনি:শেষ অফুরান। প্রশ্ন একটাই তাহলো, তাওহিদের এই বিচ্ছুরিত আলোকধারা কি এইভাবেই নিভে যাবে? প্রাণপ্রতিম জায়েদকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তায়েফে গেলেন। আশা করেছিলেন, তায়েফবাসীরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে। কিন্তু তাদের আচরণ ছিল আরো নিষ্ঠুর; তিনি ফিরে এলেন ভগ্নহৃদয়ে, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত শরীরে। যাঁরা বলেন 'Truth is beauty, beauty is truth'; বলেন, 'সত্যম শিবম সুন্দরম,' তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানেন না। তাঁদের মৃত্তিকা-ঘনিষ্ঠতা নেই, তাঁরা গজদন্ত-মিনারবাসী সৌখিন দার্শনিক। তাঁরা জানেন না, আসলে সত্য কত কঠিন; তাঁরা জানেন না, খাঁটি সত্য কত-বেশি কোরবানী দাবী করে; জানেন না, আল্লাহর পথ বস্তুতই কত বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ!

বহু পূর্ব থেকেই মক্কার অনতিদূরে বাৎসরিক মেলা বসতো। বিরাট ও জমজমাট, বেশ কয়েকদিন স্থায়ী-এই মেলার নাম ছিল উকাজের মেলা। দূর দূরান্ত থেকে আগত বহু মানুষের সমাবেশ ঘটতো এখানে। রাসূল (সাঃ) স্থির করলেন, বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়ে নানা অঞ্চলের নানা মানুষের কাছে তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করবেন। তিনি শুরু করলেন তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম। কাফেররা নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করলো, কিন্তু রাসূল (সাঃ) হতোদ্যম না-হয়ে তাঁর দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন। আল্লাহপাকের কী অপার অফুরন্ত রহমত, কী রহস্যময় অভিপ্রায়, মদীনার কিছু মানুষ রাসুল (সাঃ)এর আহ্বানে সাড়া দিলেন, তাঁরা গোপনে গ্রহণ করলেন বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ। পরবর্তী বৎসর আরো অধিকসংখ্যক আগ্রহী মানুষ রাসুল(সাঃ)এর হাতে বাইয়াত নিলেন। এটাই হলো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বাইয়াত। একেবারেই অপ্রত্যাশিত, আসলে এইভাবেই আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়তম হাবীবের জন্য সুবেহ সাদিকের সূচনা করে দিলেন। রাসুল (সাঃ) এই প্রথম দেখতে পাচ্ছেন, আল্লাহর দ্বীন কত অপ্রতিরোধ্য; দেখতে পাচ্ছেন, ইসলাম এখন ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। তিনি দেখতে

www.pathagar.com

পাচ্ছেন, আল্লাহর দ্বীন কারো ফুৎকারে নিভে যায় না; দেখতে পাচ্ছেন, দৃঢ়মূল জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় কত অবশ্যম্ভাবী। মদীনার এই সদ্য-দীক্ষিত মুসলমানেরা রাসুল (সাঃ)কে তাঁদের দেশে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী। তাঁরা চান না, মক্কার বৈরী পরিমণ্ডলে বিদ্রূপ ও অসূয়া ও সহস্রবাহু শত্রুতার মধ্যে রাসুল (সাঃ) অবস্থান করুন। রাসুল (সাঃ) খুশি হলেন, কিন্তু পিতৃব্য আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'আমরা আমাদের নবীকে শত্রুকবল থেকে রক্ষা করেছি। প্রিয় মদীনাবাসী ভাইয়েরা, জানতে চাই, তোমরা তাঁকে সর্বতোভাবে নিরাপত্তাদানে ও সাহায্য করতে প্রস্তুত কিনা'? তাঁরা নিরাপত্তা ও সর্বতোমুখী সাহায্যের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বললেন, 'আমরা তরবারির ছায়ায় প্রতিপালিত; শুধু আশঙ্কা করছি, বিপদকালে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে না-আসেন।' রাসুল (সাঃ) স্মিতহাস্যে বললেন, 'না, এ-রকম হবে না। তোমরা আমার, আমিও তোমাদের'।

বিষয়টি মক্কার কাফের সর্দারদের কিছুই অবিদিত থাকলো না। তারা সবই জানতে পারলো; এবং শত সহস্রগুণ লেলিহান হয়ে উঠলো তাদের শত্রুতা, তাদের দুর্ধর্ষ জিঘাংসা। তারা এবার চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। আর অপেক্ষা নয়, আর নয় কোন নিগ্রহ প্রতিরোধ, এবার মোহাম্মদকে হত্যা করে সব সমস্যার চূড়ান্ত ফয়সালা করতে হবে। এবং সেটাই যথাযথ। সব গোত্র থেকে এক দু'জন ভয়ংকর যুবকদের নিয়ে গঠিত হলো হত্যাকর্মে দক্ষ ও নির্মম এক অব্যর্থ স্কোয়াড। তারা শাণিত তরবারি হাতে এক রাতে রাসুল (সাঃ)এর গৃহ অবরোধ করে রাখলো, সকাল হলেই তাঁকে হত্যা করা হবে। হিজরতের হুকুম আগেই পেয়েছিলেন; হজরত আলী (রাঃ)কে আপন বিছানায় রেখে সুরা ইয়াসীন-এর কিছু অংশ পাঠ করে রাসুল (সাঃ) গভীর নিশীথে বহির্গত হলেন আপন গৃহ থেকে। চতুর্দিকে পাহারায় দন্ডায়মান নৃশংস ঘাতকদল, কিন্তু তাঁর কোন শঙ্কা নেই, সংশয় নেই, উদ্বেগ দুর্ভাবনা কোন কিছু নেই। বহির্গমনের মুহূর্তে পরম নির্ভয়ে তিনি শুধু পাঠ করলেন, 'রাব্বি আদখিলনি মুদখালা সিদকিঁউ ওয়া আখরিজনি মুখরাজা সিদকিউ ওয়াজাআল্লি মিল্লাদুনকা সুলতানাননাসীরা' হে আমরা প্রতিপালক, যেখানেই নিয়ে যান, যেখান থেকেই নিয়ে যান, আমরা প্রবেশ ও বহির্গমনকে আপনি পবিত্র রাখুন (সুরা বনি ইসরাইল)। অবরোধে পাহারারত কাফেরদের সামনে দিয়েই রাসুল (সাঃ) গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, কেউ কিছু বুঝতেই পারলো না। তিনি প্রথমে গেলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)এর বাড়ি। আবু বকর (রাঃ) প্রস্তুতই ছিলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দু'জনে প্রথমে আশ্রয় নিলেন মক্কার অনতিদূরে অবস্থিত শ্বাপদসংকুল সওর পর্বতের একটি অত্যন্ত অপরিসর গুহাভ্যন্তরে। ভোরবেলা কাফেররা যখন দেখলো মোহাম্মদ নেই, তারা উন্মাদের মত চতুর্দিক অনুসন্ধান শুরু করলো। একসময় তারা সওর গিরিগুহার কাছে পৌঁছেও গিয়েছিল, কিন্তু আল্লাহর কি কুদরত, গুহার মধ্যে খোঁজ না-করেই তারা বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে এলো। তারা রাসুল (সাঃ)কে ধরবার জন্য

www.pathagar.com

ঘোষণা করে দিল একশত উটের এক লোভনীয় পুরস্কার। কিন্তু সবই নিষ্ফল; আসলে আল্লাহ যাঁকে নিরাপত্তা দান করেন, হেফাজত করেন, তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করার সাধ্য কারো নেই। আল্লাহপাক নিজেই বলেছেন, 'জালিকা বি আন্নাল্লাহু মাওলাল্লাজীনা আমানু' বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহই অভিভাবক।

একাদিক্রমে তিন দিন অবস্থানের পর সওর পর্বতগুহা থেকে একদিন রাত্রে দুজনে বহির্গত হলেন মদীনার পথে। এদিকে মুশরিকদের মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়েছে, কিন্তু ব্যর্থকাম এই মুশরিকরা আর তাঁদের নাগাল পেলো না। সুরাকা নামক দস্যু-প্রকৃতির এক লোক পুরস্কারের লোভে তাঁদেরকে ধরার জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে কাছাকাছি এসেছিল বটে, কিন্তু উপর্যুপরি অলৌকিক বিপদের কারণে ক্ষমা চেয়ে ফিরে গেল এই দস্যু সুরাকা। তারপর যাত্রাপথে বিশেষ আর কোন বিঘ্ন দেখা দেয় নি। রাসুল (সাঃ) ও তাঁর পরম বিশ্বস্ত সঙ্গী আবু বকর সিদ্দিক (রা) উভয়ে নিরাপদে এসে পৌঁছলেন মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত এক জনপদ, কোবায়। সেদিনও ছিল ১২ই রবিউল আউয়াল। কোবায় কয়েকদিন অবস্থান করে তিনি আসলেন মদীনায়। মদীনার আবাল-বৃদ্ধ বনিতা তাঁকে সাদরে সানন্দে গ্রহণ করলেন। সবাই স্ব স্ব গৃহে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য উদগ্রীব; কিন্তু রাসুল (সাঃ) বললেন, তাঁর বাহন যে-উট কাসওয়া, সে আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত। কাসওয়া যেখানে থামবে সেটাই হবে তাঁর অবস্থানস্থল। কাসওয়া তাঁকে ধীরে ধীরে নিয়ে গেল আবু আইয়ুব আনসারীর (সাঃ) বাড়িতে। এই বাড়িতেই শুরু হলো রাসুল (সাঃ)এর বসবাস, শুরু হলো নতুন জীবন। পেছনে পড়ে রইল সুদীর্ঘ তেপ্পান্ন বছরের স্মৃতি সুরভিত সংগ্রামক্ষুব্ধ সুখ দুঃখের অনেক ইতিকথা; সামনে এক প্রসারিত ভবিষ্যৎ; কী অপেক্ষা করছে সেই ভবিষ্যতের গর্ভে, সে-কথা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ জানে না।

তৃতীয় পর্ব

রাসুল (সাঃ)এর হিজরত ও মদীনায় আগমন ইসলামের ইতিহাসে শুধু নয়, সমগ্র বিশ্ব-ইতিহাসেরই এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক ঘটনা। এই ঘটনা পুরো পৃথিবী তথা পরবর্তী সমগ্র মানবসভ্যতার উপর এতই বহুমুখী প্রভাবসৃষ্টিকারী ও তাৎপর্যপূর্ণ যে, বিষয়টি অগ্রিম অনুধাবন করতে আদৌ বেগ পেতে হয়নি। এবং এই কারণেই হজরত উমার ফারুক (রাঃ)এর শাসনামলে যখন মুসলমানদের নিজের একটি সন প্রবর্তনের আবশ্যকতা অনুভূত হচ্ছিলো, তখন হজরত আলী (রাঃ)এর প্রস্তাবক্রমে হিজরতের বৎসরটিকে ভিত্তি হিসাব গ্রহণ করতে কোনো মতান্তর সৃষ্টি হয়নি। হিজরত বস্তুতই একটি বিরাট ঘটনা; রাসূল (সাঃ)এর হিজরতের মধ্য দিয়ে ইসলাম আঞ্চলিকতার বলয়-মুক্ত হয়ে বৈশ্বিক আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ হলো। যাই হোক, মক্কার জীবন ছিল দুঃখে

www.pathagar.com

কষ্টে সহিষ্ণুতায় সমস্যাসংকুল একটি প্রস্তুতি পর্ব, আলো জ্বালাবার প্রাথমিক প্রস্তুতিকাল, আলোটা জ্বলে উঠলো মদীনায়।

রাসূল (সাঃ)কে মদীনার আবালবৃদ্ধ বনিতা সবাই স্ব স্ব গৃহে নিয়ে যাবার জন্য খুবই ব্যাকুল কিন্তু আল্লাহপাকের ইচ্ছা, তিনি উঠলেন হজরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)এর গৃহে। গৃহটি ছিল দ্বিতল; তাঁর জন্য থাকার ব্যবস্থা হলো উপরতলায়। অবশ্য নানা সমস্যা ও প্রয়োজনের কথা ভেবে রাসুল (সাঃ) নীচতলা-তে থাকাটাই সুবিধাজনক মনে করেছিলেন; কিন্তু আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) নিজেদের জন্য উপরতলায় থাকাটা আদবের খেলাফ বিবেচনা করে রাসুল (সাঃ)কে একরকম জোর করেই উপরে রাখলেন। অবশ্য অল্প কিছুদিন পরে রাসুল (সাঃ) নীচতলাতেই নেমে এসেছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসুল (সাঃ) প্রথম থেকেই নীচতলাতে ছিলেন। পূর্বে যাঁরা হিজরত করে এসেছিলেন, তাঁরা এসেই কোবাতে একটি মসজিদ তৈরী করলেন। কোবা তৎকালে ছিল মদীনা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী একটি পৃথক এলাকা। হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়ে এই কোবা-তেই প্রথমে কয়েকদিন অবস্থান এবং উক্ত মসজিদে সালাত আদায় করেন। এখানে বর্ণনায় কিছু পার্থক্য দেখা যায়। কারো কারো মতে, রাসুল (সাঃ) কোবাতে চারদিন নয়, চৌদ্দ দিন ছিলেন, এবং সেখানে সবাইকে নিয়ে নিজহাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, সেটাই মসজিদে কোবা, তারপর কোবা থেকে মদীনা ।

মদীনাতে যে-দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রথমেই রাসুল (সাঃ) করলেন, তার একটি হলো মসজিদে নববীর প্রতিষ্ঠা। এই সেই পবিত্র মহিমান্বিত মসজিদ, যেখানে এক রাকাআত নামাজের মর্যাদা, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, পৃথিবীর অন্য যে-কোন মসজিদে আদায়কৃত পঞ্চাশ হাজার রাকাআতের সমান। মসজিদুল হারাম ও আল আকসার মসজিদে এই ফজিলত যথাক্রমে এক লক্ষ ও পঞ্চাশ হাজার গুণ। রাসুল (সাঃ) এই কথাও বলেছেন যে, সওয়াবের আশা নিয়ে একান্তভাবে যে- তিনটি জায়গায় মুসলমান যেতে পারে, তার একটি হলো মসজিদে নববী, অপর দুটি স্থান হলো মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুল আকসা। এই সঙ্গে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) দ্বিতীয় যে-কাজটি করলেন, তাহলো, মুসলমান ইহুদি নাসারা পৌত্তলিক সকল গোত্রের সবাইকে নিয়ে মদীনাকেন্দ্রিক একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো নির্মাণ। ধর্মীয় পরিচিতি যাই থাক, বংশ-গোত্রের পার্থক্য যে-রকমই হোক, মদীনার সার্বিক নিরাপত্তা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বহিঃশত্রুর মোকাবিলার প্রশ্নে সকলেই সমান দায়িত্বশীল, এই ঐকমত্যের উপর তৈরী হলো সবার জন্য অনুসরণীয় একটি চুক্তিনামা; যা পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধানরূপে খ্যাত মদীনা-সদন। এই সংবিধানের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হলো মদীনা-নগর রাষ্ট্র। আর এই প্রথম ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও রাষ্ট্রপ্রধান হলেন আল্লাহর রাসুল

www.pathagar.com

মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)।

স্মরণ করা আবশ্যক, রাসুল (সাঃ) শত্রু-পরিবেষ্টিত মক্কার গৃহ থেকে বহির্গত হবার সময় দোয়া করেছিলেন, 'রাব্বি আদখিলনি মুদখালা সিদকিঁউ ওয়া আখরিজনি মুখরাজা সিদকিঁউ ওয়া জায়াল্লি মিল্লাদুনকা সুলতানান্‌নাসীরা' হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে যেখানেই নিয়ে যান, যেখান থেকেই নিয়ে যান, আমার পবিত্রতা অক্ষত রাখুন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে দান করুন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা (সূরা বনি ইসরাইল)। আল্লাহপাকের অশেষ অনুগ্রহ, তিনি তার প্রিয়তম হাবীবকে সেদিনের সেই প্রার্থিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আজ এই মদীনায় দান করলেন। ইসলামের যে-মূল লক্ষ্য তাওহিদ অর্থাৎ আল্লাহর একক ও অখন্ড প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা, আল কোরআনের হেদায়াত নির্ভর ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, সেই লক্ষ্যসাধনে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয়শক্তি অপরিহার্যও বটে। কারণ এই কর্তৃত্ব থেকে মাহরুম অবস্থায় আল্লাহর কোন একটি আদেশ নির্দেশও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, ইসলামের সর্বকল্যাণময় রূপরেখা তুলে ধরাও সম্ভব নয়। অথচ কী বিস্ময়কর, এই উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও, এক শ্রেণীর মুসলমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে ইসলামকে বিযুক্ত করে রাখতে চায়, এবং ইসলামে সেটাই নাকি 'যথাযথ'। সত্যই মূঢ়তার কোন সীমা পরিসীমা নেই! যাই হোক, এখানে এই কথাটিও উল্লেখ করা আবশ্যক, ভূমির প্রশ্নে এই ক্ষুদ্র মদীনাটুকুই আল্লাহপাকের বিশুদ্ধ উপহার, যা লড়াই করে অধিকার করতে হয়নি। কিন্তু তারপর, ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আর এক ইঞ্চি ভূমিও বিনা লড়াইয়ে মুসলমানের অধিকারে আসে নি, রক্তের নজরানা পেশ না-করে আর একটি জায়গায়ও ইসলামের পতাকা তুলে ধরা যায় নি। সর্বদা সর্বত্র লড়াইয়ের হয়ত প্রয়োজন হয়নি, এবং এটাও সত্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের আগমনবার্তা শ্রুত হওয়া মাত্রই শত্রুপক্ষ লক্ষন সেনের মত পলায়ন করেছে বা উপহার সামগ্রী নিয়ে ও জিযিয়া প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে; কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো, মুসলমানকে সর্বত্রই আবির্ভূত হতে হয়েছে প্রভঞ্জনের মত অশ্বপৃষ্ঠে যোদ্ধার বেশে। অতএব যাঁরা মনে করেন ও বলতে চান যে, ইসলামের বিজয় সাধিত হয়েছে তরবারি দিয়ে নয়, হিকমত ও উদারতায়, তাঁরা-যে কী পরিমানে ইতিহাস সম্পর্কে গাফেল ও অমনস্ক, এবং তাঁরা-যে কী বোকার স্বর্গেই-না বসবাস করেন, আল্লাহ মালুম। যাই হোক নতুন এই নগর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা, মুসলিম অমুসলিম সকল নাগরিকের মধ্যে সমঝোতা ও সখ্যস্থাপন ইত্যাদি নানা জরুরি কাজে অতিবাহিত হলো রাসুল (সাঃ)এর মাদানী-জিন্দিগীর প্রথম বছর। সালটা ছিল ৬২২।

ইয়াসরিব, রাসূল (সাঃ)এর কারণে যার নতুন নাম হয়েছে মদীনাতুন্নবী, ছিল খর্জুর বৃক্ষশোভিত এক ক্ষুদ্র উর্বর জনপদ। হিজরত করে এই জনপদে মুসলমান যাঁরা এলেন,

www.pathagar.com

তাঁরা মুহাজির; আর যাঁরা আশ্রয় দিলেন তাঁরা আনসার। এই আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে মদীনার যা-কিছু সমস্যা তার সমাধানকল্পে রাসূল (সাঃ) পুরোপুরি মনোনিবেশ করেছেন। তিনিই রাষ্ট্রপ্রধান, তিনিই বিচারক, তিনিই মসজিদের ইমাম। জাগতিক-আধ্যাত্মিক, প্রয়োজনীয় সর্বাবিধ শিক্ষায় মুসলমানদেরকে তিনি তৈরী করে তুলছেন ; মদীনা গড়ে উঠতে শুরু করেছে ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্রের এক অদৃষ্টপূর্ব মডেলরূপে। যারা অমুসলিম, তারা যুগপৎ আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে অবলোকন করছে রাসুল (সাঃ) ও তাঁর সার্বিক ব্যবস্থাপনাকে। তারাও এই রাষ্ট্রেরই অনুগত দায়িত্বশীল নাগরিক। দু'একজন আবদুল্লাহ বিন উবাই ও আপাদমস্তক-অভিশপ্ত কিছু ইহুদির নীরব মর্মযাতনা ও তৎপ্রসূত গোপন চক্রান্ত ছাড়া কোথাও কোন চোখে পড়ার মত বৈরিতা নেই। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই বেশ উৎফুল্ল ও আনন্দিত। বস্তুতই চতুর্দিক আমোদিত করে এক নতুন জীবনের নির্মল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। পৃথিবী অবলোকন করছে, সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, কিন্তু তাওহিদী-চেতনায় উজ্জীবিত নির্ভুল লক্ষ্যের দিকে ধীরপায়ে অগ্রসরমান একটি কাফেলা, ইসলামের প্রথম কাফেলা। সেদিন এই ছোট্ট ধীর-গতির কাফেলাটিকে দেখে সবাই হয়ত অনুধাবন করতে পারেনি যে, এই নতুন তাওহিদী কাফেলাটি অচিরেই অনেক বেগবান হবে। অনেকেই সেদিন অনুধাবন করতে পারেনি, ইসলামের এই দাওয়াত মানেই, 'জাআল হাক্কু ওয়া জাহাকাল বাতিলা, ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা, সত্য সমুপস্থিত, বাতিলের বিদায়, কোন সন্দেহ নেই, ধ্বংসই বাতিলের অবধারিত পরিণতি (সূরা বনি ইসরাইল)। কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় অন্যরকম। তিনি তাঁর মনোনীত দ্বীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন।

মক্কা থেকে মদীনার ব্যবধান অনেক, তবু মক্কার কাফের-মুশরিকদের চোখে ঘুম নেই। তাদের ভয়, ইসলামের বিজয়াভিযান অচিরেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে মক্কার মুশরিকদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে। অতএব তাদের একমাত্র সংকল্প, আর কিছু নয়, ইসলামকে শুরুতেই মূলোৎপাটিত করতে হবে, স্তব্ধ করে দিতে হবে মোহাম্মদের কণ্ঠস্বর ও অগ্রযাত্রা। রাসুল (সাঃ) কেবল একটু গুছিয়ে নিয়েছেন। মদীনার সার্বিক কল্যাণের দিকে যথোচিত নজর দিতে শুরু করেছেন মাত্র, সংবাদ পেলেন, মক্কার কাফেররা এক বড় রকমের যুদ্ধ-প্রস্তুতি নিচ্ছে। শুধু প্রস্তুতি নয়, সিরিয়া থেকে ফেরার পথে তাদের বাণিজ্যিক বহর মুসলমানদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে, এই গুজব শুনে ওত্বার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী মদীনার দিকে রীতিমত যাত্রা শুরুই করে দিয়েছে। খবর পৌঁছলো, মদীনা অচিরেই আক্রান্ত হবে। যাই হোক, ইতোমধ্যে সশস্ত্র জিহাদ ও কিতালের হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। 'ওয়া কাতিলু ফি সাবিলিল্লাহিল্লাজিনা ইউকাতিলুনাকুম' তোমাদের সঙ্গে যারা যুদ্ধ করতে আসে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও (সুরা বাকারা)। অর্থাৎ মক্কী জিন্দিগীতে রাসুল (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা যে-সর্বংসহা সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহর হুকুমে সেই এক-

www.pathagar.com

তরফা নিগ্রহ নির্যাতনের ইতি ঘটলো। আল্লাহর রাহে প্রাণসম্পদ সর্বস্ব বিসর্জনের তীব্র তামান্না নিয়ে মুসলমান এখন রণাঙ্গনের সশস্ত্র অকুতোভয় মুজাহিদ। 'ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহি ফাইয়াকতুলুনা ওয়া ইয়ুকতালুন' তারা আল্লাহর জন্য আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন নিতেও জানে, দিতেও জানে (সুরা তাওবাহ)।

সত্য সত্যই হিজরি দ্বিতীয় বর্ষের রমজানে মক্কার কাফেররা রণসাজে সজ্জিত হয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে এগিয়ে এলো মদীনার দিকে। উট ঘোড়া ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের কী-বিপুল আয়োজন! একশত অশ্বারোহীসহ সৈন্যসংখ্যা এক হাজারেরও উর্ধ্বে। রাসুল (সাঃ) স্থির করলেন, মদীনার বাইরে দূরে গিয়ে শত্রুদলকে প্রতিরোধ করতে হবে। তারিখটা ছিল ১৭ই রমজান।

মদীনা থেকে প্রায় আশি মাইল দূরবর্তী বদর প্রান্তরে দুশমনদের মুখোমুখি হলেন মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাসুল (সাঃ)। বদরের বালুকাময় প্রান্তর। একদিকে মাত্র ৩১৩ জনের প্রায় নিরস্ত্র ইসলামের এক ক্ষুদ্র মুজাহিদ বাহিনী, অপরদিকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সহস্রাধিক দুশমন। সাধারণ বুদ্ধিতে মুসলমানদের পরাজয় অবধারিত। কিন্তু আল্লাহপাকের কী রহস্যময় অনুগ্রহ ও অভিপ্রায়, কাফেরদলই পরাজিত হলো শোচনীয়রূপে। জয় পরাজয়-যে নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহপাকেরই হাতে, বদরের যুদ্ধে এটা আরেকবার পরিষ্কার হয়ে গেল। আল্লাহ বলেন, 'ফা ইয়াদনাল্লাজিনা আমানু আলা আদুব্‌বিহিম ফা আছবাহু জাহিরীন' শত্রুর মোকাবিলায় আমি মুমেনদের সাহায্য করি, ফলে তারা জয়ী হয় (সূরা ছফ)। মুসলিম বাহিনীর মাত্র ১৪ জন, ৮ জন আনসার ও ৬ জন মুহাজির শাহাদাত বরণ করেন; কেউ কেউ আহত হয়েছেন কিন্তু একজনও বন্দী হন-নি কাফেরদের হাতে। অথচ প্রতিপক্ষ কাফেরদের কী-করুণ পরাভব। তারা ৭০জন নিহত হলো, ৭০ জন বন্দী এবং বাকিরা সবকিছু ফেলে পলায়ন করলো উর্ধশ্বাসে। এই হলো বদরযুদ্ধের ফলাফল। কাফেরদের প্রায় সব বড় বড় নেতা ও বীরপুরুষই মারা পড়লো। আবু জেহেল বেঘোরে প্রাণত্যাগ করলো মাআজ ও মুআজ নামক দুই সহোদর কিশোরের অতর্কিত আক্রমণে। সত্যই আবু জেহেলদের জন্য কী-অসম্ভব দুর্গতিই-না সেদিন নেমে এসেছিল আকাশ থেকে! সত্যই আল্লাহপাকের যা অভিপ্রায়, পৃথিবীর সকল শক্তি সম্মিলিত হলেও তার কোন ব্যত্যয় ঘটে না।

আমরা স্মরণ করতে পারি, রাসুল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদেরকে মক্কীজীবনে কত অত্যাচার ও নিগ্রহই-না মুখ বুঁজে সহ্য করতে হয়েছে; অথচ এই দীর্ঘ তেরো-বছরে কাফেরদের জীবনে কোন বিপদ মুসিবত ভয় ক্ষুধা মৃত্যু কিছুই আসে নি। কোনদিক থেকে কোনরূপ একটি আঁচড়ও লাগে-নি তাদের গায়ে। আল্লাহপাক শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছেন তাদের ঔদ্ধত্য ও নৃশংসতা, এতটুকু শাস্তির ব্যবস্থাও তিনি করেন নি; বরং এক সার্বিক নিরাপত্তার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে কাফেরদের জীবন। বিস্ময়করই বটে!

www.pathagar.com

কিন্তু এই নিরাপত্তা অহেতুক নয়, এই নিরাপত্তারও কারণ আছে। আল্লাহপাক বলেছেন, ' ওয়া মাকানাল্লাহু লিইউআজ্জিবাহুম ওয়া আন্তাফিহিম' আপনি (মোহাম্মদ সাঃ) তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকাবস্থায় তাদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না (সূরা আনফাল)! অর্থাৎ রাসুল (সাঃ)এর সম্মানার্থেই তাঁর উপস্থিতিতে আল্লাহপাক শাস্তি প্রদান স্থগিত রেখেছিলেন। সেই শাস্তি আজ প্রবলবেগে নেমে এলো বদর প্রান্তরে। এই রকমই হয়। আল্লাহপাক বলেন, 'ইন্নাহুম ইয়াকিদুনা কাইদা ওয়া আকিদু কাইদা ফামাহিলিল্ কাফিরীনা আমহিল্ হুম রুয়াইদাহ' তারা খুবই চক্রান্তবাজ কিন্তু আমি অনেক বড় কৌশলী, অতএব তাদেরকে কিছু অবকাশ দেয়া যেতেও পারে (সুরা তারিক)। গযব অবতরণের এই মধ্যবর্তী সময়কাল ও অবকাশকেই খোদাদ্রোহীরা মনে করে বিজয় ও সাফল্য। খোদাদ্রোহীরা শুধু উদ্ধত নয়, অসম্ভব-রকম বুরবাকও বটে; যাদের যথাযথ আপ্যায়নের জন্য জাহান্নাম-তো আছেই, পার্থিব জিল্লতীও সাগ্রহে অপেক্ষমান।

বদর যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি ও কলঙ্ক নিয়ে ফিরে গেল মক্কার মুশরিকরা। কী প্রচন্ড বিক্রম নিয়েই না এসেছিল, আর কী-জিল্লতী ও কী অকথ্য পরাভব নিয়েই-না ফিরে যেতে হলো। সত্যই কোন সন্দেহ নেই, 'ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়ালিয়াঁউ ওয়া কাফা বিল্লাহি নাছীরা' -বন্ধু এবং সহায়ক হিসেবে আল্লাহপাকই যথেষ্ট (সূরা নিছা)। শুধু সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি নয়, পেছনে পড়ে রইলো সর্বাধিক সাহসী ও বলবান ও দুর্ধর্ষ মুশরিকদের সত্তরটি মৃতদেহ এবং সত্তরজন শৃঙ্খলাবদ্ধ অসহায় বন্দী। এই অভাবিত পরাজয়ের দুর্বহ গ্লানি কাফেরদের অন্তরে আগুন ধরিয়ে দিল। প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের উগ্র উত্তেজনায় এমন অস্থির হয়ে উঠলো যে, তারা আবার যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করলো। এবং বছর না-ঘুরতেই মুশরিকরা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে এলো মদীনার দিকে। তাদের এই যুদ্ধাভিযানের একটাই লক্ষ্য, পূর্ব-পরাজয়ের যথোচিত প্রতিশোধ-গ্রহণ এবং ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া।

রাসুল (সাঃ)এর চাচা হজরত আব্বাস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পরও বিশেষ কারণে মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। তাঁরই প্রেরিত সংবাদে রাসুল (সাঃ) জানতে পারলেন, প্রায় তিন হাজারের মত সুসজ্জিত সৈন্য, তিন হাজার লৌহবর্ম, তিন হাজার উট, দুইশত টগবগে অশ্ব, যুদ্ধে-উত্তেজনাসৃষ্টিকারী পনরজন সুন্দরী-লাস্যময়ী গায়িকা-নর্তকী, বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও বিপুল রসদ, সব মিলিয়ে সে-এক বিশাল রণোন্মত্ত রক্তপিপাসু সৈন্যদল ঝঞ্ঝার মত মদীনার দিকে ছুটে আসছে। সময়টা তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাস। রাসুল (সাঃ) ত্বরিৎগতিতে মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সৈন্যসংখ্যা কিশোর-বালক সব মিলিয়ে প্রতিপক্ষের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র, মাত্রই এক হাজার; একটি দুটি ঘোড়া শ'খানেক উট আর একেবারেই অপ্রতুল অস্ত্রসম্ভার। বদরের চাইতে এই অবস্থা কম ভয়াবহ নয়; বরং কাফেরদের তেজ ও প্রতিহিংসা পূর্বের তুলনায় এবারে সহস্রগুণ

www.pathagar.com

অধিক। অথচ মুসলমানের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা খুব-একটা ভালো নয়। এই যুদ্ধেও রাসুল (সাঃ)ই সিপাহসালার, সর্বাধিনায়ক; তিনি সেদিন দুটি বর্ম পরিধান করেছিলেন। কাফেরদল তাঁবু ফেলেছে মদীনার খুবই নিকটবর্তী মাত্র দেড়-দুই মাইল দূরে ওহোদ পর্বতের পাদদেশে। রাসুল (সাঃ) যথোচিত যোদ্ধাবেশে সবাইকে নিয়ে দুশমনদের মোকাবিলার জন্য যাত্রা করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, কী-এক সামান্য অজুহাত তুলে আবদুল্লাহ বিন উবাই তার অনুগত তিনশত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে ফিরে এলো মদীনায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের চূড়ান্ত মোনাফেকীর দৃষ্টান্ত সম্ভবত আর নেই। আসলে কোন মুনাফিক কোন বড় কাজে অংশগ্রহণ করুক, এটা আল্লাহর ইচ্ছা নয়; আর তিনি তাঁর রাসুল (সাঃ)কে সঠিকভাবে চিনিয়েও দিলেন, কে প্রকৃত মোনাফিক আর কে আল্লাহর পথে উৎসর্গীতপ্রাণ প্রকৃত মুজাহিদ। এবং এই ঘটনা থেকেই মুসলিম মিল্লাত সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করলো, ইসলাম শুধু বহিরাক্রমণেরই লক্ষ্যস্থল নয়, মুনাফিকরূপী আভ্যন্তরীণ শত্রুও এই দ্বীনের বিরুদ্ধে সর্বদা সক্রিয়। যাই হোক, এখন মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা সর্বমোট মাত্র সাত শত। প্রতিপক্ষ দুশমনদের তুলনায় এক-চতুর্থাংশেরও কম। রণবিজ্ঞানের কোন নিয়মেই পড়ে না; বাহ্যিক বিবেচনায় একেবারেই একটি অসম-প্রতিদ্বন্দ্বিতা! কিন্তু রাসুল (সাঃ) ও তাঁর সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে নিঃশঙ্ক, প্রসন্ন-প্রশান্ত তাঁদের মুখশ্রী, আল্লাহর পথে শাহাদাতের তীব্র তামান্না নিয়ে তাঁরা একই সঙ্গে অধীর ও অবিচল। তাঁদের হৃৎপিন্ডে শুধু একটিমাত্র আওয়াজ নিস্বনিত, 'বালিল্লাহু মাওলাকুম ওয়া হুওয়া খাইরুন নাসিরীন'- আল্লাহপাকই প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী (সুরা ইমরান)।

বিগত বদরযুদ্ধে আবু জেহেল, ওতবা প্রমুখ বহু জাহান্নামের-ইমাম নিহত হয়েছে। কিন্তু আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এইবার এই ওহোদের ময়দানেও যারা সমবেত হয়েছে, তারাও খুব বড় বড় যোদ্ধা। এবং তারা শুধু দুর্ধর্ষ নয়, পিতৃ ও ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ-গ্রহণে তাদের জিঘাংসা ও উন্মত্ততারও এবার কোন সীমা পরিসীমা নেই। এদের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবু জেহেলের পুত্র যুদ্ধের সহ-অধিনায়ক ইকরিমা, আবদুল্লাহ বিন রবীয়া, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ শুরু হয়েছে, প্রচণ্ড যুদ্ধ। একদিকে ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত তাওহিদী-মুজাহিদ, অন্যদিকে লাত্-উজ্জা হোবলের পূজারী অংশীবাদী পৌত্তলিক সেনাবাহিনী। দেখা গেল, সৈন্যসামন্তের সংখ্যাধিক্য এবং অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও কাফেরদল আদৌ সুবিধা করতে পারছে না। আল্লাহর অনুগ্রহে সামগ্রিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে মুসলিম বাহিনীর অনুকূলে। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে কাফেররা পশ্চাদপসরণ করছে; এবং তারা সবকিছু ফেলে দ্রুতবেগে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়নপর; বলা যায় বদর যুদ্ধেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে। কিন্তু অকস্মাৎ যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বদলে গেল; মুসলিম বাহিনীর উপর নেমে এলো অভাবনীয় বিপর্যয়। রাসুল (সাঃ)এর নির্দেশ বিস্মৃত হয়ে তীরন্দাজবাহিনী

www.pathagar.com

পলায়নপর শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন ও গণীমতের দিকে মনোযোগ দেবার কারণেই এই বিপর্যয়ের উদ্ভব। ভুলটা ছোট, কিন্তু অপরাধ বিরাট। আল্লাহপাক বুঝিয়ে দিলেন, কোন অবস্থাতেই রাসুল (সাঃ)এর নির্দেশ এক বিন্দু অমান্য করা যাবে না। করলে, নিশ্চিত বিজয়যে মুহূর্তমধ্যে ভয়াবহ বিপর্যয়ে পরিণত হবে, এটা অবধারিত। ওহোদের বিপর্যয় একেবারে শুরুতেই এই রকমের একটা শিক্ষনীয় দৃষ্টান্তের অবতারণা করে মুসলিম উম্মাহকে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত সতর্ক করে দিল। এই সতর্কতার সরল অর্থ, জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)এর যে-কোনরূপ অবাধ্যতা সমূহ ধ্বংস ও বিপর্যয় ও আত্মঘাতেরই নামান্তর। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, এমন অবিস্মরণীয় উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও, কিছু মুনাফিক ও অর্ধ-মুনাফিকদের প্ররোচনাবশত মুসলমান সেই প্রথম কাল থেকে অদ্যাবধি রাসুল (সাঃ)এর শিক্ষা ও নির্দেশ পুনঃ পুনঃ শুধু অবহেলাই করে আসছে।

যাই হোক, ওহোদের ময়দানে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়নি বটে, কিন্তু বিজয়ও লাভ করেনি। নিশ্চিত বিজয়ের সাফল্য ধরা দিয়েও হারিয়ে গেল, বরণ করে নিতে হলো নিদারুণ বিপর্যয়। এই যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছেন, মারাত্মকভাবে আহত সাহাবীদের সংখ্যাও ছিল অনেক। রাসুল (সাঃ)এর প্রিয়তম পিতৃব্য হজরত আমীর হামজা (রাঃ) এই যুদ্ধেই শাহাদাত লাভ করেন। রাসুল (সাঃ) নিজেও গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁর দুটি পবিত্র দাঁত ভেঙ্গে যায়; মাথার মধ্যে শিরস্ত্রাণের হুক্ এমনভাবে ঢুকে যায় যা বের-করাই ছিল কঠিন। অতিরিক্ত রক্তপাতে নিস্তেজ ও অচৈতন্য হয়ে পড়েন রাসুল (সাঃ)। তাঁর নিরাপত্তা-রক্ষার দায়িত্বে যে-মুষ্টিমেয় ক'জন সাহাবী নিয়োজিত ছিলেন, তাদের মুহাব্বত ও কোরবানীর পরাকাষ্ঠা ইসলামের সর্বকালের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। তাঁরা সবাই রাসুল (সাঃ)এর পবিত্র দেহকে আড়াল করে আপনাপন বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, হজরত তালহা (রাঃ) আপন শরীরে আশিটিরও অধিক অস্ত্রাঘাত বরণ করে নেন। রাসুল (সাঃ)এর প্রতি, ইসলামের প্রতি, এই হলো মুহাব্বতের নমুনা। আর আজ আমাদের মুহাব্বত শুধু দরুদ ও জিকির-ফিকিরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইসলামের ইতিহাস-যে কত কোরবানীর কত রক্তঝরানো কন্টকাকীর্ণ ইতিহাস, তা আর এখন ভুলেও আমাদের মনে পড়ে না। যাই হোক, ওহোদের যুদ্ধে মদীনায় এমন কোন পরিবার ছিল না, যে-পরিবার থেকে কেউ-না-কেউ শাহাদাত বরণ করেন নি। অথচ কী-বিস্ময়কর, আজ 'ইসলামপ্রেমী আপাদমস্তক মুত্তাকী' একশ্রেণীর মুরুব্বি সব ইতিহাস ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে গিয়ে নসীহত করছেন, 'ইসলামে লড়াই নেই, শাহাদাতের তামান্না, রক্তের নজরানা এসব কিছুই নেই; আছে শুধু দোয়া দরুদ আর হুজরাখানায় বা নিরাপদ ময়দানে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে 'আমীন আমীন' কলরবে সব সমস্যার 'সুন্নাতি' সমাধান। এবং এমন নসীহতও শুনা যায়, ইসলাম

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিকমতের জোরে এক রক্তপাতহীন উদার কুসুমাস্তীর্ণ পথে। বদনসীব! যত দিন যাচ্ছে, মুসলমান ততই প্রবেশ করছে গভীর থেকে আরো-গভীর এক বাস্তবতাহীন বায়বীয় আচ্ছন্নতার মধ্যে।

ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় তৃতীয় হিজরীর শেষ দিকে। এই যুদ্ধে মুসলমানদের যে-বিপর্যয় ঘটে, তার ফলে দূরবর্তী অনেক স্থানে-তো বটেই, এমনকি খোদ মদীনা ও তার পাশ্ববর্তী এলাকাতেও কাফের মুশরিক মুনাফিকদের সাহস ও তৎপরতা বিশেষভাবে বেড়ে যায়। নানারকম গোপন ও প্রকাশ্য বিরামহীন শত্রুতার মোকাবিলায় মুসলমানদের দিবারাত্রি অসম্ভব সতর্কতা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে অতিবাহিত হতে লাগলো। অবশ্য যত যাই ঘটুক, রাসুল (সাঃ)এর নেতৃত্বে মুসলমানরা সর্বদায়ই অবিচল ও নিঃশঙ্ক। তাঁরা মুহূর্তের জন্যও ক্লান্ত কি হতোদ্যম হননি। ইসলামের বিজয় ও সুরক্ষার জন্য ত্যাগ তিতিক্ষা ও জীবন-সম্পদের নজরানা তাঁরা অকাতরে পেশ করে চলেছেন। কিন্তু এতদ্‌সঙ্গে বাস্তবতা হলো, একটি দিন একটি মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি নেই; মহানবী (সাঃ) এর-তো নেই-ই। চতুর্দিক থেকে আগত-উদ্ভুত একটার পর একটা ছোট-বড় যুদ্ধ ও সমস্যার মোকাবিলা করে যেতে হচ্ছে। ওহোদ-পরবর্তী কতকগুলি ঘটনা বেশ উল্লেখযোগ্য। আবু সালামা (রাঃ)এর নেতৃত্বে ছারিয়া, আবদুল্লাহ বিন উনাইসের (রাঃ) অভিযান, ইহুদি ও মুনাফিকদের প্ররোচনায় বনু নাজিরের সর্বাত্মক যুদ্ধ-প্রস্তুতি ও অবশেষে যুদ্ধ, বনু গাতফান-বনু মাহরাব-বনু ছালাবার বিরুদ্ধে নজদের যুদ্ধ ইত্যাদি অনেক সশস্ত্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হলো মুসলমানকে। সকল ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষ মারাত্মকরূপে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছে সত্য, মুসলমান নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছে এটাও সত্য, কিন্তু এগুলি সবই-যে এক-একটি উৎকট সমস্যা এ-নিয়ে কোন মতভেদ নেই। বিশেষ করে, এই সময়ে 'রাজী' ও 'বীরে-মাউনার' যে-মর্মান্তিক অকল্পনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হলো, তার চেয়ে দুঃখবহ আর কিছু হয় না। কতিপয় প্রতারকের কথায় বিশ্বাস স্থাপনকরত রাসুল (সাঃ) দশজন সাহাবীকে তাবলিগী কাজে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রতারকেরা তাদের এলাকায় গিয়ে এই সাহাবীদেরকে হত্যা করে। এবং এরই মাত্র এক মাসের মধ্যে 'বীরে মাউনা'র ঘটনা। একই রকম প্রতারণাপূর্ণ আহবানে রাসুল (সা) কর্তৃক সরল বিশ্বাসে প্রেরিত সত্তরজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই দুটি ঘটনায় রাসুল (সাঃ) এত কষ্ট পেয়েছিলেন, যা বর্ণনাতীত। সত্যই কী-অভাবনীয় দুর্ঘটনা। রাসুল (সাঃ) বুঝতেই পারেন-নি, কী-নীচ প্রতারণার শিকার হতে যাচ্ছেন তিনি। আসলে অনেকে-যে বলেন, রাসুল (সাঃ) গায়েব জানতেন, সেটা ভুল। গায়েবের খবর আল্লাহপাক ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহ তাঁর রাসুলকে যেটুকু জানাতেন, তিনি সেইটুকই জানতেন।

যাই হোক, ওহোদ-পরবর্তী একটি বছর এত অসংখ্য সংকট ও ঘটনা-দুর্ঘটনার

www.pathagar.com

মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে লাগলো যে, রাসুল (সাঃ) রাসুল না-হলে সে-সবের মোকাবিলায় দৃঢ়পদে অটল থাকা সম্ভবই ছিল না। আর তাঁর সাহাবীরাও সর্বোচ্চমানের গুণসম্পন্ন না-হলে, তাঁদের পক্ষেও সত্যের উপর টিকে থাকা অসম্ভব ছিল। সবই আল্লাহপাকের অনুগ্রহ ও অভিপ্রায়। আসলে আল্লাহপাক দেখতে চান কোরবানী, দেখতে চান বিপদ-মুসিবতের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যেও আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)এর প্রতি নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ, দেখতে চান আল্লাহর পথে সর্বস্ব নিবেদনের তামান্না নিয়ে অটল ও অবিচল ও অকুতোভয় দৃঢ়তা। এটাই ইসলাম, এটাই ইসলামের প্রকৃত রূপ ও প্রকৃত অভিজ্ঞান। এবং বস্তুত এইজন্যই ইসলামে বিশ্রাম বলে কিছু নেই, নিরুদ্বেগ বির্ঝঞ্ঝাট অবসর-অবকাশও নেই; বলাই বাহুল্য, রাসুল (সাঃ)এর পুরো তেইশ বছরের নবুয়তি জিন্দিগী এই প্রমানই বহন করে। ইসলাম মানে শ্বেতপ্রাসাদে মখমলের শয্যায় উপাধানে শরীর এলিয়ে বাদশাহী করাও নয়, তপোবনে গাভীর দুধ খেয়ে খেয়ে সংসার ও পৃথিবীবিমুখ বাতেনী-তপস্যাও নয়। আল্লাহপাক বলেন, 'ওয়া কাতিলুহুম হাত্তা লাতাকুনা ফিত্নাতুন' - ফিত্না সমূলে উৎপাটিত না-হওয়া পর্যন্ত তোমরা লড়াই করো (সুরা আনফাল)। কিন্তু ফিতনা কি পুরোপুরি কখনো উৎপাটিত হয়? যেহেতু হয় না, জিহাদ থেকে মুসলমানের অবকাশ-গ্রহণের কোন সুযোগও হয় না। ধরাপৃষ্ঠে ইসলামকে নিয়ে, মুসলমানকে নিয়ে এটাই আল্লাহপাকের মুখ্য অভিপ্রায়। কাজেই মৃগনয়না পদ্মারাগমনিসদৃশ হুরদের মালিকানা লাভের খেয়ালে যাঁরা সংসার ও সমস্যা-নিরপেক্ষ এক কৃচ্ছ্র নিরবচ্ছিন্ন 'ইবাদতের' মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছেন, তাঁরা সম্ভবত বোঝেনই-না যে, ইসলাম কী জিনিষ! অবশ্য বুঝলেই 'বিপদ'; কারণ আল্লাহপাকের এরশাদকৃত সেই পবিত্র আয়াতটি তখন এমনভাবে সামনে এসে দাঁড়ায়, যখন আর 'তাকওয়া' পরহেযগারীর ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যার বাহানা নিয়ে বেশি সময় নিরাপদে থাকা যায় না; আমরা আমাদের নিরাপত্তাবেষ্টিত তাকওয়ার গরমিলটাকে সহজেই তখন অনুধাবন করতে বাধ্য হই। আল্লাহ বলেন, 'আম হাসিব্তুম আন্ তাদ্খুলুল জান্নাতা ওয়া লাম্মা ইয়ালামিল্লাহুল্লাজীনা জাহাদু মিন্কুম ওয়া ইয়ালামাছ্ছাবিরীন' তোমরা কি এই খেয়ালে আছো যে জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখানো পরীক্ষা গ্রহণই করেন-নি, কে তোমাদের মধ্যে জেহাদকারী এবং আল্লাহর পথে জিহাদে কে কতখানি অটল ও অবিচল (সূরা আল ইমরান)।

মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ছিলেন আল কোরআনের হুবহু প্রতিবিম্ব। অতএব কুরআনুল কারীমে এরশাদকৃত যা-কিছু কথা ও আদেশ-নির্দেশ তা-যে সবই সর্বতোভাবে রাসুল (সাঃ)এর জীবন ও কর্মের মধ্যে ষোলআনা প্রতিফলিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'ওয়ালা নাব্লু ওয়ান্নাকুম হাত্তা নালাআমাল মুজাহিদীনা মিনকুম ওয়াছ্ছাবিরীনা ওয়া নাব্লু ওয়া আখ্বারাকুম' অর্থাৎ, যারা সংগ্রামশীল ও ধৈর্যশীল, তাদের ধৈর্য ও সংগ্রামের পরীক্ষা চলতেই থাকবে।

www.pathagar.com

যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হয় যে, তারা জয়যুক্ত (সুরা মুহাম্মদ)। অতএব রাসুল (সাঃ)তো বটেই, সকল সাহাবীকেও আজ সংগ্রাম ও সহনশীলতার পরীক্ষায় শতকরা একশ'ভাগ সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে হবে। যাই হোক, ইহুদিদের নিরন্তর কুপ্ররোচনা নানাদিকে নানা গোত্রের শাঠ্য ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ কঠিন হাতে যথাসময়ে দমন ও স্তব্ধ করে দিয়ে, মোটামুটি একটা শান্ত ও স্থিতিশীল অবস্থা রাসুল (সাঃ) কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন। অবস্থা মোটামুটি অনুকূলই বলা যায়। কিন্তু এই শান্তি দীর্ঘসময় অক্ষত থাকে নি।

মুশরিকদের ঘোষণা ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় কথা ছিল বদরের প্রান্তরে মুশরিক ও মুসলিম বাহিনী দ্বিতীয়বার মুখোমুখি রণে অবতীর্ণ হবে। রাসুল (সাঃ) তাঁর বাহিনী নিয়ে বদরে উপস্থিত হলেন। আবু সুফিয়ানোর নেতৃত্বে মক্কার কাফেররাও যথোচিত প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে রণক্ষেত্রের দিকে। কিন্তু পথিমধ্যে কী-যে হলো, আবু সুফিয়ান ভয়ে ও নানা ভাবনা-চিন্তায় অস্থির হয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফিরে গেল মক্কায়। রাসুল (সাঃ) কয়েকদিন অপেক্ষা করে সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন মদীনায়। যুদ্ধ আর হলো না; কিন্তু ইতিহাসে এটাকেই বলা হয় দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ। কিন্তু যত যাই হোক, দুটি জিনিষ কিছুতেই ইসলামের পিছু ছাড়ছে না; দু'টি গুরুতর উপসর্গ বিরামহীনভাবে মুসলমানকে অস্থির করে রাখছে। মাঝে মাঝে একটু-একটু স্তিমিত হয় বটে কিন্তু কিছুদিন যেতে না-যেতেই আবার আগের মতই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এর একটি হলো, ইহুদিদের স্বভাবগত উসকানি ও ষড়যন্ত্র, এবং অপরটি হলো মুশরিকদের প্রাণান্ত প্রতিহিংসা। অবশ্য এটা কেবল ইসলামের প্রথমকালের কথা নয়; অথবা রাসুল (সাঃ)এর জীবদ্দশায় সার্বক্ষণিকভাবে তৎপর একটা দুশমনি, সে-কথাও নয়; ইহুদি ও মুশরিকদের এই প্রাণঘাতী বৈরিতা ইসলাম ও মুসলমানের জন্য একটি স্থায়ী ও উগ্র উপসর্গ। এই বিদ্বেষ ও দুশমনি নানা বর্ণে নানা রূপে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এবং আল্লাহপাক এইজন্যই বলেছেন, 'লা তাজিদান্না আশাদ্দান্নাসি আদা ওয়া তাওয়ালিল্লাজীনা আমানুল ইয়াহুদা ওয়াল্লাজীনা আশরাকু' আপনি দেখবেন, মুসলমানের প্রতি শত্রুতায় সর্বাধিক উগ্র হলো ইহুদি এবং পৌত্তলিক (সূরা মায়িদা)। বুরবাক ধরনের মুসলমান এই কথার বিশেষ গুরুত্ব না-দেবার কারণে বা ভুলে থাকার কারণে কতবার কতরূপে বিপদ-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, ইতিহাসে তার কত-যে সাক্ষ্য কত-যে নমুনা, তার শেষ নেই। অথচ কী-দুর্ভাগ্য, মুসলমানের এখনো কোন বোধোদয়ই ঘটলো না!

যাই হোক, ভয়ে-দুর্ভাবনায় কিছুদিন নীরব ও স্তিমিত থাকার পর ইহুদীরা আবার তাদের পূর্ব-তৎপরতা পূর্বের মতই শুরু করে দিল। তাদের শাঠ্য ষড়যন্ত্র বেশ সফলও হলো। মক্কার কুরাইশরাতো বটেই, সারা আরবের মুশরিকরাই ইহুদীদের ইন্ধনে তাদের

www.pathagar.com

ধূমায়িত প্রতিহিংসাকে আবার একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রূপদান করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। বলা যায়, পুরো আরবের সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে চতুর্দিক থেকে মদীনা আক্রমণের জন্য ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে আসলো। কিন্তু রাসুল (সাঃ)তো শুধু 'আলখাল্লা পরিহিত' সর্ববিষয়ে উদাসীন ও বেখবর 'হুজুর' মাত্র নন, তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক ও অভাবনীয় প্রজ্ঞা-দূরদর্শিতার অধিকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর-অধিনায়কও বটে। কাফের-মুশরিক-মুনাফিকদের সম্মিলিত আক্রমণের যে-প্রস্তুতি, সে খবর তিনি যথাসময়ে পেয়েছিলেন; এবং কালবিলম্ব না-করে তিনি যথোচিতভাবে তৈরীও ছিলেন। প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হলেও ইনশাআল্লাহ এইবারও মুসলিম বাহিনীই জয়লাভ করতো, কিন্তু রক্তক্ষয় ও মদীনার নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে রাসুল (সাঃ) বিশিষ্ট সাহাবী হজরত সালমান ফারসি (রাঃ)এর পরামর্শক্রমে মদীনার প্রবেশপথে দীর্ঘ প্রশস্ত ও গভীর একটি পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই পরিখা খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। এটাই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পরিখার যুদ্ধ বা খন্দকের যুদ্ধ।

মক্কার কুরাইশরা চার-হাজারের এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে মদীনাভিমুখে যাত্রা করলো, অন্যান্য এলাকা থেকেও সৈন্য আসলো, এবং আরবের যেখানে যত ইহুদি-নাসারা-মুশরিক ছিল, তারা সবাই বিপুল উদ্যমে এসে যোগ দিল। ইসলামের এই প্রতিপক্ষ সম্মিলিত বাহিনীর সর্বমোট সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ালো দশ সহস্র। কিন্তু এই বিশাল সৈন্যদল মদীনার উপকণ্ঠে এসে একেবারে হতবাক; এ-কী অভিনব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা! মদীনার উত্তর দিকটাই শুধু খোলা, অন্য কোন দিক থেকে আক্রমণের কোন উপায় নেই। অথচ এই উত্তর-দিকটা পুরোপুরি পরিখা দ্বারা এমনভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে, যা অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়া একেবারেই অসম্ভব। উপরন্তু এপারে রাসুল (রাঃ)এর যথোচিতভাবে প্রস্তুত সদাসতর্ক মুজাহিদ-বাহিনীতো আছেই। অতএব এই পরিখা, এই প্রহরা সামনে রেখে কাফের-মুশরিকদের বসে বসে শুধু উট জবাই করে খাওয়া ও খাদ্যসম্ভার ধ্বংস করা ছাড়া করার মত কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। পরিখার সংকীর্ণ দু'একটি জায়গা বেছে নিয়ে দু'চারজন পার হয়েছিল, কিন্তু এক-দু'জন বাদে কেউ আর নিরাপদে ফিরে যেতে পারে নি। পরিখার এই কুশলি প্রতিরক্ষার কারণে মুসলিম বাহিনী একরকম বিনাযুদ্ধেই জয়লাভ করলো। আবু সুফিয়ান ও তার বিশাল বাহিনী প্রায় মাসখানেক অপেক্ষা করার পর কোন উপায়ান্তর না-দেখে একদিন এক ঝড়-দুর্যোগের রাতে সবাই অবরোধ উঠিয়ে পরাজিত বিপর্যস্ত অবস্থায় প্রস্থান করলো। এবারে কোন রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয় নি; আল্লাহপাকের ইচ্ছায় প্রতিরক্ষার অভিনবত্বের কারণে কাফেরদের পক্ষে মুখোমুখি রণে অবতীর্ণ হবার কোন সুযোগই ছিল না। দূর থেকে তীর বল্লম নিক্ষেপ এবং কিছু কাফেরের হঠকারিতায় দু'একটি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কারণে, এই যুদ্ধে দশ জন কাফের নিহত হয় ও ছয়জন মুসলমান শাহাদাত লাভ করেন। পরিখার এই যুদ্ধ

www.pathagar.com

সংঘটিত হয় পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে।

বদর এবং ওহোদের পর কাফেরদের প্রতিহিংসা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার উগ্র নেশা ও উন্মত্ততাও বেড়ে ছিল। কিন্তু খন্দকের এই যুদ্ধের পর ইহুদী-মুশরেকরা এটা খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করলো যে, রাসুল (সাঃ)এর নেতৃত্বে মুসলমানেরা অজেয়-অপরাজেয়। তাদেরকে বিব্রত করা যায় কিন্তু পরাভূত করা যায় না। অতএব কাফেরদের কষ্ট ও জিঘাংসা ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেলেও সাহস ও পুনরাক্রমণের নেশা অস্বাভাবিকরূপে স্তিমিত হয়ে এলো। অবশ্য খুব সংগত ও স্বাভাবিক কারণেই এই অবস্থার সৃষ্টি। কারণ কুচক্রী ইহুদীদের পরামর্শ ও সার্বিক সহায়তা নিয়ে মুশরিকরা যে-বিশাল সৈন্য-সমাবেশ ঘটিয়েছিল, তার চেয়ে বেশি কিছু করা আর সম্ভব নয়, কখনো সম্ভব হবেও না। সেটাই ছিল তাদের শক্তি ও বিক্রমের সর্বোচ্চ স্তর। অতএব পৌত্তলিকদের সকল উদ্যম ও মনোবল একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়লো। সবদিক থেকে তারা এটা বুঝতে পারলো যে, মদীনায় বিকাশমান এই ইসলামী-শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ানো একেবারে চূড়ান্ত মূঢ়তা; পরাক্রম প্রদর্শনের দিন অতি দ্রুতই অস্তমিত হয়ে আসছে। আর রাসুল (সাঃ)ও এই যুদ্ধের পরই প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন, এখন আর শুধু প্রতিরোধ আর প্রতিরক্ষা নয়, প্রয়োজনবোধে এখন থেকে আমরাই অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করবো। অতএব এদিক থেকে পরিখার যুদ্ধ ইসলামী বিজয়াভিযানের একটি ইতিবাচক টার্নিং পয়েন্ট।

খন্দকের যুদ্ধ থেকে রাসুল (সাঃ) তাঁর সকল মুজাহিদ সাহাবাসহ প্রত্যাবর্তন করেছেন মাত্র; অনেকে তখনো যুদ্ধের পোষাক ও সাজ-সরঞ্জাম পরিত্যাগও করেন নি। আল্লাহপাকের নির্দেশে এই অবস্থায়ই আবার যুদ্ধযাত্রা। এবার অভিযান বনু কোরায়জার বিরুদ্ধে। হজরত আলী (রাঃ)এর হাতে পতাকা দিয়ে রাসুল (সাঃ) তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ বনু কোরায়জার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এই ইহুদী-গোত্রের সঙ্গে মুসলমানদের মৈত্রীচুক্তি ছিল, কিন্তু তারা সে-চুক্তি শুধু ভঙ্গই করে-নি, পরিখা যুদ্ধের কঠিন সময়ে পৌত্তলিকদের সাথে একজোট হয়ে মুসলমানদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেবার চূড়ান্ত তৎপরতায়ও লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহপাকের অভিপ্রায়, তারা সকল ক্ষেত্রেই সর্বতোভাবে ব্যর্থকাম হয়েছে। কিন্তু তাদের নীচ ষড়যন্ত্র ও তৎপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও পুনঃপুনঃ চুক্তিভঙ্গের সমুচিত শিক্ষা দেয়া বিশেষ জরুরি; এবং সেই ব্যবস্থাই রাসুল (সাঃ) গ্রহণ করলেন। বনু কোরায়জা শাঠ্যে ষড়যন্ত্রে পারঙ্গম হলেও তারা মুখোমুখি কোন রণে অবতীর্ণ হবার মত সাহসী ছিল না। অবশ্য এটাই ইহুদীদের আবহমান কালের স্বভাববৈশিষ্ট্য। তাদের মধ্যে হিম্মত ও পরাক্রম বলে কোন পদার্থ নেই, তারা বরাবরই শঠ ও প্রবঞ্চক। যাই হোক, অনেক দিক ভেবেচিন্তে বনু কোরায়জা রাসুল (সাঃ)এর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলো। এই

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণকারী বনু কোরায়জার বিরুদ্ধে কী-ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সেটা রাসুল (সাঃ) নিজের হাতে না-রেখে তাদেরই ইচ্ছানুযায়ী তাদের এক মিত্রস্থানীয় ব্যক্তি সাদ ইবনে মাযকে ফয়সালা-দানের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। সাদ ইবনে মায ইহুদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল বটে কিন্তু পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে তিনি যে-ন্যায় ও যথার্থ ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা প্রদান করলেন, তা সত্যই স্মরণীয়। তিনি ঘোষণা করলেন—নারী ও শিশুকে বন্দী করা হবে, সকল ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বন্টন করা হবে এবং সকল পুরুষ সদস্যকে হত্যা করা হবে। ইবনে মাযের এই সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হলো। ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে ছয় শতাধিক ইহুদীকে এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক হত্য করা হয়। এবং এইভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটলো কুচক্রী বনু কোরায়জার বিরুদ্ধে পরিচালিত মুসলমানদের বিজয়াভিযান। আল্লাহপাকের কথার-তো কণামাত্র ব্যত্যয় নেই; তবু আবেগে অনুরাগে বার বার উচ্চারণ করতে হয়, সত্যই আল্লাহপাকের ওয়াদা কতই-না অকাট্য। আল্লাহপাক বলেন, 'লাঁইয়া দুররুকুম ইল্লা আযা,ওয়া ইউকাতিলুকুম ইউওয়াল্লুকুমুল আদবার, ছুম্মা লাইউনছারুন'-যৎসামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া, তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে, তারা পশ্চাদপসরণ করবে। এবং তাদের কোন প্রকার সাহায্য করা হবে না (সূরা ইমরান)।

বনু কোরায়জার বিরুদ্ধে সফল অভিযান ও যথোচিত ব্যবস্থাগ্রহণের পর অবস্থা প্রায় পুরোপুরিই ইসলামের অনুকূলে চলে এসেছে। ইসলামের বিরুদ্ধে অসূয়া ও বৈরীভাব পুরোপুরি প্রশমিত না-হলেও, ইহুদি মুশরিকদের মনোবল ও অস্ত্রধারণের সাহস আর বেশি অবশিষ্ট নেই। এমতাবস্থায় বড় কোন যুদ্ধেরও সম্ভাবনা নেই। তবু কোন-না-কোনভাবে কাফের মুশরিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে আবার কখনো যাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার দুঃসাহস না-দেখায়, এজন্য রাসুল (সাঃ) নানাদিকে ছোটখাটো অনেকগুলি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। কোন কোন অভিযানে রাসুল (সাঃ) স্বয়ং নেতৃত্ব দিয়েছেন, কোন-কোনটিতে অন্য কাউকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান করেছেন; তবে কোনটাই তেমন বড় যুদ্ধ ছিল না। চতুর্থ হিজরীর প্রথম দিক থেকে ষষ্ঠ হিজরীর মধ্যভাগের কিছু পরবর্তী সময় পর্যন্ত এই সকল ছোট ছোট অভিযান পরিচালিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সব যুদ্ধেই শত্রুপক্ষ পরাজয় বরণ করেছে অথবা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ; মুসলমানেরা কোন অভিযানেই কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি। শুধু সারিয়া জুল কেসসা নামক একটি অভিযান একটি ব্যতিক্রম। রাসুল (সাঃ) এই অভিযানে মোহাম্মদ ইবনে মোসলেমার নেতৃত্বে ১০ জন মুজাহিদের একটি দল প্রেরণ করেন। দুশমনরা আত্মগোপন করে থাকে; তারপর সাহাবারা ঘুমিয়ে পড়লে সুযোগ বুঝে অতর্কিতে আক্রমণ করে। একমাত্র দলনেতা মোহাম্মদ ইবনে মোসলেমা ছাড়া অবশিষ্ট ৯ জনই এই হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। এই দুঃখবহ

www.pathagar.com

ঘটনাটি ঘটে ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে। রাসুল (সাঃ) এর যুদ্ধনীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, দুশমনের কোন ঔদ্ধত্যকেই তিনি বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দিতেন না, যথোচিত ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এইজন্য পরের মাসেই হজরত আবু ওবায়দার নেতৃত্বে ৪০ জন সাহাবার একটি বাহিনী পুনরায় জুল কেস্‌সা-তে রাসুল (সাঃ) প্রেরণ করলেন। কিন্তু শত্রুরা খুব দ্রুত পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে গেল। শুধু একজন যাকে এই অভিযানে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়, সেই ব্যক্তিও ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানে পরিণত হয়।

খন্দকের যুদ্ধ ও বনু কোরায়জার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান থেকে হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত, এই কিঞ্চিদধিক আড়াই বছর সময়কালে বহুসংখ্যক গাজওয়া ও সারিয়া সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ হলো গাজওয়া বনি মুস্তালেক। এই অভিযান সামরিক দিক থেকে খুব তেমন গুরুত্বপূর্ণ না-হলেও, দুটি বিশেষ কারণে ইসলামের ইতিহাসে এই গাজওয়া বনি মুত্তালেক বিশেষভাবে স্মরণীয়। বনু মুস্তালেকের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই অভিযানেই আবদুল্লাহ বিন উবাইসহ অন্যান্য মুনাফিকের প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহপাক পরিষ্কারভাবে উন্মোচন করে দেন; এবং এই অভিযানেই জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)র বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সম্পূর্ণ বানোয়াট উফুকের ঘটনাটি ঘটে। রাসুল (সাঃ) তাঁর সমগ্র পার্থিব জিন্দিগীতে যে-দু'একটি ঘটনায় অপরিসীম মানসিক কষ্ট পেয়েছিলেন, এই ভিত্তিহীন অপবাদের ব্যাপারটি তার অন্যতম। অপর একটি ঘটনা ছিল, মক্কা ছেড়ে আসার অব্যবহিত আগে তায়েফবাসীদের নির্মম ব্যবহার।

বলার কোন অপেক্ষাই রাখে না, মা আয়েশা সিদ্দিকা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ও পবিত্র। কিন্তু সর্বকালেই মিথ্যাবাদী মুনাফিকদের রসনা বড় কুৎসিতভাবে ধারালো। যাই হোক মুনাফিকদের তৈরী ও প্রচারিত অপবাদের কল্পকাহিনী সম্পর্কে মা আয়েশা প্রথমে কিছু জানতেই পারেন নি। পরে যখন জানতে পারলেন, তিনি নিজের নির্দোষিতা সম্পর্কে নিজে কিছু না-বলে, বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করে দিলেন। তিনি যে নিষ্পাপ নিরপরাধ ও পবিত্র, এ-বিষয়ে কতিপয় দুর্জন ছাড়া সবাই একবাক্যে তাদের দৃঢ় মতামত জ্ঞাপন করলেও, রাসুল (সাঃ) অহির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মা আয়েশার পবিত্রতার কথা জানিয়ে অহী নাজিল হলো। উফুকের এই ঘটনার সঙ্গে মুখ্যত যুক্ত ছিল চারজন। এক নম্বর আবদুল্লাহ বিন উবাই, এই দুর্বৃত্তই ছিল রটনার মূল পরিকল্পনাকারী ও নাটের গুরু। অবশিষ্ট তিনজন হলো মেসতাহ ইবনে আছাছা, হাসসান বিন সাবেত এবং হামনা। আসল যে-খলনায়ক মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই, তার আপ্যায়নের জন্য যেহেতু নিশ্চিতরূপেই জাহান্নাম অপেক্ষা করছে, এই দুর্বত্ত যেহেতু পার্থিব জীবনদ্দশায়ই জাহান্নামের সুসংবাদপ্রাপ্ত, তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয় নি। কিন্তু অবশিষ্ট তিনজনকে ৮০ টি করে বেত্রাঘাত করা হয়; কারণ

www.pathagar.com

এই ধরনের অসত্য-অপ্রমাণিত ব্যভিচারের অপবাদ রটনাকারীর জন্য ইসলামী আইনে এটাই নির্ধারিত শাস্তি। এতদসঙ্গে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য যে, এই রটনাকারীদের মধ্যে একজন এমন ছিল, যে-ছিল হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর প্রত্যক্ষ অনুগ্রহপুষ্ট আশ্রিত পোষ্য। সে একবারও ভাবলো না, যাঁর বিরুদ্ধে এই জঘন্য মিথ্যা-রটনায় সে অংশ নিচ্ছে, তিনি রাসুল (সাঃ)এর সহধর্মিনী-তো বটেই, হজরত আবু বকর সিদ্দিকের কন্যাও বটে। সত্যই কিছু মানুষের কৃতঘ্নতার কোন সীমাপরিসীমা নেই। আল্লাহপাক বলেন, 'ইন্নাল ইনসানা লিরাব্বিহি লা কানুদ' মানুষ স্বভাবতই তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ (সুরা আদিয়াত)। যাই হোক, ধিক্কৃত মুনাফিকের সৃষ্ট ধূলিমলিন মদীনার আবহাওয়া পরিচ্ছন্ন হয়ে আবার পূর্ববৎ শান্তির সুবাতাস বয়ে গেল।

গাজওয়া বনি মুস্তালেকের পর ষষ্ঠ হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধে রাসুল (সাঃ) বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন এলাকায় পর পর আরো কয়েকটি যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। এগুলির মধ্যে ছারিয়া দিয়ারে বনি কিলার, ছারিয়া দিয়ারে বনি সাদ, ছারিয়া ওয়াদিল কোরা, ছারিয়া উরনাইয়াইন প্রমুখ অভিযানের কথা অধিকাংশ ঐতিহাসিকই মোটামুটি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এ-সকল কোনো অভিযানে রাসুল (সাঃ) নিজে অংশ্রগহণ করেন নি; কোন-না-কোন সাহাবীকে তিনি দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। ছারিয়া ওয়াদুল কোরার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনায় হজরত যায়েদ বিন হারেসার (রাঃ) নেতৃত্বদানের কথা উল্লেখ আছে। উল্লেখ করা আবশ্যক, এ-সকল কোন অভিযানেই খুব বড় রকমের কোন সংঘর্ষ হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুশমনরা হয় ইসলাম কবুল করে নিয়েছে, নাহলে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছে। কেউ কেউ অবশ্য মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য মুসলিম মুজাহিদদের সরাসরি প্রতিরোধকল্পে যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ওই প্রস্তুতি পর্যন্তই, মুসলমানদের আগমনবার্তা শ্রুত হওয়া মাত্র সাহস হারিয়ে তারা পাহাড়ের দিকে পলায়ন করে। আসলে এই সকল অভিযান পরিচালনার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল বড় কোন সামরিক সংঘর্ষ নয়, লক্ষ্য ছিল ইহুদি মুশরিকদের মধ্য থেকে যুদ্ধের হঠকারিতা ও দুঃসাহসকে স্তব্ধ করে দেয়া, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে-কোনরূপ শাঠ্য ষড়যন্ত্র রচনার দুর্মতি থেকে বিরত রাখা। এবং এতদ্‌সঙ্গে জানিয়ে দেয়া যে, মুসলমান শুধু নামাজ রোজা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ইবাদত বন্দেগীতেই মশগুল থাকে না, জিহাদও তার কাছে ফরজ-ইবাদত; যে-কোন দুশমনের মোকাবিলায় মুসলমান সর্বদা সজাগ ও প্রস্তুত ও নিদ্রাহীন ; বুঝিয়ে দেয়া যে, মুসলমান আসলে রাতের দরবেশ দিনের অশ্বারোহী।

ইসলামের ইতিহাসে রাসুল (সাঃ)এর হিজরত কি প্রথম বদর যুদ্ধের যে-সীমাহীন গুরুত্ব ও তাৎপর্য, হুদাইবিয়ার সন্ধি সেই রকমই একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অথবা তার চেয়েও বেশি। হুদাইবিয়ার সন্ধি, আল্লাহপাক যাকে অভিহিত করেছেন 'ফাত্‌হুম

www.pathagar.com

মুবীন' প্রকাশ্য বিজয়, সেটিও ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকের ঘটনা। ইসলামের স্বাভাবিক ও আপাতমন্থর অগ্রযাত্রার পথে এটা একটা Turning point; অনেকটা পূর্ণ বেগ-প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তের বিন্দুকালীন প্রস্তুতি সময়ের মধ্যবর্তী অবকাশ। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) স্বপ্ন দেখলেন যে, তাঁর হাতে কাবাগৃহের চাবি; এবং তিনি ও তাঁর সাহাবীরা কাবাঘর তওয়াফ করছেন। এই মোবারক স্বপ্নের কথা জানিয়ে রাসূল (সাঃ) সবাইকে ওমরাহ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বললেন। সবাই অত্যন্ত উৎফুল্ল, সবারই অন্তর এক অপার্থিব আনন্দে ও ভাবাবেগে উদ্বেলিত; সত্যই-তো কতদিন পরে আবার তারা তাদের প্রাণপ্রিয় কাবাগৃহের পবিত্র অঙ্গনে সমবেত হবে! অবশ্য মক্কার মুশরিকদের স্বভাব-প্রকৃতি যে-রকম, ইসলামের নাম শুনলেই তাদের মধ্যে যে-রকম বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়, কে-জানে আবার কোন্ জিদ কোন্ জিঘাংসা কুরাইশদের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে! অতএব শেষপর্যন্ত কী হয় না-হয় এ-নিয়ে কারো কারো মধ্যে কিছু দ্বিধাও সৃষ্টি হলো।

তবু যাই হোক, অবশেষে হিজরী ষষ্ঠ বর্ষের পহেলা জিলকদ প্রায় দেড় সহস্র সাহাবা সঙ্গে নিয়ে রাসুল (সাঃ) ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সঙ্গে অন্য আর কিছু নয়, শুধু সবার কাছে কোরবানীর পশু ও একটি করে কোষবদ্ধ তরবারি। এই সফরে রাসুল (সাঃ) এর সঙ্গী ছিলেন মুসলিম উম্মাহর অন্যতম জননী উম্মে সালমা রাদীআল্লাহু আন্হা। যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে যে-রকম সন্দেহ করা হয়েছিল, পথিমধ্যে সেই রকমই সংবাদ পাওয়া গেল। মুসলমানদেরকে মক্কাপ্রবেশে সর্বাত্মকভাবে বাধা দেবার জন্য দুশমনেরা সংঘবদ্ধ হয়েছে, এবং লড়াই করবার জন্য তারা সর্বতোভাবে প্রস্তুত। ওমরাহ হোক যাই হোক, কুরাইশদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, তারা কিছুতেই মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। কঠিন সমস্যা। এমতাবস্থায় কী-করা যুক্তিযুক্ত, এ-বিষয়ে রাসুল (সাঃ) শীর্ষস্থানীয় সাহাবাদের মতামত জানতে চাইলেন। অনেকের অনেক রকম কথা, কিন্তু সকলের সব কথার সারাংশ হলো, যে-কোন রকম ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাঁরা অবশ্যই ওমরাহ পালন করবে। হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বললেন, 'এমতাবস্থায় কী করা উচিত, সে-বিষয়ে আল্লাহপাক এবং তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমরা এসেছি খালেস নিয়তে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্য নিয়ে। কারো সাথে লড়াই করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। তবে আমাদের উদ্দেশ্য-সাধনে যারা অন্তরায় সৃষ্টি করবে, আমাদের পবিত্র মাকসুদ পূর্ণ করতে যারা বাধা দেবে, আমরা অস্ত্র দিয়েই তাদের মোকাবিলা করবো'। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, 'তাহলে চলো'। সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে রাসুল (সাঃ) আল্লাহর উপর ভরসা রেখে অগ্রসর হলেন মক্কাভিমুখে। রাসুল (সাঃ) ঐকান্তিকভাবে আশা করেছিলেন, এই পবিত্র যাত্রায় কোথাও কোনরূপ বিঘ্নের উদ্ভব না-ঘটুক, কোন সশস্ত্র যুদ্ধের সূত্রপাত না-হোক। এই কারণে পথিমধ্যে, ক্ষুদ্র বৃহৎ যাই হোক, যে-কোন সংঘর্ষ পরিহার করবার জন্য রাসুল (সাঃ) মক্কাভিমুখী প্রধান সড়ক বর্জন করে একটু অন্যপথে প্রথমে সানিয়াতুল মারার

www.pathagar.com

এবং তারপরে মক্কার নিকটবর্তী হুদাইবিয়ার একটি জলাশয়ের নিকট যাত্রাবিরতি করলেন।

হুদাইবিয়াতে যাত্রাবিরতির পর অবস্থা নানা কারণে ক্রমেই সংকটাপন্ন হয়ে উঠছে। ওমরাহ পালন করা ছাড়া রাসুল (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের-যে দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নেই, একথা জেনেও মক্কার কাফেররা অসম্ভব রকম জেদী হয়ে উঠলো। তাদের একই কথা, তারা কিছুতেই মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। ভালোমন্দ নানারকম খবর আসতে লাগলো, করণীয় স্থির করাই কঠিন, অথচ মুসলমানেরা ক্রমাগত অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। কুরাইশদের দিক থেকে দু'একজন যারা রাসুল (সাঃ)এর সঙ্গে কথা বলার জন্য এসেছিল, তারা ফিরে গিয়ে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না-করার পরামর্শ দিলেও আদৌ কোন কাজ হলো না। বিশেষ করে যুবকরা কোন কথাই শুনতে রাজী নয়; তারা চায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এবং তাদের অস্থিরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, এক রাত্রিতে ৮০ জন সশস্ত্র যুবক সত্য সত্যই অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলো। কিন্তু মুসলমানেরা পুরোপুরি এমন সতর্ক ছিল যে, তাদের আক্রমণ শুধু নিষ্ফল হলো না, তারা সবাই মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। রাসুল (সাঃ) অবশ্য তাদের সবাইকে ক্ষমাকরত নিঃশর্তভাবেই মুক্তিদান করলেন। কিন্তু এতসব ঘটনার পরেও কুরাইশদের মধ্যে কোন শুভবুদ্ধির উদ্রেক ঘটছে না, তাদের নিরর্থক জিদ ও অস্থিরতাও প্রশমিত হচ্ছে না।

অবশেষে হজরত উসমান (রাঃ) কে মক্কায় পাঠানো হলো কাফেরদেরকে বুঝিয়ে শান্ত করবার দায়িত্ব দিয়ে। কুরাইশদের উপর তাঁর কিছুটা প্রভাব ছিল। তিনি মক্কায় গিয়ে নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের সঙ্গে মিলিত হলেন; কিন্তু কুরাইশরা মনঃস্থির করতে না-পারায় সিদ্ধান্ত দিতে পারছিলো না। বৈঠকের পর বৈঠক করে তারা শেষপর্যন্ত জানালো, হজরত উসমান (রাঃ) কাবাগৃহ তওয়াফ করে ফিরে যেতে পারে, কিন্তু আর কোন মুসলমানকে তারা মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। হজরত উসমান (রাঃ) রাসুল (সাঃ) এর আগে কাবাঘর তওয়াফে রাজী না-হয়ে একরকম নিষ্ফল হয়েই ফিরে এলেন। কিন্তু এদিকে হজরত উসমানের প্রত্যাবর্তন কিছুটা বিলম্বিত হওয়ায় মুসলমানদের মেধ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য-গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, কাফেরদের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন। এই অবস্থায় মুসলমানেরা প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো; এবং রাসুল (সাঃ)এর হাতে শপথ গ্রহণ করলো। এই শপথই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'বাইয়াতে রিদওয়ান'। কেউ কেউ এমনকি একাধিকবার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। শুধু একজন ব্যক্তি ছিল ব্যতিক্রম, তার নাম জাদ বিন কয়েস; সে ছিল আসলে একজন মুনাফিক। সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহপাকই সর্বজ্ঞ। ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য এটা একটা স্থায়ী উপসর্গ যে, সর্বকালে সর্বাবস্থায় দু'একজন অন্তত মুনাফিক থাকবেই। যাই হোক, রাসূল (সাঃ)এর

www.pathagar.com

হাতে মুমেনদের এই আমৃত্যু-জিহাদের দৃঢ় অঙ্গীকার 'বাইয়াতে রিদওয়ান' আল্লাহপাকের কাছে এত পছন্দ হয়েছিল যে, তিনি তাঁর সন্তুষ্টি ও মুসলমানদের নিকটবর্তী বিজয়ের সুসংবাদ জানিয়ে এরশাদ করেন 'লাকাদ রাদিআল্লাহু আনিল মুমিনীনা ইজ ইউবা ইউনাকা তাহাতাশ্ শাজারাহ, ফা আলিমা মা ফি কুলুবিহিম ফা আন্‌জালাছ্ ছাফিনাতা আলাইহিম ওয়া আছাবাহুম ফাত্‌হান কারীব' নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমেনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষতলে আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করলো। তাদের অন্তর সম্পর্কে আল্লাহ অবগত ছিলেন, তারপর তাদের উপর বর্ষণ করলেন প্রশান্তি এবং দান করলেন নিকটবর্তী বিজয় (সুরা আল ফাত্‌হ)।

যাই হোক, হজরত উসমান (রাঃ) ফিরে এসে রাসুল (সাঃ)এর কাছে কুরাইশদের অনমনীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সব কথা বিশদভাবে উপস্থাপন করলেন। বস্তুত একটি সমস্যাই বটে। দেড় সহস্রাধিক অকুতোভয় লড়াকু সাহাবা নিয়ে এমতাবস্থায় কী করবেন না-করবেন, এ-নিয়ে রাসুল (সাঃ) কিছুটা বিচলিত। অন্যদিকে হজরত উসমানকে বিদায় দিয়ে কুরাইশদেরও যথেষ্ট দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তির মধ্যে সময় কাটছে। মক্কার একেবারে এত কাছে দেড়-হাজার জানবাজ তওহিদী মুজাহিদ, কী হয় না-হয়, কুরাইশদের শঙ্কা আশঙ্কা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা আর সময়ক্ষেপন না-করে পরামর্শক্রমে ফোহাইল বিন আমরকে সন্ধি করবার জন্য পাঠালো। সোহাইল কুরাইশদের মনোভাব জানিয়ে রাসুল (সাঃ) এর কাছে উত্থাপন করলো সন্ধির কথা। বিস্তারিত আলোচনাশেষে মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে সন্ধির চুক্তিপত্র চূড়ান্তভাবে গৃহীত হলো, চুক্তিপত্রটি লিপিবদ্ধ করলেন হজরত আলী (রাঃ)। এই চুক্তিই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হোদাইবিয়ার সন্ধি; আল্লাহপাক যাকে প্রকাশ্য বিজয় 'ফাতহাম মুবীন' বলে সুরা ফাত্‌হে অভিহিত করেছেন।

হোদাইবিয়ার এই ঐতিহাসিক চুক্তিপত্রে চারটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, যার মোটামুটি সারসংক্ষেপ হলো—এক, এ-বছর ওমরাহ পালন না-করেই মুসলমানদের ফিরে যেতে হবে; তবে আগামী বছর তাঁরা ওমরাহ পালনার্থে তিন দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। এই অবস্থানকালীন সময়ে একটি কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া কোনরূপ কোন যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে রাখা যাবে না। দুই, যে-কোন গোত্র যে-কোন মতাদর্শে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে পারবে; এ বিষয়ে কোন পক্ষেরই কোন আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। তিন, উভয় পক্ষই সন্ধি-পরবর্তী দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখবে; কেউ কারো উপর কোনভাবেই আক্রমণ করতে পারবে না। এবং চার, কুরাইশদের কেউ মুসলমানদের সাথে যোগ দিলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে; কিন্তু মুসলমানদের কেউ ধর্মত্যাগী হয়ে কুরাইশদের মধ্যে ফিরে এলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না। মোটামুটি এই ছিল হোদাইবিয়ার সন্ধি।

www.pathagar.com

দৃশ্যত এই সন্ধিচুক্তি, বিশেষ করে প্রথম ও চতুর্থ ধারা-দুটি ছিল মুসলমানদের জন্য খুবই অবমাননাকর; যে-কারণে প্রায় সব সাহাবীই, এমনকি হজরত উমার ফারুক (রাঃ)ও এই চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করবার মনোভাব পোষণ করছিলেন। অথচ রাসূল (সাঃ) কর্তৃক গৃহীত হবার পর কারও কিছু করারও নেই, বলারও নেই। কিন্তু সকলেই দারুণভাবে মনঃক্ষুন্ন। হজরত উমার (রাঃ) সিদ্দীকে আকবর হজরত আবু বকর (রাঃ) এর কাছ গিয়ে কিছুটা ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) শুধু বললেন, 'উমার, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের প্রতি আমৃত্যু অবিচল থাকো'। এই কথায় তিনি কিছুটা শান্ত হলেন বটে; কিন্তু দুঃখ ও অশান্তির মেঘ অন্তর থেকে তখনো পুরোপুরি অপসৃত হলো না। যাই হোক, চুক্তি সম্পাদিত হবার পর ওমরাহ না-করেই শর্ত মোতাবেক সবাইকে এখন মদীনায় ফিরে যাবার পালা। রাসুল (সাঃ) সবাইকে সেই প্রস্তুতিগ্রহণ ও সঙ্গে-আনা পশু কোরবানী করতে বললেন। কিন্তু সবাই নিশ্চুপ নিশ্চল। রাসুল (সাঃ) বিস্মিত হলেন; তাঁর আদেশের মোকাবিলায় সাহাবীদের এ-কী অভিনব আচরণ! কিছুটা মনক্ষন্ন ও কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তিনি বিষয়টি আমাদের জননী হজরত উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আন্হার নিকট ব্যক্ত করলেন। হজরত সালমা (রাঃ) তাঁকে পরামর্শ দিলেন, 'আপনার পশুটি আপনি প্রথমে কোরবানী করুন, চিন্তার কোন কারণ নেই, দেখবেন যত দুঃখই থাক, সবাই আপনাকে অনুসরণ করছে' এবং কার্যত তাই-ই হলো। রাসূল (সাঃ) এর আনুসরণে সাহাবীরা সবাই স্ব স্ব 'হাদী' অর্থাৎ কোরবানীর নিয়তে আনীত পশু জবেহ করে ফেললেন। সত্যই একটি সমস্যার কত সহজ সমাধান। হজরত উম্মে সালমার এই প্রাজ্ঞ পরামর্শের কথা যথার্থই অবিস্মরণীয়। যাই হোক, সকলের সব দ্বিধা-সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে আল্লাহপাক হোদাইবিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপটে নাজিল করলেন সুরা আল ফাত্হ, যার প্রথম আয়াতেই আল্লাহপাক বলেন 'ইন্না ফাত্হাহ না লাকা ফাত্হাম মুবীন' নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি। রাসুল(সাঃ)এর কাছে এই আয়াত শোনা মাত্র হজরত উমার নিজের ভুল বুঝতে পেরে খুবই লজ্জিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন, এবং আমৃত্যু এ-নিয়ে তিনি অনুতাপ করেছেন।

আসলে বাহ্যত প্রথমে তাৎক্ষণিকভাবে যাই মনে হোক, অত্যল্প সময়ের মধ্যেই এটা সবার কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, হোদাইবিয়ার সন্ধি বস্তুতই ছিল মুসলমানদের জন্য একটি আল্লাহপ্রদত্ত সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য ও অলৌকিক বিজয়। অনেকটা হিজরতের মতই ঘটনা। আপাতদৃষ্টিতে মনুষ্যচক্ষে হিজরত ছিল কুরাইশদের কাছে পরাভব মেনে নিয়ে গোপনে দেশত্যাগ। কিন্তু না, হিজরতের মধ্য দিয়েই আসলে আল্লাহপাক ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন এক বহুমুখী সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। ঠিক হুবহু প্রায় একইরকম এই হোদাইবিয়ার সন্ধি। এই সন্ধির মধ্য দিয়েই আল্লাহপাক মুসলমানদেরকে দান করলেন একটি নিশ্চিন্ত সময় ও নিরাপদ পরিবেশ। কুরাইশরা ছিল

www.pathagar.com

ইসলাম ও নবী মোহাম্মদ (সাঃ)এর উগ্রতম দুশমন। তারাই পুন:পুন: মদীনায় ধেয়ে আসতো। ইসলামের প্রসার ও অগ্রযাত্রার বিরুদ্ধে তারাই ছিল সার্বক্ষণিক হুমকি। আল্লাহপাকের কী অলৌকিক অভিপ্রায়, সেই কুরাইশরা নিজে এসে দশ বছর শান্ত থাকবে বলে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে গেল। সত্যই মুসলমানদের জন্য অভিনব রক্তপাতহীন এক বিরাট বিজয়! উপরন্তু যে-শর্তটিকে বিশেষ অপমানকর বলে মনে হয়েছিল, সেটিও কিছুদিন যেতে না-যেতেই সীমাহীন সাফল্য বয়ে আনলো। মুসলমানদের দল ত্যাগ করে কেউ কুরাইশদের কাছে ফিরে গেলে, তাকে আর ফেরত পাওয়া যায় না; অথচ কুরাইশদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। কিন্তু ফেরত পাবার প্রয়োজন কী? মুসলমানদের দল থেকে স্বেচ্ছায় কি কেউ কখনো বহিস্কৃত হয়, কেউ-কি কখনো দলত্যাগ করে? আর যে এরকম করবে, সেতো সুস্পষ্ট মুরতাদ ও মুনাফিক। তকে ফিরিয়ে আনার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অপরদিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেও মুসলমানদের দলভুক্ত হতে পারছে না, সন্ধি ও শর্তের কারণে মদীনায় আশ্রয় পাচ্ছে না, তারা কুরাইশদের জন্য অচিরেই বিরাট মুসিবত হয়ে দেখা দিল। চুক্তির শর্ত মোতাবেক রাসুল (সাঃ) এই মক্কাত্যাগী মুসলমানদেরকে আশ্রয় না-দেয়ার কারণে তারা দলবদ্ধ হয়ে মদীনা থেকে দূরে কুরাইশদের বানিজ্য-কাফেলার উপর হামলা চালাতে লাগলো। কুরাইশরা তখন বাধ্য ও বিপদগ্রস্ত হয়ে রাসুল (সাঃ)এর কাছে আবেদন জানিয়ে চতুর্থ শর্তটি প্রত্যাহার করে নিতে চাইলো। রাসূল (সাঃ) সানন্দে সম্মত হলেন।

প্রকৃতপক্ষে কুরাইশরা ভাবতেই পারে-নি, চুক্তির সকল শর্তই তাদের পুরোপুরি বিপক্ষে চলে যাবে; এবং মুসলমানরাও ভাবতে পারে-নি, যে-সন্ধিচুক্তিকে তারা প্রথমে মনে করেছে অবমাননাকর, তার মধ্যে লুক্কায়িত আছে, এত সাফল্য, আল্লাহপাকের এত অফুরন্ত রহমত। উপরন্তু হোদাইবিয়ার সন্ধির কারণে অন্য একটি কামিয়াবিও অক্লেশে মুসলমানদের করতলগত হলো। সন্ধির সংবাদ যখন সমগ্র আরব ভূখন্ডে ছড়িয়ে পড়লো, দূরে অদূরে অবস্থিত সকল গোত্রই এই ধারণা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, রাসুল (সাঃ)এর নেতৃত্বে আগত হাজার হাজার (আসলে দেড় সহস্র মাত্র) 'সশস্ত্র' মুসলিম সৈন্যকে মক্কার উপকণ্ঠে উপস্থিত দেখে ভীত সন্ত্রস্ত কুরাইশরা মক্কা নগরীকে বাঁচাবার জন্য আত্মসমর্পণ ও সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছে। এবং রাসুল (সাঃ) নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে তাঁর তেপ্পান্ন বছরের স্মৃতি বিজড়িত মক্কা আক্রমণ না-করে এবারের মতো মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই বিবেচনায়, পুরো আরব ভূখন্ড এখন নিশ্চিত যে, প্রবল পরাক্রমশালী কুরাইশদেরই যখন এই অবস্থা, ইসলামের বিজয় ব্যাহত করবার কোন শক্তি অন্তত আরবদেশে আর অবশিষ্ট নেই। সেই ঔদ্ধত্য না-দেখানোই দুশমনের জন্য মঙ্গলজনক। পূর্বাপর ঘটনা ঠিক এ-রকম নয়, কিন্তু এইরকমই ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। সত্যই বড় অভাবনীয়; কিন্তু আল্লাহপাকের তরফ থেকে মুমিনদের জন্য বিজয় ও কামিয়াবি যখন অবতরণ করে, এইভাবেই করে। আল্লাহপাকের ভাষায় একেই

www.pathagar.com

বলে 'ফাতহান কারীব' 'ফাতহাম্ মুবীন'।

হুদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদনের পর রাসূল (সাঃ) একটি দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিলেন। রাসুল পাক (সাঃ)কে আল্লাহপাক প্রেরণ করেছেন মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেবার জন্য, সমগ্র মানববংশের জন্যই এই দাওয়াত; কিন্তু এতদিন পর্যন্ত মক্কা ও মদীনার মধ্যেই তাঁর প্রচার-কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। এতদিন তিনি কেবল নিকটস্থ ও নিকটবর্তী মানুষের কাছেই ইসলামের কথা পেশ করেছেন; প্রতিকূল অবস্থার কারণে বাইরের দুনিয়ায় ইসলামের পয়গাম প্রেরণের কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু আল্লাহপাকের ইচ্ছা, হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির পর অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করায় এবং আভ্যন্তরীণ বৈরী পরিস্থিতি অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসায়, রাসুল (সাঃ) এবার আরবের বহির্ভাগে অনেক দেশে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর দিকে মনোনিবেশ করলেন।

আসলে আল্লাহপাক-তো রাসুল (সাঃ)কে রাজা করে পৃথিবীতে পাঠান নি; পাঠিয়েছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। পবিত্র আল কোরআনের ভাষায় তিনি 'নাজীরুম মুবীন'। এবং তিনি যেহেতু বিশ্বনবী, তিনি যেহেতু রাহমাতুল্লিল আলামীন, তার দায়িত্ব শুধু আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁকে তাঁর পয়গাম পৌঁছে দিতে হবে সর্বত্র সকল মানুষের কাছে। কে গ্রহণ করলো না-করলো, তা নিয়ে তাঁর কোন পেরেশানি নেই; যে-কারণে আল্লাহপাক তাঁকে নিরুদ্বিগ্ন থাকবার জন্য আশ্বস্ত করে বলেন, 'ইন্না আরসালনাকা বিল হাক্কি বাশিরাঁউ ওয়া নাজীরা ওয়ালাতুছআলু আন আছহাবীল জাহীম' নিশ্চয়ই আমি আপানাকে সত্যদ্বীনসহ সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি, এবং জাহান্নামীদের সম্পর্কে আপনাকে কোনরূপ প্রশ্ন করা হবে না (সূরা বাকারা)। কিন্তু ইসলামের পয়গামটি তাঁকে পৌঁছাতে হবে। অতএব আর কালক্ষেপ না-করে হিজরি ষষ্ঠ বর্ষের শেষ দিক থেকে তিনি একে একে অনেকগুলি দেশের রাজা বাদশাহর কাছে দূত প্রেরণ শুরু করলেন। সবাইকে সীলমোহরকৃত চিঠিতে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে ইসলামের এই দাওয়াত। জানিয়ে দিলেন, ইসলাম গ্রহণ করুন শান্তিতে থাকবেন, আর যদি এই দাওয়াত গ্রহণ না-করেন, আপনার কওমের সকল পাপ আপনার উপর বর্তাবে। মোটামুটি প্রায় এই একই রকম ভাষায় ও বক্তব্যে রাসুল (সাঃ) আরবের চতুর্দিকে শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী সকল রাজা সম্রাটের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। সকলের নসীব সমান নয়। কেউ কেউ সাদরে গ্রহণ করলেন এই দাওয়াত এবং ইসলামে প্রবেশ করলেন; কেউ কেউ এই দাওয়াতের গুরুত্ব অনুধাবন করা সত্ত্বেও নানা দ্বিধা সংশয়ে দুর্ভাগা হয়ে ইসলামের বাইরেই থেকে গেল, আবার কেউ কেউ প্রচণ্ড মূঢ়তা ও অহমিকাবশত সরাসরি প্রত্যাখ্যানই করে বসলো।

www.pathagar.com

হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না-করে ইসলাম কবুল করলেন, কিন্তু মিশরের বাদশাহ মুকাওকিস গভীর অনুরাগে রাসুল (সাঃ)কে স্বীকার করলেন, সবিনয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে অনেক উপঢৌকন পাঠালেন, কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, মুকাওকিস ইসলাম গ্রহণ করতে পারলো না। রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসেরও একই অবস্থা। ইসলাম-যে সত্য, রাসুল (সাঃ) ইসলাম-যে অনিরুদ্ধ গতিতে চতুর্দিক অচিরেই অধিকার করে নেবে, এই কথা পুরোপুরি উপলব্ধি করেও, প্রজা সাধারণ ও রাজ অমাত্যদের বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলে উঠতে পারে, এই ভয়ে হিরাক্লিয়াস ইসলাম কবুল করতে করতেও নাটকীয়ভাবে পিছিয়ে গেল। আম্মানের বাদশাহ জেফার ও তাঁর সহোদর আব্দ অনেক ভেবে চিন্তে ইসলাম গ্রহণ করাটাই শ্রেয় বিবেচনা করেছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁদের প্রতি আল্লাহপাকের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল, তাঁদের খোশনসীব। অথচ ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওজা ইবনে আলী দৃশ্যত একরকম আনুগত্য দেখালেও তার অন্তরে কোনরূপ পরিবর্তন আসেনি। রাসুল (সাঃ) তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেছেন। দামেশকের শাসনকর্তা হারেস ইবনে গাসসানী রাসুল (সাঃ) এর পত্র পাওয়া মাত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলো 'আমার বাদশাহী ছিনিয়ে নিতে পারে, পৃথিবীতে এমন কে আছে? শীঘ্রই আমি তার বিরুদ্ধে হামলা করবো'। সবচেয়ে গর্হিত ও গুরুতর আচরণ করেছিল পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ। সে রাসুল (রাঃ)এর পত্র অন্ধ আক্রোশে ছিঁড়ে ফেলে, এবং তার অধীনস্থ ইয়েমেনের বাদশাহ বাযান-কে এই নির্দেশ প্রদান করে যে, বাযান যেন কালবিলম্ব না-করে হিজাজ থেকে রাসুল (সাঃ)কে গ্রেপ্তার করে সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দেয়। সম্রাটের হুকুম অমান্য করতে না-পেরে বাযান দুই ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করলো। তারা রাসুল (সাঃ) এর কাছে এসে খসরুর হুকুমনামা পড়ে শুনালো।

রাসুল (সাঃ) প্রশান্তচিত্তে তাদের সব কথা শুনে বললেন, 'তোমরা আগামীকাল এসো'। লোক দু'টি পরদিন এসে রাসুল (সাঃ)এর কাছেই শুনলো যে, খসরু তার আপন পুত্র শিরওয়ার হাতে নিহত হয়েছে, এখন নতুন সম্রাট শিরওয়া। তারা হতবাক হয়ে ইয়েমেনে বাযানের কাছে ফিরে গেল। লোক দুটির মুখে পুরো ঘটনা শুনে বাযানও হতবাক। সে এই সংবাদ না বিশ্বাস করতে পারছে, না উড়িয়ে দিতে পারছে। এমন সময় পারস্য থেকে নতুন সম্রাট শিরওয়ার চিঠি এসে পৌঁছলো। চিঠিতে অন্য অনেক কথার সঙ্গে এই নির্দেশও ছিল যে, বাযান যেন কোন অবস্থাতেই মদীনার নবীকে কিছুমাত্র বিরক্ত না-করে। এই ঘটনায় বাযান এবং তাঁর পারস্য থেকে আগত অনেক বন্ধু বান্ধব, যাঁরা তখন কার্যোপলক্ষে ইয়েমেনে অবস্থান করছিলেন, সবাই একযোগে ইসলাম গ্রহণ করলেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে খসরুর ঔদ্ধত্য ও তার মর্মান্তিক পরিণতিসহ পুরো ঘটনাটি ঘটে সপ্তম হিজরির প্রাক-মধ্য সময়ে জমাদি আউয়াল মাসে। যাই হোক, নানা জনের নানারূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহর দ্বীন দূরে বহুদূরে বেশ দ্রুত গতিতেই ছড়িয়ে পড়লো; সমকালীন পৃথিবীতে এমন কেউ আর বিশেষ অবশিষ্ট

www.pathagar.com

রইলো না, ইসলামের সর্বমানবিক কল্যাণের বাণী যার কাছে না-পৌঁছলো।

হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদনের ফলে ইসলামের এক নম্বর ও দুর্ধর্ষ দুশমন যে-কুরাইশ, তাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলেও, ইহুদিদের তৎপরতা খুব একটা প্রশমিত হয়নি। মদীনা থেকি বহিষ্কৃত ইহুদিরা খয়বরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং তারা সেখানে বেশ শক্তিশালীও হয়ে ওঠে। অবশ্য ইহুদিদের মূল শক্তি হলো চক্রান্ত। এবং বার বার এটা প্রমাণিত যে, একেবারে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এই চক্রান্ত-রচনা থেকে তারা নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। আল্লাহর লানত্হেতু এটা তাদের একটি স্থায়ী স্বভাবদোষ। খয়বর ছিল ইহুদিদের তৎকালীন সময়ের সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি ও চক্রান্তকেন্দ্র। এই খয়বরের ইহুদিদের বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) সপ্তম হিজরির শুরুতেই এক তাওহিদী সৈন্যদল নিয়ে রওয়ানা হলেন। এই অভিযানে আল্লাহর নির্দেশক্রমে শুধু বাইয়াতে রিদওয়ান-এ অংশগ্রহণকারী মুসলমানেরাই শরীক হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এদের বাইরে রাসুল (সাঃ) কাউকে খয়বর অভিযানে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন নি। খয়বর ছিল মদীনা থেকে ৬০-৭০ মাইল দূরবর্তী। রাসুল (সাঃ) এমন এক পথে খয়বর গিয়ে পৌঁছলেন এবং এমন এক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করলেন, যাতে ইহুদিদের মিত্র ও সাহায্যকারী বনু গাতফান গোত্র কোনভাবেই কোন সাহায্য প্রেরণ করতে না-পারে। রাসুল (সাঃ) এর কাছে খবর ছিল যে, আবদুল্লাহ বিন উবাই ও অন্য অনেক মুনাফিকের মাধ্যমে খয়বর অভিযানের সংবাদ ইহুদিদের কাছে পৌঁছে গেছে এবং ইহুদিরা যথোচিত প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এতদসঙ্গে বন্ধুগোত্র বনু গাতফানকেও যথাসময়ে সাহায্য প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছে। খয়বর একটি মোটামুটি সমৃদ্ধ জনপদ। ইহুদিরা এখানে সুরক্ষিত অনেক দুর্গ, অনেক অর্থবিত্ত খেত খামার নিয়ে বেশ ভালোভাবেই আছে। রাসুল (সাঃ) যখন খয়বরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে আক্রমণ পরিচালনা করলেন, ইহুদিরা মোটামুটি সাহসিকতার সঙ্গেই মোকাবিলা করলো। খয়বর অভিযানে সেনাপতি ছিলেন হজরত আলী (রাঃ)। তাঁর কুশলি ও নির্ভীক সৈনাপত্যের মোকাবিলায় অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ইহুদিদের সাহস ও প্রতিরোধের স্পৃহা ভেঙ্গে পড়লো। তারা তাদের সুরক্ষিত দুর্গসমূহে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো। কিন্তু মুসলমানদের তীব্র আক্রমণের মুখে ইহুদিদের এই আত্মগোপন-কালও ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। বনু গাতফান চেষ্টা করেছিল কিন্তু বাস্তবে কোন সাহায্য পাঠাতে পারে নি। সব দিক থেকে নিরাশ ও হতোদ্যম হয়ে ইহুদিরা বেশি কালক্ষেপ না-করে আত্মসমর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলো। অস্ত্রশস্ত্র ধনসম্পদ জমিজায়গা খেত খামার খেজুরবাগান সবকিছু রাসুল (সাঃ)এর হাতে তুলে দিয়ে শুধু প্রাণভিক্ষা নিয়ে আত্মসমর্পণ করলো ইহুদিরা।

এই একই সঙ্গে একই অভিযানে রাসুল (সাঃ) ফেদেক, ওয়াদিউল কোরা এবং

www.pathagar.com

বনু তায়মা-র বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালনা করেন; এ-সব স্থানেও যথেষ্ট পরিমাণে কুচক্রী-ইহুদিরা বসবাস করতো। ফেদেকে অবশ্য সৈন্যপ্রেরণের পূর্বেই সেখানকার অধিবাসীরা খয়বরের ইহুদিদের মত তাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক প্রেরণ করার শর্তে সমঝোতার প্রস্তাব পেশ করে। এবং তা রাসুল (সাঃ) কর্তৃক গৃহীত হয়। ওয়াদিউল কোরার অধিবাসীরা দু'একদিন যুদ্ধ করার পর অবস্থাদৃষ্টে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পথই বেছে নিলো। এবং বনু তায়মা-র ইহুদিরাও বিশেষ হঠকারিতা না-দেখিয়ে প্রতিনিধি মারফত জিযিয়া প্রদানের স্বীকৃতি জানিয়ে সম্পূর্ণ আপোষেই আত্মসমর্পণ করে। অতএব মাসাধিককাল স্থায়ী এই অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো খয়বরসহ তৎসন্নিহিত এক বিরাট এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকারে চলে আসলো। ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে এই অভিযানে বিশ-বাইশ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন, এবং ইহুদিরা নিহত হয় ৯৩ জন। খয়বর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আল্লাহপাক তাঁর বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ শুধু বিজয়ই দান করেন নি, সকল মুসলমানের জন্য তিনি আশাতীত সচ্ছলতাও দান করলেন। এই অভিযানের ফলে মুসলমানেরা এতটাই সচ্ছল হয়ে উঠলো যে, সকল মুহাজির-মুসলমান তাদের আনসার ভাইদের বদান্যতায় প্রাপ্ত সকল খেজুর গাছ ফিরিয়ে দিলেন। এবং উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)সহ সবাই পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, 'এখন থেকে আমরা পেট ভরে তৃপ্তি সহকারে খেজুর খেতে পারবো'। এই অভিযানে এক কুচক্রী ইহুদি-সর্দারের পত্নী সফিয়াসহ কিছু যুদ্ধবন্দীও মুসলমানদের অধিকারে আসে। সাফিয়াকে উম্মুল মুমিনীনের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বিবাহ করেন। আমাদের জননী মা সাফিয়া একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, আকাশের চাঁদ তাঁর কোলে নেমে এসেছে। তাঁর প্রাক্তন স্বামীকে এই স্বপ্নের কথা বলায় সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রচণ্ড জোরে তাঁকে চপেটাঘাত করে এবং বলে, 'তুমি আরবের বাদশাহকে নিজের ক্রোড়ে পেতে চাও'। আল্লাহপাকের কী অভিপ্রায়, জননী সাফিয়ার স্বপ্ন হুবহু বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করলো। যাই হোক, খয়বরের সফল বিজয়াভিযান শেষে রাসুল (সাঃ) যখন সবাইকে নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন সপ্তম হিজরির সফর মাস একেবারে শেষের দিকে।

মদীনায় ফিরে রাসুল (সাঃ) অনেকটা নিশ্চিন্তমনে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা ও ইসলামের প্রচারকার্যে মনোনিবেশ করলেন। নিশ্চিন্ত এইজন্য যে, দুই প্রবল শত্রু কুরাইশ ও ইহুদিদের দিক থেকে এখন আর আপাতত কোন আশঙ্কা নেই। অবশ্য আর একটি শত্রু এখনো প্রায় বহাল-তবিয়তে বিদ্যমান, সেটা হলো নানাস্থানে অস্থায়ীভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বেদুঈন, যারা যখন তখন যেখানে-সেখানে সুযোগ বুঝে হামলা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। এদের একমাত্র কাজ ও জীবিকা হলো লুটতরাজ। রাসুল (সাঃ) দেখলেন, এই উপদ্রব দমন না-করা পর্যন্ত স্থায়ী শান্তির আশা নেই। অতএব তিনি এইবার এইদিকে মনোযোগ দিলেন। সবচেয়ে বেশি সমস্যা ছিল নজদ-এলাকার

www.pathagar.com

বেদুঈনদের নিয়ে। রাসুল (সাঃ) নজদ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সৈন্যদল পাঠালেন। নজদ ছাড়া অন্য যে-সকল এলাকায় উপদ্রব-সৃষ্টিকারী বেদুঈন ও ছোট ছোট বৈরী গোত্র ছিল, তাদের বিরুদ্ধেও অনেকগুলি ছোট ও মাঝারি ধরনের অভিযান পারিচালিত হলো। এই সকল অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল, হামলাকারী বেদুইনদের ভীত সন্ত্রস্ত রাখা, যাতে মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনরূপ হঠকারিতা দেখাতে সাহস না-পায়। রাসুল (সাঃ)এর এই পদক্ষেপ প্রায় পুরোপুরিই সাফল্য লাভ করেছিল; এবং এই ধরনের অভিযান সপ্তম হিজরির জ্বিলকদ পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হয়।

জ্বিলকদ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাসুল (সাঃ) সবাইকে কাযা ওমরাহ পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। গতবার ওমরাহ না-করে হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার কারণে অনেকের মধ্যেই একটা দুঃখ ছিল, এবারে সেই দুঃখ দূরীভূত হবে। গতবার ওমরাহ-যাত্রী ছিলেন ১৪০০ কিন্তু এইবার ২০০০, নারী শিশুদের ধরলে এই সংখ্যা আরো বেশি। সন্ধিচুক্তি মোতাবেক একটি কোষবদ্ধ তলোয়ার ও কোরবানীর পশু নিয়ে মুসলমানেরা রাসূল (সাঃ)এর নেতৃত্বে মক্কার কাবাগৃহে উপস্থিত হলেন। ওমরাহর যা-কিছু আনুষ্ঠানিকতা যথাসময়ে যথারীতি পালিত হলো। এই দৃশ্য অবলোকন করে কাফের-কুরাইশরা খুবই অস্থির। তারা বার বার এসে মক্কা পরিত্যাগ করার তাগিদ দিতে শুরু করলো। সন্ধিপত্রে সময়ের একটা উল্লেখ ছিল। কোন অবস্থাতেই তিন দিনের বেশি মক্কায় মুসলমানেরা অবস্থান করতে পারবে না, এটা হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে একটি অন্যতম লিখিত শর্ত। এই শর্তরক্ষায় রাসূল (সাঃ) সঙ্গীসাথীসহ তিন দিন অতিবাহিত করেই মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। মদীনায় ফিরে এলেন জ্বিলহজ্ব মাসের শেষ দিকে। নানা ঘটনা উপঘটনার মধ্য দিয়ে সপ্তম হিজরি মোটামুটি নির্বিঘ্নেই অতিবাহিত হলো।

শুরু হলো নতুন বছর, অষ্টম হিজরি। এই বৎসরটি পূর্বাপেক্ষা আরো একটু অধিক ঘটনাবহুল। বিশেষ করে দুটি ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য, যা ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে অবিস্মরণীয়। একটি মূতার যুদ্ধ অপরটি মক্কাবিজয়। রাসুল (সাঃ) একজন সাহাবীকে চিঠিসহ বসরার গভর্ণরের কাছে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। রোমকসম্রাট কায়সারের অধীনস্থ এই গর্ভনর শরাহবিল ইবনে আমর গাসসানি প্রেরিত দূতকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এইরকম একটি জঘন্য গুরুতর অপরাধ বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে পারে না, যথোচিত জবাব দেয়া জরুরি। এবং এইজন্যই মূতার অভিযান। রাসুল (সাঃ) তিন হাজার সৈন্য পাঠালেন। মূতা জর্ডনের নিকটবর্তী একটি এলাকা, এখান থেকে বায়তুল মাকদাসের দূরত্ব খুব বেশি নয়। অষ্টম হিজরির জমাদি আউয়াল মাসে সংঘটিত হয় এই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষ রোমকদের এক লক্ষ, এবং তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরবের নানা ইসলামবৈরী গোত্র থেকে আগত আরো এক লক্ষ; সব মিলিয়ে শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা ছিল দুই লক্ষাধিক। অথচ মোকাবিলায় মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র

www.pathagar.com

তিন হাজার। ভাবাই যায় না, কী ভয়াবহ অসম ধরনের এই যুদ্ধ। কিন্তু মুসলমানেরা পিছিয়ে আসে নি; কারণ শুধু বিজয়লাভ নয়, আল্লাহর পথে আল্লাহর দ্বীনের জন্য শাহাদাতও মুসলমানের হৃদয়নিংড়ানো তামান্না।

এই যুদ্ধে রাসুল (সাঃ)এর পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন যথাক্রমে জায়িদ বিন হারিসা, জাফর বিন আবু তালিব এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা। আল্লাহপাকের ফয়সালা, বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে তিনজনই একে একে শাহাদাত বরণ করেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলাম কোন্ কুসুমাস্তীর্ণ পথে আসে নি। কত ত্যাগ কত কোরবানি, কত-যে রক্ত সম্পদের নজরানা পেশ করতে হয়েছে, তার হিসাব নেই। অথচ বড় বদনসীব, আজ এক শ্রেণীর মুন্ডিতমস্তক অতি-মুত্তাকীরা প্রচার ও প্রমাণ করতে চায়, ইসলামে কোন জিহাদ নেই, শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মোকাবিলার কোন জরুরত নেই। ইসলামে যা-আছে তা শুধু নিরাপদ জিকির ফিকির, নিরাপদে সওয়াব কামাই ও নানাসব হাস্যকর মুখরোচক ফজিলতের বয়ান। তাদের কথা ও কার্যক্রম থেকে মনে হয়, হাজার হাজার সাহাবী কী 'বোকাই-না' ছিল যাঁরা 'বদ্ধ উন্মাদের' মত জিহাদের ময়দানে ময়দানে রক্তের নজরানা পেশ করেছেন! আল্লাহপাক বলেন, 'আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাতি ওয়া লাম্মা ইয়ালামিল্লাহুল্লাজীনা জাহাদু মিনকুম ওয়া ইয়ালামছ্ ছাবিরীন' তোমরা কি এই খেয়ালে আছো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো পরীক্ষা গ্রহণই করেন-নি, কে তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী এবং জিহাদে কে কতখানি অবিচল (সূরা আল ইমরান)। আসলে যে-যাই বলুক, লোকমুখে যত কোটি কোটি সওয়াব অর্জনের কথাই শোনা যাক, আল্লাহ্র দ্বীন এবং আখেরাতে জান্নাতের যে ফয়সালা, তা মুমেনের কাছে জীবন ও সম্পদের কোরবানী দাবী করে। এ-থেকে চাতুর্যের সঙ্গে যারা পালিয়ে থাকে অথবা বুদ্ধিবিভ্রমহেতু সংগ্রাম-নিরপেক্ষ সর্বপ্রণয়ী বাউল-বৈষ্ণবে পরিণত হয়, তারা মুমেনও নয়, আল্লাহপাকের কাছে তাদের কোন বন্দেগী গ্রাহ্য হবারও কথা নয়। যাই হোক, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার শাহাদাতের পর যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। তাঁর যুদ্ধকৌশলে ভীত ও বিভ্রান্ত হয়ে রোমকসৈন্য পশ্চাদপসরণ করলো, মুসলিম বাহিনীও প্রত্যাবর্তন করলো মদীনায়। মূতার যুদ্ধে সর্বমোট ১২ জন মুসলমান শহীদ হন। রোমকদের হতাহতের কোন প্রামাণ্য বর্ণনা ইতিহাসে নেই; তবে এটুক জানা যায় যে, একমাত্র খালিদ বিন ওয়ালিদের হাতেই ৯টি তরবারি ভেঙ্গেছিল। এই তথ্য থেকে, এটা খুব সহজেই ধারণা করা যায়, রোমক বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা যথেষ্টই ছিল। মূতার এই যুদ্ধের একটি বড় বকমের প্রভাব পড়েছিল আরব জাহানে। সমগ্র আরব সবিস্ময়ে অনুধাবন করলো, তৎকালীন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তি রোমকবাহিনী যখন তিন হাজার মাত্র মুসলিম সৈন্যের মোকাবিলায় পশ্চাদপসরণ করেছে, তখন মোহাম্মদ অপরাজেয় এবং তিনি অবশ্যই আল্লাহপাকের রাসুল। এবং এইহেতুই আরবের অনেক গোত্র তাদের জিদ ও দম্ভ পরিত্যাগ করে মূতার

www.pathagar.com

যুদ্ধের পরপরই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

অষ্টম হিজরির রমজানের পূর্ব পর্যন্ত আরো কতিপয় ছোট খাটো সারিয়া-অভিযানে রাসুল (সাঃ) সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু সেগুলি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো মক্কা অভিযান। হুদাইবিয়ার সন্ধিতে একটি শর্ত ছিল, মুসলমান অথবা কুরাইশ যে-কোন দিকে যে-কোন গোত্র নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে এবং তারা সন্ধিচুক্তির আওতাধীন বলে গণ্য হবে। এই শর্ত অনুযায়ী মুসলমানদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ বনু খোজাআ গোত্র কুরাইশদের দিক থেকে পূর্ণ নিরাপত্তার দাবীদার। কিন্তু কুরাইশরা এই শর্তটি উপেক্ষা করে তাদের বন্ধুগোত্র বনু বকরকে নিয়ে বনু খোজাআর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। এই খবর রাসুল (সাঃ)এর কাছে পৌঁছলো। অবশ্য কুরাইশরা অচিরেই তাদের ভুল বুঝতে পেরে চুক্তি পুনর্বহাল বা নবায়নের জন্য আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করলো। আবু সফিয়ানের ধারণা ছিল, তার কন্যা যেহেতু নবীপত্নী উম্মুল মুমেনীন, চুক্তি নবায়িত হবে। কিন্তু কন্যা উম্মে হাবীবার ঘরে গিয়েই সে বুঝতে পারলো, কন্যার কাছে কাফের-পিতার কোন সম্মান নেই। আবু সফিয়ান রাসুল (সাঃ)এর কাছে গিয়ে তার আবেদন পেশ করলো কিন্তু কোন জবাব পেলো না। হজরত আবু বকর হজরত উমার এবং হজরত আলীর কাছেও সুপারিশের জন্য গেল, কিন্তু কারো কাছেই ন্যূনতম কোন আশা ও সাহায্যের আশ্বাস পেলো না আবু সুফিয়ান। অতএব সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে ভগ্নহৃদয়ে মক্কায় ফিরে আসলো এই কুরাইশ সর্দার আবু সুফিয়ান। এদিকে রাসুল (সাঃ) মক্কা অভিযানের জন্য স্থির সংকল্প গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি বিষয়টি এমনভাবে গোপন রাখতে চান, যাতে কোনভাবেই কুরাইশরা এই অভিযানের সংবাদ না-জানতে পারে। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বললেন না, কিন্তু সবাইকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। এই সময় হজরত হাতেব ইবনে বালতাআ (রাঃ) একটি মারাত্মক ভুল করে বসলেন। তিনি তাঁর মক্কায় অবস্থানরত পরিবার পরিজনের দুশ্চিন্তায় কুরাইশদের সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিযানের সম্ভাবনার খবর জানিয়ে গোপনে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠি অবশ্য গন্তব্যে পৌঁছতে পারে নি। রাসুল (সাঃ) অহি মারফত বিষয়টি অবগত হয়ে দ্রুত কয়েকজন সাহাবীকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা পত্রবাহিকার নিকট থেকে চিঠি উদ্ধার করে আনলেন। এই ঘটনায় হাতেব (রাঃ)কে মুরতাদ ও মুনাফিক আখ্যা দিয়ে হজরত উমার ফারুক (রাঃ) তাঁকে শিরশ্ছেদের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বললেন, 'হাতেব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এমনও হতে পারে, আল্লাহপাক বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, তোমরা যা ইচ্ছা করো, তোমাদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত কিছু আমি মাফ করে দিয়েছি'। এই কথায় হজরত উমারের (রাঃ) দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। সত্যই জিহাদের কী-নক্ষত্রচুম্বী ফযীলত। অথচ আফসোস, মুসলমানের মধ্যে আজ এই জিহাদে অংশগ্রহণ করার কোন তামান্নাই আর

www.pathagar.com

অবশিষ্ট নেই। কী-সব নিরর্থক বাহানায় বাহানায় সওয়াব কামাইয়ের লক্ষ্যে দেশে দেশে এখানে সেখানে টোল-টোপলা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোই এখন ইসলাম। এই ধরনের মুসলমানরূপী মেষ দ্বারা সারা পৃথিবী সয়লাব হয়ে গেলেও কাফের-মুশরিকদের কিছু যায় আসে না।

যাই হোক, দশ সহস্র রণসজ্জিত সাহাবা নিয়ে রাসুল (সাঃ) অষ্টম হিজরির ১০ই রমজান মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে আল্লাহর নবীর চাচা হজরত আব্বাস (রাঃ)এর সঙ্গে দেখা। তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসছিলেন; তিনিও এই অভিযানে শামিল হলেন। আল্লাহর রাসুল সবাইকে নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন মক্কার অদূরবর্তী মাহরুজ জাহরান নামক একটি স্থানে। কুরাইশরা যদিও এই আগমন সংবাদ জানতে পারেনি কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই অত্যন্ত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিল। এই দুশ্চিন্তার চাপে তাদের নেতা আবু সুফিয়ান এবং অন্য কেউ কেউ মাঝে মাঝেই মক্কা থেকে বেরিয়ে মদীনার খবরাখবর নেবার চেষ্টা করতো। একদিন আবু সুফিয়ান মক্কার বাইরে এসে জানতে পারলো, দশ সহস্র সশস্ত্র মুজাহিদসহ রাসুল (সাঃ) একেবারে মক্কার দোরগোড়ায় সমুপস্থিত। এমতাবস্থায় করার কিছু নেই। যুদ্ধ হয়ত করা যায় কিন্তু আবু সুফিয়ান ভেবে চিন্তে দেখলো, সেটা হবে স্বেচ্ছায় তলোয়ারের নীচে গলা বাড়িয়ে দেয়া। অতএব রাসুল (সাঃ)এর চাচা হজরত আব্বাসের (রাঃ) সহায়তায় রাসুল (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হলো। এবং ভয়েই হোক বা অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার কারণেই হোক, আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করলো। চাচা আব্বাস (রাঃ)এর বিশেষ সুপারিশে রাসুল (সাঃ) কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকে নিরাপত্তা ও স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে জানিয়ে দিলেন, 'যারা তোমার ঘরে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ, যারা নিজ নিজ গৃহে আবদ্ধ থাকবে অথবা বায়তুল্লাহ শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করবে, তারা নিরাপদ'। রাসুল (সাঃ) প্রদত্ত নিরাপত্তার এই সংবাদ নিয়ে আবু সুফিয়ান অতি দ্রুত মক্কায় পৌঁছলো। সে রাসুল(সাঃ) এর সব কথা সবাইকে হুবহু জানিয়ে দিল। এবং এইকথাও জানালো যে, কেউ যেন ভুলক্রমেও প্রতিরোধ-সৃষ্টি বা যুদ্ধের কথা চিন্তা না-করে। আবু সুফিয়ানের এই ঘোষণায় নগণ্য সংখ্যক উচ্ছৃংখল যুবক ব্যতীত সবাই যত দ্রুত সম্ভব নিরাপত্তার আওতায় প্রবেশ করে, কেউ কেউ অতীত দুষ্কর্মের কথা ভেবে প্রাণভয়ে পলায়নও করে।

১৭ই রমজান তারিখে মাহরুজ জাহরান থেকে রাসুল (সাঃ) সসৈন্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। দশ সহস্র মুজাহিদের এই বিশাল বাহিনী অনেকগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ দলে বিন্যস্ত করা হলো। সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হলো খালিদ বিন ওয়ালিদ, হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম, হজরত আবু ওবায়দা প্রমুখ সাহাবীদের উপর। আনসারদের নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত দলের পতাকা বহন করছিলেন হজরত সাদ ইবনে উবাদা (রাঃ)। উল্লাসে উত্তেজনায় এই হজরত সাদই অগ্রসর হতে হতে বার বার বলছিলেন,

www.pathagar.com

'কুরাইশদের জন্য আজ চূড়ান্ত অবমাননার দিন, আজকের এই দিন রক্তপাতের দিন'। এই সংবাদ রাসুল (সাঃ) এর কর্ণগোচর হলে তিনি হজরত সাদের (রাঃ) নিকট থেকে পতাকা নিয়ে সাদের পুত্র কয়েসের হাতে তুলে দিলেন। সম্পূর্ণ বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী প্রবেশ করলো মক্কায়। শুধু খালিদ বিন ওয়ালিদের সম্মুখে কিছু-সংখ্যক উচ্ছৃংখল অপরিণামদর্শী যুবক প্রতিরোধ-সৃষ্টির চেষ্টা করে। এই নির্বোধ যুবকেরা তাদের হঠকারিতার উপযুক্ত প্রতিফল খালিদের হাত থেকে পেয়েছিল। এই সংঘর্ষে ১২ জন পৌত্তলিক নিহত হয়। যাই হোক, রাসুল (সাঃ) সবাইকে নিয়ে সমবেত হলেন পবিত্র কাবাগৃহের চত্বরে। ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে এই দিন মক্কা প্রবেশের প্রাক্কালে রাসুল (সাঃ)এর মস্তক ছিল আল্লাহপাকের প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অবনত ; এমন অবনত যে, তাঁকে বহনকারী উটের পিঠের সঙ্গে তিনি প্রায় মিশে গিয়েছিলেন।

কাবাগৃহের চাবিরক্ষক ছিল ওসমান ইবনে তালহা। ওসমানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দু'একজন সাহাবাসহ রাসুল (সাঃ) কাবাগৃহে প্রবেশকরত সেখানে রক্ষিত সকল মূর্তি তিনি তাঁর ছড়ির আঘাতে একটি একটি করে ভূলুণ্ঠিত করলেন। এই সময় রাসুল (সাঃ) মুখে উচ্চারণ করছিলেন, 'জাআল হাক্কু ওয়া জাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা' সত্যের আগমন ঘটেছে, মিথ্যা বিদায় নেবে, আর মিথ্যা-তো বিদায় নেবার জন্যই (সূরা বনি ইসরাইল)। এরপর কাবাগৃহের অভ্যন্তরে নামাজ আদায় করার পর দরজায় দাঁড়িয়ে সমবেত কুরাইশদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করলেন। প্রথমে আল্লাহপাকের প্রশংসাজ্ঞাপন ও তাঁর মহান দরবারে যথোচিত শুকরিয়া পেশকরত তিনি বললেন, "আজ আর কোন অভিযোগ নয়, প্রতিশোধ নয়। আজ আমি তোমাদেরকে সেই কথাই বলছি, যা একদিন হজরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন, 'লা তাছরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা' আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই (সূরা ইউসুফ); সবাই তোমরা মুক্ত"। এমনকি যে-দশজনের বিরুদ্ধে অতিশয় গুরুতর ও সুনির্দিষ্ট অপরাধের ভিত্তিতে রাসুল (সাঃ) প্রাণদন্ডাদেশ ঘোষণা করেছিলেন তারাও, মাত্র চার কি পাঁচ জন নিরেট দুর্বৃত্ত ছাড়া, সবাই একে একে ক্ষমা লাভ করেছিল। এদের মধ্যে বিশিষ্ট কবি কাব বিন জুহাইর এবং আবু জেহেলের পুত্র ইকরিমাও ছিল, যাঁরা পরে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে বিশিষ্ট সাহাবায়ে রূপান্তরিত হন। গবেষক-ঐতিহাসিককেরা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে দেখেছে, আবহমান পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সর্বপ্লাবী বিজয় এবং একই সঙ্গে এমন অভাবনীয় ক্ষমা ও ঔদার্যের মহিমান্বিত নমুনা কোথাও নেই।

রাসুল (সাঃ) ওসমান বিন তালহাকে আবার ডাকলেন। কাবাগৃহের চাবি তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'এই চাবি চিরকাল ওসমানের বংশধরদের মধ্যেই থাকবে; কেউ যদি ছিনিয়ে নেয়, সে জালিম'। স্মরণযোগ্য, এই সেই ওসমান যে-ব্যক্তি

www.pathagar.com

একদিন রাসুল (সাঃ)কে চাবি না দিয়ে উল্টো অনেক গালিগালাজ করেছিল। অথচ আজ তার কী মনোরম প্রতিদান, ক্ষমা ও প্রশস্ত হৃদয়ের কী অপূর্ব জবাব, কী অভাবনীয় প্রতিশোধ! মক্কাবিজয়ের পর মক্কায় অবস্থানকালে রাসুল (সাঃ) দুটি কাজ করলেন। প্রথম কাজটি হলো, সবাই তখন ইসলাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল; রাসুল (সাঃ) একে একে তাদের বাইয়াত গ্রহণ করলেন ও ইসলামের যে-মূল শিক্ষা তাওহিদ রেসালাত ও আখেরাত, সেইদিকে নবদীক্ষিত সবাইকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নিলেন। বলাই বাহুল্য, রাসুল (সাঃ)তো বাদশাহী করবার জন্য মক্কা জয় করেন নি। এই বিজয়ের প্রকৃত ও একমাত্র লক্ষ্য হলো, শিরকের স্থলে নিরঙ্কুশ তাওহিদের প্রতিষ্ঠা, তাগুতি রীতি নিয়মের উৎখাত ও ইসলামী বিধান-সংবিধানের সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় কাজটি হলো, শিরকের পরিপূর্ণ উচ্ছেদকল্পে নিকটে দূরে যেখানে যত মূর্তি আছে সব মূর্তির ধ্বংসসাধন। মানুষের কাছে ইসলামের অন্যতম মূল পয়গামই হলো, মূর্তিপুজা বা পৌত্তলিকতার চেয়ে বড় কোন মিথ্যা এবং জুলম আর নাই। ইসলামের কাজ হলো, এই জুলুম থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা। রাসুল (রাঃ) এইজন্যই বলেছেন, পৃথিবীতে তাঁর আগমনের অন্যতম মূল কারণই হলো মূর্তির উচ্ছেদ। অতএব মক্কাজয়ের পর তিনি আর কালবিলম্ব না-করে বিভিন্ন এলাকায় সাহাবীদেরকে প্রেরণ করলেন। 'উয্যা' ধ্বংসের জন্য হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ গেলেন নাখলায়; মক্কা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে রেহাত এলাকায় 'সোয়া' নামক মূর্তি নির্মূল করবার দায়িত্ব নিয়ে গেলেন হজরত আমর ইবনুল আস; হজরত সাদ বিন যায়েদ আসহালী গেলেন 'মানাত' উৎখাতের জন্য। এইভাবে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেখানে যত মূর্তি ছিল, ক্ষুদ্র বৃহৎ যাই হোক, সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। ইসলামী জীবনবিধানের এটা একটা অকাট্য অপরিহার্য শর্ত যে, কোন নামে কোনভাবে মূর্তিকে প্রশ্রয় দেয়া হারাম। অথচ মুসলমান আজ শিল্পের নামে, সংস্কৃতি ও ভস্মসদৃশ প্রত্যাখ্যাত-ঐতিহ্যের নামে মূর্তিকে প্রাধান্যদানে বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে। এ-এক আত্মঘাতী তৎপরতা; কারণ এইরকমই যদি হয়, তাহলে মুশরিকদের সাথে মুসলিম নরনারীর আদৌ আর কোন পার্থক্য থাকে না। অবশ্য যারা মূর্তি-সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে চায় তাদের বক্তব্য, মূর্তিকে তারা শিল্প ও সৌন্দর্যের একটি 'নিষ্পাপ' নান্দনিক অভিব্যক্তিরূপে বিবেচনা করে, আরাধ্য দেবতা কি দেবী হিসেবে নয়। এইকথা মেনে নিলেও এটা না-বলে কোন উপায় থাকে না যে, তারা হয়ত প্রকাশ্য মূর্তিপূজক নয়, কিন্তু অবশ্যই মূর্তিপ্রেমী। আর যেহেতু পূজা ও প্রেমের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশি নয়, এই ধরনের মূর্তিপ্রেম ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

রাসুল (সাঃ) মক্কাবিজয়ের এই সময়ে মক্কায় অবস্থান করেছেন সর্বমোট উনিশ দিন। এই উনিশ দিন অবস্থানকালের মধ্যেই জরুরি যা-কিছু করণীয়, রাসুল (সাঃ) তা জরুরিভাবেই সম্পন্ন করেন। কিন্তু এই সময় মদীনার আনসারদের মধ্যে একটি অনুমানজাত কষ্ট ও সংশয়ের সৃষ্টি হয় । তারা ভাবছিলো, রাসুল (সাঃ) এখন মাতৃভূমি

www.pathagar.com

মক্কাতেই থেকে যাবেন, তিনি আর মদীনায় ফিরে যাবেন না। রাসুল (সাঃ) এইকথা জানতে পেরে আনসারদের উদ্দেশ্য করে সস্নেহে বললেন, 'আল্লাহপাকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি; আমার জীবন ও মরণ তোমাদের সাথেই সম্পর্কযুক্ত'। অনেকের মনে পড়লো, ঠিক যেন সেই একই কথার পুনরুচ্চারণ, যা তিনি বাইয়াতে আকাবায় অনেকদিন আগে মদীনাবাসীদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা আমার এবং আমিও তোমাদের'।

মক্কাবিজয় হলো রাসুল (সাঃ)এর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সংগ্রামমুখর নাতিদীর্ঘ নবুয়তি জিন্দিগীর জন্য আল্লাহপাকের পরম আশীষস্নাত সাফল্যের চূড়ান্ত রূপ ও পরিণতি। আল্লাহপাক যে-ওয়াদা করেছিলেন, বাস্তব দৃশ্যপটে আজ সেই প্রতিশ্রুতিরই শাশ্বত অবিকল চিত্ররূপ। এই সচিত্র কামিয়াবির প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিল হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির মধ্যে; অদ্যকার মক্কাবিজয় তারই পূর্ণ পরিণত অবয়ব। 'ইনল্লাহা লাইউখলিফুল মিয়াদ' নিশ্চয়ই আল্লাহপাক কোন অঙ্গীকারই ভঙ্গ করেন না (সূরা আল ইমরান)। যাই হোক, মক্কাবিজয়ের মধ্য দিয়ে শির্‌ক তার কেন্দ্র থেকে মূলোৎপাটিত হলো, শিরকের মূলকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হলো নিরঙ্কুশ তাওহীদ, বিপুল আবেগে অনুরাগে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করতে লাগলো ইসলামের অবিনশ্বর পতাকাতলে। 'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন হে রাসুল আপনি দেখতে পাবেন, মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে' (সূরা নসর)। সুরা নসর তখনো অবতীর্ণ হয় নি, কিন্তু মক্কাবিজয় এই সর্বশেষ নাজিলকৃত সুরাটিরই যেন সুস্পষ্ট পূর্বাভাস। বিশেষভাবে লক্ষনীয়, মক্কাবিজয় থেকে মোটামুটি কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন সকল আরববাসীর মধ্যেই একটা ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দিল। তাদের একটি ধারণা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মিথ্যাশ্রিত কোন অশুভ শক্তির হাতে কাবাগৃহ বাইতুল্লাহর নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত হতে পারে না। মাত্র একষট্টি বছর পূর্বের ঘটনা, আবরাহার মর্মান্তিক পরিণতিই এর সাক্ষী। অতএব আরববাসীদের কাছে সংশয়হীনভাবে প্রমাণিত ও প্রতিভাত হলো, আল্লাহর রাসুল সত্য এবং তিনি সত্যই আল্লাহর রাসুল।

মক্কা ও তৎসন্নিহিত প্রায় সবদিকেই ইসলামের শিক্ষা ও প্রচার-কার্যক্রম রাসুল(সাঃ) বেশ নির্বিঘ্নেই চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং সবদিকে সবার মধ্যেই ইসলামকে বরণ করে নেবার একটা জোয়ারও সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু অনেকটা আকস্মিকভাবেই খবর পাওয়া গেল, হাওয়াজেন-সাকীফ-বনুহেলাল-বনু বকর গোত্র সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। শুধু পরিকল্পনা নয়, মক্কা থেকে মাত্র বিশ বাইশ মাইল দূরে তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মালেক ইবনে আওফের নেতৃত্বে সমবেত হয়েছে আওতাসের প্রান্তরে। আওতাসের পাশেই হুনাইনের প্রান্তর; আরাফাতের ময়দান থেকে আওতাস ও হুনাইন কোনটাই খুব বেশি দূরে নয়। যুদ্ধটা

www.pathagar.com

হয়েছিল এই হুনাইনে, যে-কারণে এই যুদ্ধ হুনাইনের যুদ্ধ নামেই প্রসিদ্ধ। রাসুল (সাঃ) খবর পাওয়ামাত্র কালবিলম্ব না করে ১২ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন আওতাসের দিকে। দশ সহস্র মুজাহিদ-তো ছিলই, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মক্কা থেকে যোগদানকৃত আরো দুই সহস্র মুজাহিদ। সেদিন ছিল শাওয়ালের ৬ তারিখ; আরাফাত অতিক্রম করে ধীরে ধীরে মুসলিম বাহিনী ১০ই শাওয়াল তারিখে গন্তব্যে পৌঁছলো। সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলমানেরা খুব উৎফুল্লচিত্তে বলাবলি করতে লাগলো, 'আজ আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।' রাসুল (সাঃ) এটা পছন্দ করেন নি, আল্লাহপাকও করেন নি। অনেক মুসলমান সাময়িকভাবে ভুলেই গেল যে, সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রবল কোন গুরুত্বপূর্ণ বস্তু নয়, জয়পরাজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

মালেক ইবনে আওফ তার সৈন্যদলকে গোপনে গোপনে নানাদিকে ছড়িয়ে রেখেছিল। মুসলিম বাহিনী উপস্থিত হওয়ামাত্র তারা প্রচণ্ড হামলা শুরু করে দিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই খুবই আকস্মিক ও খুবই অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণ, মুসলিম বাহিনী একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো, সৃষ্টি হলো চরম নাজুক ও বিপর্যয়কর অবস্থা। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে মুসলিম বাহিনীর প্রায় সবাই কে কোথায়-যে অসহায়ের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে হারিয়ে গেল, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। হুবহু এইরকমই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল ওহুদের পাদদেশে। হুনাইনের এই যুদ্ধে সেই ওহুদেরই দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। খুবই নগণ্যসংখ্যক কিছু সাহাবী ছাড়া রাসুল (সাঃ)এর আশে পাশে কেউ আর অবশিষ্ট নেই। রাসুল (সাঃ) তীব্রতম সংকটের মুখেও অসম-সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সবাইকে যুদ্ধে ফিরিয়ে আনার জন্য চীৎকার করে তিনি বলেছিলেন 'আনান্নাবীউ লাকাযীব' আমি নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই। রাসুল (সাঃ)এর নির্দেশক্রমে তাঁর চাচা হজরত আব্বাস (রাঃ) যথাসম্ভব জোর-গলায় সবাইকে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন। হজরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি যখন তাঁর দরাজকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন, 'ওগো বৃক্ষওয়ালা, ওগো বাইয়াতে রিদওয়ান ওয়ালা, তোমরা কোথায়' তখন দেখা গেল, মুসলিম সৈন্য নানাদিক থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানদের জন্য পৃথিবী নির্মমভাবে সংকুচিত হয়ে এসেছিল; কিন্তু আল্লাহর কী রহস্যময় অভিপ্রায়, স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই দৃশ্যপট পাল্টে গেল, নিশ্চিত পরাজয় রূপান্তরিত হলো নিরঙ্কুশ বিজয়ে। আল কোরআন এবং রাসুল (সাঃ)এর হাদিস থেকে জানতে পারি, হুনাইনের এই যুদ্ধে বদরের মতই আল্লাহর ফেরেশতারা অবতরণ করেছিল।

মালেক ইবনে আওফ শুধু সৈন্যদল নিয়েই যুদ্ধ করতে আসে নি; এসেছিল নারী শিশু উট বকরি ইত্যাদি সবকিছু সঙ্গে নিয়ে। অতএব পরাজিত হয়ে যখন তারা উর্ধশ্বাসে পলায়ন করলো, খুব সহজেই মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হলো নারী শিশু ও অসংখ্য পশুসহ বিপুল দ্রব্যসম্ভার। ঐতিহাসিকদের নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুযায়ী হুনাইনের এই যুদ্ধে

www.pathagar.com

৬ হাজার যুদ্ধবন্দী, ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার বকরি ও দেড়-লক্ষাধিক দিরহামের চাঁদি মুসলমানদের অধিকারে আসে। পরাজিত সৈন্যদল নানাদিকে পালিয়ে গেল। রাসুল (সাঃ) সবাইকে নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। কিন্তু তায়েফে গিয়ে এই পলাতক শত্রুপক্ষ এমন এক দুর্ভেদ্য দুর্গে আত্মগোপন করলো, যা পুরোপুরি জয় করা সম্ভব হলো না। প্রায় তিন-চার সপ্তাহ অবরোধ অব্যাহত রাখার পর রাসুল (সাঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তনই উপযুক্ত মনে করলেন। কারণ একদিকে সাহাবীরাও পরিশ্রান্ত, অপরদিকে মদীনা থেকে অনুপস্থিতিও দীর্ঘতর হচ্ছে। তায়েফ থেকে ফেরার পথে যেরানা নামক স্থানে যুদ্ধলব্ধ গণীমতের সকল সম্পদ রাসুল(সাঃ) ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিলেন। জানা যায় প্রত্যেক সৈন্য ৪টি করে উট ও ৪০টি করে বকরি পেয়েছিল; এবং বিশিষ্ট যোদ্ধারা পেয়েছিল ১২টি করে উট ও ১২ টি করে বকরি। নানাদিক বিবেচনা করে রাসুল (সাঃ) নবদীক্ষিত মুসলমানদের প্রতি একটু বেশি আনুকূল্য দেখালেন। আবু সুফিয়ান তার দুই সন্তানের অংশসহ একাই পেয়েছিল আঠারো কিলোগ্রাম চাঁদি ও তিনশত উট। এতে আনসারদের মধ্যে একটু অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। রাসুল (সাঃ) এটা বুঝতে পেরে আনসারদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তারা-তো উট বকরি নিয়ে ঘরে ফিরছে, আর তোমরা ফিরছো আল্লাহর রাসুলকে সঙ্গে নিয়ে, এটা কি তোমাদের মনঃপূত নয়'? এই কথায় সকলে অনুতপ্ত হলো; সবার মধ্যে স্বস্তি-আনন্দের প্রস্রবণও বয়ে গেল। ইতোমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটলো। হাওয়াজেন গোত্রের একটি নেতৃস্থানীয় দল ইসলাম গ্রহণকরত রাসুল (সাঃ) এর কাছে হাজির হলো। তাদের আবেদন, তারা তাদের গোত্রের নারী ও শিশুসহ সকল বন্দীর মুক্তি চায়। তাদের এই প্রার্থনা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) মঞ্জুর করলেন। হুনাইন ও তায়েফের এই অভিযানে সর্বমোট ১৫ থেকে ২০ জন মুসলিম সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন; কাফেররা নিহত হয় ৮০ জনের মত বা তারও কিছু বেশি। যেরানা থেকে এহরাম বেঁধে রাসুল (সাঃ) সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় এসে প্রথমে ওমরাহ পালন করলেন। এবং তারপর মক্কার গভর্ণর হিসেবে হজরত আত্তাব ইবনে আছীদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। সমগ্র মদীনা আনন্দে উৎফুল্ল, আল্লাহপাকের প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতায় বিনীত বিগলিত। রাসুল (সাঃ) সবাইকে নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন অস্টম হিজরির ২৪শে জিলকদ।

মদীনায় ফেরার পর রাসুল (সাঃ) মুসলমানদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রদান, সর্বত্র শান্তিপ্রতিষ্ঠা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতিসাধন ইত্যাদি নানামুখী রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপালনে মনোযোগী হলেন। এতদিন অব্যাহত যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে উল্লিখিত বিষয়াবলীর দিকে যথোচিত নজর দেয়া সম্ভব হয় নি। এখন পরিবেশ পূর্বাপেক্ষা অনেক অনুকূল, প্রায় পুরো আরব ভূখন্ডই এখন রাসুল(সাঃ)এর একক কর্তৃত্বাধীন। অতএব এটাই যথার্থ সময়, আল কোরআনের অব্যর্থ হেদায়াতকে সামনে রেখে রাসুল (সাঃ)

www.pathagar.com

সমাজে ও রাষ্ট্রে তথা জীবনের সর্বস্তরে পরিপূর্ণ ইসলামী হুকুমত কায়েমের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। মদীনা হয়ে উঠলো সমগ্র আরব জাহানের কেন্দ্রস্থল; মদীনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো এক নতুন সভ্যতা, ইসলামী সভ্যতা। এক নাম-পরিচয়হীন মরুবাসী যাযাবর জাতি তাদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেঙ্গে রাসুল (সাঃ)এর নেতৃত্বে অভাবনীয় পরাক্রম নিয়ে আবির্ভূত হলো এক অপরাজেয় শক্তিরূপে। পুরো পৃথিবী বিস্ময়চোখে অবলোকন করছে মুসলিম সভ্যতার এই অপ্রতিহত উত্থান, অবলোকন করছে একটি গ্রন্থ ও একজন মানুষের কী-নির্ভূল অব্যর্থ পথনির্দেশনা!

কিন্তু আবারও সমস্যা। আসলে ইসলাম মানেই ইবলিসের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম। আল্লাহ বলেন, 'ফাকাতিলু আউলিয়াশ শায়তান' শয়তানের যারা সুহৃদ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো (সুরা নিসা)। শয়তানের সহযোগী সখা-সুহৃদেরও শেষ নেই, মুসলমানের জীবনে যুদ্ধেরও শেষ নেই। ইসলামের অজেয় অগ্রযাত্রা ও তার ভবিষ্যৎ ফলাফলের কথা চিন্তা করে রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াস খুবই উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে পড়লো। তার ধারণা হলো, মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাওয়া দরকার; নাহলে অচিরেই রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল পুরোটাই হাতছাড়া হয়ে যাবে। অতএব মুসলিম শক্তি যাতে আরো অধিক বিপজ্জনক হয়ে উঠতে না-পারে, এই লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য হিরাক্লিয়াস ৪০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল দুর্ধর্ষ বাহিনী প্রস্তুত করলো। এ-সময় রাসুল (সাঃ) খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন যাপন করছিলেন। কখন-যে রোমকবাহিনী তীব্রবেগে আক্রমণ করে বসে, সবার মধ্যেই এ-নিয়ে ছিল প্রচণ্ড মানসিক চাপ ও উদ্বেগ। বস্তুত, উৎকণ্ঠারই কথা, কারণ এ-কোন সাধারণ বাহিনী নয়, তৎকালীন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিধর সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সামরিক বাহিনী। যাই হোক, একদিন সত্য সত্যই এই নির্ভুল সংবাদ পাওয়া গেল যে, রোম ও গাসসানের ঐক্যবদ্ধ বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে। রাসুল (সাঃ) স্থির করলেন, রোমকবাহিনীকে কিছুতেই মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না; যুদ্ধ রোমের এলাকাতেই হবে। তিনি খোলাখুলি সবকথা জানিয়ে সবাইকে দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। সময়টা ছিল নানা কারণে অত্যন্ত প্রতিকূল; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অল্প কিছু সংখ্যক মুনাফিক ব্যতীত কোন মুসলমান এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে পিছিয়ে থাকে নি। সকল প্রতিকূলতা তুচ্ছ করে এই সময় সমগ্র মুসলিম উম্মাহ তিতিক্ষা ও কোরবানীর মধ্য দিয়ে রাসুল (সাঃ) ও ইসলামের প্রতি আনুগত্য-মুহাব্বতের যে-চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তার কোন তুলনা হয় না।

নবম হিজরির রজব মাস। আল্লাহর পথে শাহাদাতের নজরানা পেশ করবার জন্য উদগ্রীব অকুতোভয় তিরিশ হাজার মুজাহিদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আল্লাহর রাসুল রওয়ানা হলেন প্রতিপক্ষ বাহিনীকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে। মদীনার দায়িত্ব দিয়ে

www.pathagar.com

গেলেন হজরত আলীর উপর। একাদিক্রমে ১৫ দিন যাত্রার পর মুসলিম বাহিনী রোমান সৈন্যদলের মুখোমুখি তাবুকের প্রান্তরে উপস্থিত হলো। অনতিদূরে হিরাক্লিয়াস-গাসসানীর বিশাল সুসজ্জিত বাহিনী, যুদ্ধ হলে এই তাবুকের প্রান্তরেই হবে। কিন্তু কী-যে হলো, রোমান সৈন্য যুদ্ধে আসা-তো দূরের কথা, ভয়ে আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হয়ে একরকম পালিয়ে গেল। কে-জানে হয়ত গত বছরের মূতার যুদ্ধের স্মৃতি তাদেরকে ভয়ার্ত করে তুলেছে; কারণ সেখানে ছিল মাত্র তিন হাজার, আর আজ তাবুকে সৈন্যসংখ্যা তিরিশ হাজার। তাছাড়া মূতার যুদ্ধে রাসুল (সাঃ) উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু আজ তাবুকে তিনি স্বয়ং যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। এমতাবস্থায় রোমান বাহিনী খুব একটা ভুল করেনি। রোমকরা শুধু যুদ্ধবিদ্যায়ই দক্ষ নয়, তারা বুদ্ধিমানও বটে। অতএব বেঘোরে প্রাণত্যাগ করার চেয়ে নিরাপদে পলায়ন করাই উচিত বিবেচনা করলো হিরাক্লিয়াসের 'অজেয় অপরাজেয়' দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী। যুদ্ধ আর হলো না। মুসলিম বাহিনী একেবারে বিনাযুদ্ধে তাদের বিজয় বৈজয়ন্তী উর্ধাকাশে উড়িয়ে দিল।

তাবুক যুদ্ধের এই অবস্থাদৃষ্টে পার্শ্ববর্তী কোন কোন গোত্র, রাসুল (সাঃ) ময়দানে থাকাবস্থায়ই, তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণকরত মুসলিম উম্মাহর শামিল হয়ে গেল, কেউ কেউ জিযিয়া প্রদানের শর্তে মুসলমানদের আধিপত্য মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করলো। এদিকে মদীনার মুনাফিকরা খুবই আশায় ছিল যে, পরাক্রান্ত রোমান বাহিনীর কাছে মুসলমানেরা শুধু পরাভূত হবে না, এমন শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হবে যে, আরব ভূখন্ডে ইসলাম বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু ফলাফলদৃষ্টে মুনাফিকদের মাথায় হাত। রাসুল (সাঃ) সবাইকে নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন রমজান মাসে। এই অভিযানে যাতায়াতেই দুইমাসের মত সময় লেগেছিল। এবং এই অভিযানই সর্বশেষ যুদ্ধাভিযান যেখানে আল্লাহর রাসূল সশরীরে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মদীনায় ফিরে রাসুল(সাঃ) সর্বপ্রথম যে-কাজটি করলেন, সেটা হলো 'মসজিদে জেরারার' ধ্বংসসাধন। মুনাফিকরা এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিল সবাইকে ধোঁকা দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপন তৎপরতা চালাবার জন্য চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল হিসাবে। এই যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোন গ্রহণযোগ্য ওজর বা অজুহাত না-থাকা সত্বেও তাবুক অভিযানে তিনজন মুমেন অংশগ্রহণ করে নি। তারা অন্য অনেকের মত ওজর পেশ না-করে রাসুল (সাঃ)এর কাছে অকপটে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলো। রাসুল (সাঃ) তাদের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহর নিকট থেকে কোন ফয়সালা না-আসা পর্যন্ত সর্বাত্মক বয়কট ঘোষণা করলেন। দীর্ঘ ৫০ দিন কঠোর বয়কটের মধ্যে অতিবাহিত হবার পর আল্লাহপাক তাদের তওবা কবুল করেন। এই তিনজন হলেন কাব ইবনে মালেক, মারারা ইবনে রাবী এবং হেলাল বিন উমাইয়া। এ-থেকে বুঝা যায়, ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব কী অপরিসীম এবং জিহাদ থেকে পশ্চাদপসরণের অপরাধ কত ভয়াবহ!

www.pathagar.com

তাবুক যুদ্ধের প্রভাব ছিল অপরিসীম। মানুষের মনে আর এতটুকু সন্দেহ থাকলো-না যে, ইসলাম অজেয় অপরাজেয়; সবাই বুঝলো ইসলামের বিজয় রুখবার মত কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই; এবং ইসলামই এই পৃথিবীর জন্য একমাত্র সত্য ও শাশ্বত ধর্ম। অতএব আর কালক্ষেপ না-করে দূর-দূরান্ত থেকে বহু প্রতিনিধিদল রাসুল (সাঃ)এর খেদমতে এসে একের পর এক ইসলাম কবুল করতে লাগলো। এর মধ্যে কয়েকটি প্রতিনিধিদলের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। বনি হানিফার ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল এই সময় রাসুল (সাঃ)এর কাছে আগমন করে। এই দলে মুসাইলামা নামে এক দুর্বৃত্তও শরীক ছিল। সবাই অকপটে ইসলাম গ্রহণ করলেও, এই দুর্বৃত্ত রাসুল (সাঃ)এর কাছে ক্ষমতার অংশ দাবী করে। রাসুল (সাঃ) তাকে একটি খেজুরের শুকনো ডাল দেখিয়ে বললেন, 'তুমি এটাও পাবে না'। এই মুসাইলামাই ভন্ড নবী মুসাইলামা কাজ্জাব। হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)এর খেলাফত কালে হজরত ওয়াহশি (রাঃ) এই ভণ্ড মিথ্যাবাদী মুসাইলামাকে বধ করেন। ইয়েমেনের প্রায় সকল আঞ্চলিক শাসনকর্তা ইসলাম-গ্রহণের স্বীকৃতি জানিয়ে এই সময়েই চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। এই সময় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল এসেছিল নাজরান থেকে। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পরও এই প্রতিনিধিদল যখন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছে না, তখন আল্লাহর রাসুল তাদেরকে বললেন, 'এসো, আমরা মোবাহালা করি'। অর্থাৎ খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহপাকের কাছে সত্যমিথ্যার ফয়সালা প্রার্থনার আহবান জানাই। তারা সাহস করলো না। আল্লাহপাকের বিশেষ রহমতে তারা ও তাদের মাধ্যমে পুরো নাজরানই ধীরে ধীরে ইসলাম-গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে। এই সময়ে ১৩ সদস্যের একটি তাজীব-প্রতিনিধিদল এসেছিল। তারা পূর্ণ ঈমানের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসুল (সাঃ)এর নিকট থেকে কোরআন সুন্নাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করে ফিরে যায়। এই রকম বহু প্রতিনিধিদল আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রমাগত এসে এসে ইসলামে দাখিল হতে থাকে। শুধু নবম হিজরি নয়, রাসুল (সাঃ)এর ওফাত-কাল পর্যন্ত প্রতিনিধিদলের এই আগমন অব্যাহত ছিল।

নবম হিজরির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)এর নেতৃত্বে মুসলমানদের হজ্বব্রত পালন। হজ্বের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে তৃতীয় হিজরিতে। কিন্তু মক্কাবিজয়ের পূর্বে মুশরিকদের কারণে এই ফরজ আদায় করা অসম্ভব ছিল। এইজন্য নবম হিজরিতেই মুসলিম উম্মাহর প্রথম হজ্ব। রাসুল (সাঃ) নিজে যান-নি তার কারণ, কাবাগৃহ এবং হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা তখনো মুশরিকদের অপবিত্র কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়নি। এইজন্যই হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)কে প্রথমে পাঠিয়ে হজ্ব-অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও আল্লাহপ্রদত্ত রীতি নিয়ম অনুযায়ী ইসলামসম্মত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ইতোমধ্যে সূরা তাওবাহর কয়েকটি আয়াত নাজিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল (সাঃ) হজ্ব কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে

www.pathagar.com

সঙ্গেই হজরত আলী (রাঃ)কে পাঠিয়ে দিলেন। হজরত আলীর (রাঃ) দায়িত্ব হলো, তিনি এই ঘোষণা দেবেন যে, আগামী বছর থেকে আর কোন মুশরিক ও অমুসলমান হজ্ব করা-তো দূরের কথা, কাবাগৃহের নিকটেও আসতে পারবে না। হজরত আবু বকর এবং হজরত আলী রাসুল (সাঃ)এর সকল নির্দেশ ও ঘোষণা সবাইকে শুনিয়ে দিলেন। সেই শেষ ; তারপর থেকে অদ্যাবধি আর কোন অমুসলিম মক্কাশরীফে প্রবেশ করতে পারে নি। হজরত আবু বকর এবং হজরত আলী যথানিয়মে হজ্বব্রত পালন করার পর জ্বিলহজ্বের শেষ দিকে মদীনায় ফিরে এলেন। নবম হিজরির এটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে, জাযিরাতুল আরব থেকে মূর্তিপূজা অবসানের চূড়ান্ত ঘোষণার সঙ্গে পবিত্র কাবাঘর ও পবিত্র হজ্ব কাফের মুশরিকদের প্রভাবমুক্ত হয়ে পুরোপুরি শির্ক ও অশ্লীলতামুক্ত হলো।

শুরু হলো দশম হিজরি; রাসুল (সাঃ)এর মাদানী জিন্দিগীর সর্বশেষ বছর। আল্লাহপাকের বিশেষ ইশারায় তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন যে, এই বৎসরই তাঁর পার্থিব জীবনের সর্বশেষ বৎসর; এই বছরটি অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি আর বেশিদিন থাকবেন না। পূর্বের যে-কোন সময় অপেক্ষা তিনি এই সময় খুবই বেশি বেশি আল্লাহপাকের ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতে লাগলেন। এইভাবেই পবিত্র হজ্বের সময় এসে গেল। শাওয়াল মাস শেষ হতে তখনো কয়েকদিন বাকি। তিনি হজ্বের সফরে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। পথে অতিবাহিত হলো মাসাধিক কাল। রাসুল (সাঃ) সফরসঙ্গীদের নিয়ে মক্কায় প্রবেশ কররেন দশম হিজরির জ্বিলহজ্ব মাসের চার তারিখে। পবিত্র হজ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে করতে ৮ তারিখ মীনায় কাটিয়ে ৯ই জ্বিলহজ্ব তারিখে দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আরাফাতে উপস্থিত হলেন। তাঁর চারপাশে তখন বিশাল এক জনসমূদ্র; এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, কোন কোন বর্ণনায় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাহাবীর সমাবেশ। রাসুল (সাঃ) সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষণ। তিনি বললেন, 'জানি-না এই স্থানে তোমাদের সঙ্গে এইভাবে আর মিলিত হতে পারবো কিনা। তোমাদের কাছে এমন একটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, সেটা হলো আল কোরআন। মনে রেখো আমার পরে আর কোন নবী নেই। নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্ব এইসকল ইবাদতে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করো না। জেনে রাখো, এই আরবভূমিতে আর কখনো শির্ক প্রতিষ্ঠিত হবে না; কিন্তু অনেক ছোটখাটো ব্যাপারে শয়তান তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করবে, কুপ্ররোচনা দেবে। তোমরা সাবধান থেকো'। আরো নানাদিকে আলোকপাত করার পর তিনি বললেন, 'তোমাদের কাছে আমার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে। তোমরা তখন কী বলবে?' সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, 'আল্লাহর পয়গাম আপনি পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব আপনি যথাযথ পালন করেছেন'। এই কথায় আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাঁর শাহাদাত-অঙ্গুলি

www.pathagar.com

আকাশের দিকে তুলে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো'। তারপর এইকথাও বললেন, ' তোমরা আজ এখানে যারা উপস্থিত, তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার সকল কথা পৌঁছে দেবে। উপস্থিত অনেকের চেয়ে অনুপস্থিত অনেকের কাছে এ-সকল কথা অধিক গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হবে।' এই সময়ই এই আয়াত নাজিল হলো, 'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আত্‌মামতু আলাইকুম নিমাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলামাদ্বীনা' আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের জন্য আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম (সূরা মায়িদা)।এই আয়াত শুনে হজরত উমার (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন, কারণ আল্লাহর নবী আর অল্পদিনের মধ্যেই-যে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন, তার স্পষ্ট ইশারা এখানে বর্তমান। এই সময়ে সূরা নসর-ও অবতীর্ণ হলো, 'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে যায়, এবং আপনি দেখতে পান যে, মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, তখন আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর তসবিহ করুন ও তাঁর কাছে মার্জনা কামনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা গ্রহণকারী।'

রাসুল (সাঃ) স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁর এই পার্থিব জিন্দিগীর একেবারে শেষপ্রান্তে এসে পৌঁচেছেন; বুঝতে পারলেন, এই সূরা নসর তাঁর মৃত্যুর খবর নিয়েই নাজিল হয়েছে। এরপরে রাসুল (সাঃ) খুবই বেশি বেশি হাম্‌দ তাসবিহ ও ইসতেগ্‌ফারে নিবিষ্ট থাকতেন; উঠতে বসতে সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় তিনি পড়তেন, 'সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আসতাগফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি'। একাদশ হিজরি শুরু হলো। সফর মাসে তিনি একটি বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করলেন ও তাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন রোম-সীমান্তে। ইতিপূর্বে রোমক-গভর্ণর হজরত ফারওয়াহ ইবনে আমর ইসলাম গ্রহণ করায় রোমসম্রাট তাঁকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করে। এই ধরনের দুঃসাহস যাতে আর কখনো কেউ না-দেখাতে পারে, মদীনা থেকে দূরবর্তী মুসলমানদের নিরাপত্তা যাতে এতটুকুও বিঘ্নিত না-হয়, মুসলমানদের মনোবল যাতে সর্বত্র সমানভাবে অক্ষুন্ন থাকে, কেউ যাতে মনে না-করে গীর্জার বাড়াবাড়ি ও স্বেচ্ছাচারিতার সমুচিত জবাব দেবার কেউ নেই, এবং ইসলাম গ্রহণ করার অর্থই হলো স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানো—এই লক্ষ্য সামনে রেখেই এই সেনাভিযান। হজরত উসামা ইবনে যায়েদের (রাঃ) নেতৃত্বে একটি বিরাট বাহিনী বাল্‌কা ও দারুমের ফিলিস্তিনী ভূখন্ড নাস্তানাবুদ করবার নির্দেশ নিয়ে যাত্রা করলো। কিন্তু মদীনা থেকে অল্প কিছুদূর যেতে না-যেতেই তারা রাসুল (সাঃ)এর গুরুতর অসুস্থতার খবর পেয়ে দ্বিধায় ও উদ্বেগে অগ্রসর হয়নি। হজরত আবু বকর সিদ্দিকী (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এই সামরিক অভিযান রাসুল (সাঃ)এর নির্দেশকে সামনে রেখে নতুন করে পরিচালিত হয়।

একাদশ হিজরির সফর মাসের শুরুতে রাসুল(সাঃ) একদিন ওহুদ প্রান্তরে

www.pathagar.com

গেলেন। সেখানে শহীদানের জন্য দোয়া করলেন এবং ফিরে এসে মসজিদে নববীর মিম্বরে উপবেশনকরত বললেন, 'আমি হাউজে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। আমার এই আশঙ্কা নেই যে, তোমরা আমার পরে শির্‌কে লিপ্ত হবে; আশঙ্কা করছি, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে'। এই সময় একদিন গভীর রাতে জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে কবরবাসীদের জন্য দোয়া করলেন; বললেন, 'জীবিতদের চেয়ে তোমাদের অবস্থা শুভ হোক। ফিত্‌না একের পর এক নেমে আসছে। পূর্ববর্তীদের চেয়ে পরবর্তীরা মন্দ'। এবং এই কথাও বলেন, ' আমি শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি'। তাঁর পার্থিব আয়ুষ্কাল-যে আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই, এটা বুঝা যাচ্ছিলো। এই অবস্থায়ই একদিন জান্নাতুল বাকী থেকে ফেরার পথে আকস্মিকভাবে রাসুল (সাঃ)এর প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও জ্বর শুরু হয়। তারিখটা ছিল একাদশ হিজরির ২৯শে সফর। গুরুতর অসুস্থতা নিয়েই তিনি ১১ দিন নামাজে ইমামতি করেন। ওফাতপূর্বে এই অসুস্থতা অব্যাহত ছিল সর্বমোট ১৪ দিন। শেষ তিন-চার দিন তাঁর কিছুটা নিরাময়ের ভাব পরিলক্ষিত হলেও, সেটা ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ব্যতিক্রম; অসুস্থতার ক্রমাবনতি অব্যাহতই ছিল।

ওফাতপূর্ব সময়ে রাসুল (সাঃ) কিছু অসিয়ত করেন। মৃত্যুর পাঁচদিন আগে, সেদিন ছিল বুধবার, রাসুল (সাঃ) অপেক্ষাকৃত কিছুটা সুস্থ বোধ করায় মসজিদে এসে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইহুদি নাসারাদের উপর আল্লাহপাকের লানত, তারা তাদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। তোমরা আমার কবরকে ইবাদতগাহে পরিণত করো না।' তারপর বললেন, 'আমি যদি কাউকে কখনো আঘাত বা অসম্মান করে থাকি, আমি চাই সে আমার নিকট থেকে বদ্‌লা গ্রহণ করুক'। এক ব্যক্তি তার তিন দিরহাম পাওনার কথা বললে রাসুল (সাঃ) ফজল ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) পাওনা পরিশোধের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি জোহরের নামাজ পড়ানো শেষ করে আরো কিছু কথা বললেন। আনসারদের সম্পর্কে অসিয়ত করলেন, 'তারা আমার হৃদয় ও কলিজা। আনসারদের মধ্যে যারা নেক্‌কার তাদেরকে গ্রহণ করবে, যারা বদ্‌কার তাদেরকে ক্ষমা করো'। বললেন, 'আল্লাহপাক তাঁর এক বান্দাহকে দুনিয়ার শানশওকত এবং আল্লাহর কাছে যা-আছে, এই দুটির যে-কোন একটিকে বেছে নেবার এখতিয়ার দিয়েছেন। সেই বান্দাহ শেষেরটি গ্রহণ করেছে।' এই কথায় হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন; কারণ এই কথার মধ্যে তিনি শুনতে পেলেন রাসুল (সাঃ)এর অত্যাসন্ন অন্তিমযাত্রার পদধ্বনি।

পরদিন বৃহস্পতিবার অত্যন্ত কষ্টের মধ্যেও তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করলেন। এক, জাযিরাতুল আরব থেকে ইহুদি নাসারা ও মুশরিকদেরকে বের করে দেবে; দুই, আগন্তুক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আমার অনুরূপ ব্যবহার করবে। তৃতীয় কথাটি বর্ণনাকারী সঠিক মনে রাখতে পারেন-নি। বর্ণনাকারীর মতে সম্ভবত সেটা হবে, কোরআন ও

www.pathagar.com

সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা অথবা উসামার নেতৃত্বে প্রেরিত সৈন্যদলকে যথাস্থলে অভিযান চালাবার নির্দেশ অথবা নামাজ ও অধীনস্থদের প্রতি যথোচিত খেয়াল রাখার কথা। এইদিন বৃহস্পতিবার এশার নামাজ থেকে রাসুল (সাঃ)এর নির্দেশক্রমে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ইমামতি করতে শুরু করেন। ইন্তেকালের দুইদিন আগে রাসূল (সাঃ) একবার মসজিদে এসেছিলেন কিন্তু সেদিনও হজরত আবু বকরই ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের একদিন আগে তিনি তাঁর সকল দাসদাসীকে মুক্ত করে দেন। তাঁর কাছে সে-সময় কয়েকটি দিনার ছিল, সেগুলি তিনি দ্রুত সাদকা করে দিলেন; কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল, সেগুলি বিতরণ করে দিলেন সাহাবীদের মধ্যে। আল্লাহপাক তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন বিশ্বজগতের আশীর্বাদস্বরূপ, মানববিশ্বের শাশ্বত আলোকবর্তিকারূপে। অথচ কী আশ্চর্য, বিদায় রজনীতে তাঁর ঘরে আলো জ্বালাবার মত তেলটুকুও ছিল না। দারিদ্র্যই ছিল তাঁর সারা জীবনের পরম ঐশ্বর্য! একেবারে শেষ দিন, ঘর থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি বেরিয়ে এলেন; দেখলেন, সবাই ফজরের নামাজে জামাতবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান। তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে এক অনাবিল তৃপ্তির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি আবার তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন।

এইভাবে একটি একটি করে শেষের দিনগুলি শেষ হয়ে গেল। ওফাতের পূর্বমুহূর্তে তাঁর পবিত্র মুখে শুধু একটিই কথা বার বার উচ্চারিত হচ্ছিলো, 'আস্‌সালাত আস্‌সালাত, অমা মালাকাত আইমানাকুম' অর্থাৎ নামাজ নামাজ এবং তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসী। একেবারে শেষ মুহূর্ত, রাসুল (সাঃ) অস্ফুটস্বরে তখন বলছিলেন, 'ইয়া আল্লাহ, নবী-সিদ্দীক শহীদ সালেহীন, যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, আমাকে মার্জনা করো, আমার প্রতি অনুগ্রহ করো। ইয়া আল্লাহ রফিকে আলা'। আল্লাহর রাসুল আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন আমাদের জননী মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আন্‌হার ঘরে তাঁরই কোলে মাথা রেখে। সময়, দ্বিপ্রহরের বেশ আগে, চাশতের ওয়াক্ত তখন পার হয়ে গেছে; দিনটা ছিল একাদশ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল। উপস্থিত সবাই বিমূঢ়, সবাই যেন এক আকস্মিক বজ্রাঘাতে বিপন্ন বিহবল ও নির্বাক। সিদ্দিকে আকবর হজরত আবু বকর (রাঃ) ওফাতমুহূর্তে কাছে ছিলেন না; খবর পেয়ে ছুটে এলেন। এসে দেখেন, হজরত উমার ফারুক (রাঃ) উন্মাদের মত চিৎকার করে করে বলছেন, 'যে বলবে রাসুল (সাঃ) মারা গেছেন, আমি তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলবো'। আবু বকর (রাঃ) তাঁকে সরাসরি কিছু না-বলে কুরআনুল মাজীদ থেকে এই আয়াত পাঠ করলেন, 'মোহাম্মদ-তো একজন রাসুল মাত্র। আগেও অনেক রাসুল গত হয়ে গেছে। তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন, তোমরা কি তাঁর আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? জেনে রাখো, যে-ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ অচিরেই কৃতজ্ঞদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন' (সুরা আল ইমরান)। সবাই সম্বিত ফিরে পেলো, হজরত উমারও শান্ত হলেন।

www.pathagar.com

সমগ্র মদীনা শোকাভিভূত। দৃশ্যত সবকিছুই ঠিকঠাক আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মদীনার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। হজরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রাসুল (সাঃ) যেদিন আমাদের মধ্যে আগমন করেন, সেদিনের চেয়ে সমুজ্জ্বল কোন দিন আমি আর দেখিনি। আর যেদিন তিনি আমাদের ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করলেন, তার চেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্ভাগ্যজনক দিন আমি আর কখনো দেখি নি'। যাই হোক, রাসুল (সাঃ) পৃথিবীতে চিরকাল থাকবার জন্য আসেন নি। 'ওয়ামা আনা ইল্লা নাজীরুম মুবীন', আমি একজন সুস্পষ্ট ভয়-প্রদর্শক মাত্র' (সুরা আহকাফ)। অতএব যা-হবার তাই-ই হলো। সকল দায়িত্ব কর্তব্য সুচারুভাবে সম্পাদন করবার পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মহামানব শ্রেষ্ঠতম রাসুল আল্লাহর প্রিয়তম হাবীব আল্লাহপাকের আহবানে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন। পার্থিব হিসাবে সেদিন তাঁর বয়স ৬৩ বৎসর পুর্ণ হয়ে ১ দিন, কোন কোন বর্ণনাতে ৪ দিন। মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৩ ই রবিউল আউয়াল তারিখে তাঁকে গোসল করানো হলো। গোসল করালেন হজরত আলী (রাঃ) হজরত আব্বাস (রাঃ) এবং হজরত আব্বাসের দুই ছেলে। তাঁর মৃত্যুশয্যার নীচেই কবর প্রস্তুত করা হলো; তিন প্রস্থ ইয়েমেনী চাদরে তাঁর কাফনের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর নামাজে জানাযা দশজন দশজন করে পাঠ করেন, এতে পুরো দিন এবং রাতেরও অনেকাংশ ব্যয়িত হয়। জানাযার নামাজে কেউ ইমাম হন-নি। মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রি দ্বিপ্রহরের দিকে রাসুল (সাঃ)এর পবিত্র দেহ-মোবারক কবরে সমাহিত করা হলো। তিনি আশ্রয় গ্রহণ করলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁর শ্রেষ্ঠতম বন্ধু রফিকে-আলা আল্লাহপাকের পরম সান্নিধ্যে। ইয়া আল্লাহ, আপনি আপনার প্রিয়তম হাবীব-কে মাকামে মাহমুদ জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থানে অধিষ্ঠিত করুন; আর আমাদেরকে দান করুন ক্ষমা ও অনুগ্রহের জন্য আপনার মহান দরবারে তাঁর শাফায়াতলাভের সৌভাগ্য। আমীন, ছুম্মা আমীন।

www.pathagar.com

পবিত্র মিরাজ ও মদীনা-সনদ

কোন সন্দেহ নেই, রাসুল (সাঃ)কে আল্লাহপাক রাজা হয়ে রাজত্ব করবার জন্য প্রেরণ করেন নি। তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল নবী ও রাসূলরূপে সর্বমানবিক কল্যাণ ও মুক্তির আলোকবর্তিকা হাতে দিয়ে। তিনি সর্বদেশ ও কালে পরিব্যাপ্ত সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ সর্বোত্তম আদর্শের নমুনা। অতএব একান্ত নিভৃত গৃহীজীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালনা পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর যুগপৎ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নমুনার স্বাক্ষর বর্তমান। তিনি যেমন গৃহীজীবনের নবী, একই সঙ্গে পারিষদ পরিবৃত নৃপতিদের দরবারগৃহ, সমাজ সংসার রণক্ষেত্র সর্বত্রই তিনি সঠিক পথপরিক্রমার বার্তাবহ, আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূল। এমন কোন ক্ষেত্র নেই, চিন্তা ভাবনা ও কার্যের এমন একটিও কোনো জায়গা নেই যেখানে তিনি অনুপস্থিত।

যাই হোক, এটা বাস্তব যে, মানুষ কেবল পারিবারিক সুখ-দুঃখ নিয়ে পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ নয়; মানুষ অপরিহার্যরূপে সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। কাজেই রাসূল (সাঃ)এর জীবন ও জীবনাদর্শের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালনার নির্ভুল দিকনির্দেশনা যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সর্বমানবিক আদর্শরূপে তাঁর ভূমিকা বহুলাংশেই অপূর্ণ থেকে যায়। এবং তাঁর অবদান যে সর্বত্র সমানভাবে সমুপস্থিত ও সর্বমানবিক, এই অভিধাটিও আর যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে না।

কিন্তু তা কি হয়? তিনি যেহেতু খাতামুন্নাবীয়ীন, তাঁর পরে যেহেতু Divine Message নিয়ে আর কোনো নবী আসবেন না; তাঁকে রিক্ত নিঃসম্বল কুটিরবাসী থেকে রাজাবাদশাহ, ইবাদতমগ্ন তাহাজ্জুদগুজার থেকে উত্তাল-বিক্ষুব্ধ রণাঙ্গনে জিহাদ ও শাহাদাতের তামান্না বুকে নিয়ে যুদ্ধরত সৈনিক, সকলের জন্যই নিঃশর্তভাবে অনুসরণযোগ্য কর্মপ্রণালী ও আদর্শের নমুনা রেখে যেতে হবে। অর্থাৎ অন্যসকল কাজের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েও তাঁকে দেখিয়ে যেতে হবে, রাজত্ব করা কাকে বলে; এবং একটি সুস্থ-কল্যাণময় সমাজপ্রতিষ্ঠার জন্য অনুসৃত অপরিহার্য ব্যবহারিক বিধানসমূহ কী?

উল্লেখ করি, নবুয়তলাভের মধ্যেই লুক্কায়িত তাঁর এই অনাগত দায়িত্বের ইশারা। এবং আল্লাহর রাসূল প্রথম থেকেই স্পষ্ট অনুধাবন করেছিলেন যে, প্রাথমিক সংগ্রাম ও সাধনার পরেই আসছে এক তাওহিদী-সমাজ বিনির্মাণের কাজ, সর্বমানবিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের আলোয় আলোকোজ্জ্বল একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্ব।

রাসূল (সাঃ)যে এই বিষয়টি নবুয়ত প্রাপ্তির প্রায় পরপরই বা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিলেন তার একটি বড় উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হলো, কাফের মুশরিকদের অকথ্য

www.pathagar.com

নিগ্রহ-নির্যাতনের মোকাবিলায় অসহায় সাহাবীদের তিনি ধৈর্যধারণের আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, সেই দিন খুব নিকটবর্তী, যখন সানা থেকে হাদরামাউথ পর্যন্ত একজন সুন্দরী সালঙ্কারা রমণীর একাকী দীর্ঘ পথযাত্রায় শুধু আল্লাহর ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো ভয় থাকবে না। অর্থাৎ জাযিরাতুল আরবে যে-ঘন কৃষ্ণবর্ণ জাহেলিয়াত, সেই অন্ধকার সন্ত্রাসকবলিত জনপদে রাসূল (সাঃ)এর নেতৃত্বে অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এক আলোকোজ্জ্বল নির্ভয় নিরাপদ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা।

আসলে তাওহিদী-জীবনাদর্শের ভিত্তিতে মানুষের জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণকর একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পত্তন ও প্রবর্তনই ছিল রাসুল (সাঃ) এর সকল কাজ ও দায়িত্বের মুল কেন্দ্র। এবং এই কাজটি যাতে পূর্ণ-সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হতে পারে, নির্ভুল সুচারুভাবে রূপায়িত হতে পারে, সেই লক্ষ্যে আল্লাহপাক স্বয়ং তাঁর হাবীবকে পবিত্র মিরাজ-রজনীতে নানা বিষষে নানা জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে ১৪ টি নীতিসম্বলিত অপরিহার্য পরম সওগাত উপহার হিসাবে তুলে দিলেন। এবং তুলে দিলেন এমন সময়, যার অল্প কিছুকাল পরেই মদীনাকেন্দ্রিক একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মহানবী (সাঃ)এর স্কন্ধে অর্পিত হবে।

পবিত্র মিরাজের আধ্যাত্মিক অলৌকিক যে-সকল বিষয় ও শিক্ষা তা সবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বলা আবশ্যক, মানুষের পার্থিব জীবনব্যবস্থার অকাট্য সাফল্য ও সুষমতার জন্য নিঃশর্তভাবে অনুসরণীয় যে-নির্দেশনামা, সেটাই আসলে সর্বাধিক প্রণিধানের বিষয়। দীর্ঘ ব্যাখ্যা ও দীর্ঘ আলোচনা পরিহারকরত আমরা এখানে সূরা বনি ইসরাইলের ২২ থেকে ৩৭ নং আয়াত পর্যন্ত এরশাদকৃত নির্দেশনামাটি পেশ করতে পারি, যা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল বুনিয়াদ।

১. আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য স্থির করো না।
২. আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কারো দাসত্ব বা ইবাদত করো না।
৩. পিতা-মাতার সঙ্গে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করো।
৪. আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করো; অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের প্রতি মনোযোগী হও।
৫. অপব্যয় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।
৬. ব্যয়কুণ্ঠ অর্থাৎ কৃপণ হয়ো না, বেপরোয়া মুক্তহস্তও হয়ো না।
৭. দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করো না।
৮. ব্যভিচারের নিকটেও যাবে না।
৯. কাউকে হত্যা করো না।
১০. এতিমের সম্পদের কাছেও যেও না।

www.pathagar.com

১১. অঙ্গীকার পূর্ণ করবে অর্থাৎ কিছুতেই ওয়াদা খেলাফ করবে না।
১২. সর্বাবস্থায় মাপ সঠিক রাখবে, যেন এতটুকু হেরফের বা কমবেশি না-হয়।
১৩. যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পেছনে লেগে থেকো না।
১৪. পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না।

এই হলো আমাদের জন্য আল্লাহপাকের প্রেরিত অমূল্য সওগাত। এই সওগাত অবহেলা করে মিরাজের অন্য নানারূপ হকীকত-মারেফাত নিয়ে শ্রম ও কালক্ষেপ রীতিমত আত্মপ্রতারণারই সমূহ নামান্তর।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)এর মিরাজ সম্পর্কে অনেকে অনেক রকম কথা বলেন। কারো মতে এই মিরাজ স্বপ্নঘটিত আধ্যাত্মিক । কেউ কেউ এটা সশরীরে-ভ্রমণ বলে বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু এই বিশ্বাসের অনুকূলে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও প্রদান করেন ; অর্থাৎ বলতে চান, বিজ্ঞানের নিয়মেই এটা সম্ভব। এবং তাঁদের ধারণানুযায়ী বলতে হয়, আধুনিক বিজ্ঞানের আর-কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলে রাসূল (সাঃ)এর পবিত্র মিরাজের অনুরূপ স্বল্পসময়ে সপ্ত-আসমান ও নভোভ্রমণ খুব-একটা কঠিন কাজ হবে না। আর আল্লাহ বলে যদি আসলেই কেউ থাকেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখাও হবে।

বিশুদ্ধ উন্মাদ! বিজ্ঞানমনস্কতা ভালো, কিন্তু অতিরিক্ত বিজ্ঞানমুগ্ধতা খুবই বড় ধরনের গোমরাহীও সৃষ্টি করে। এই ধরনের গোমরাহীর গহবর থেকে আল্লাহপাক আমাদেরকে হেফাযত করুন।

বোরাক কী সপ্ত-আসমান পরিক্রমা অন্তে হজরত জিবরাইল (আঃ)এর পক্ষেও অনধিগম্য এক অত্যুচ্চ রহস্যময় জগতের প্রবেশপথে রাসূল (সাঃ)এর একাকী 'রফরফে' আরোহন, এই 'রফরফই' বা কী, সময় ও দূরত্বের সমীকরণই বা কী-ভাবে সম্ভব, এই ধরনের কূট কৌতূহল ও অনাবশ্যক অনুসন্ধিৎসা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল অনুমোদন করেন না, পছন্দও করেন না। পবিত্র মিরাজের দাবি হলো, যাঁরা মুমেন তাঁরা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)এর মতোই নিঃশর্ত বিশ্বাস নিয়ে বলবেন 'আল্লাহর রাসূল যেহেতু বলেছেন, আমি সর্বান্তঃকরণে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ঘটনা সর্বাংশে সত্য। এ-নিয়ে অহেতুক পেরেশানির কোনো আবশ্যকতা নেই।'

বিষয়টি এইভাবে উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, মিরাজ থেকে রাসূল (সাঃ) মুসলিম মিল্লাতের জন্য দায়িত্ব কর্তব্য ও পথনির্দেশনার যে-অমূল্য উপহার নিয়ে এলেন, সেদিকে যথেষ্ট সজাগ না-হয়ে আমরা শুধু মিরাজের অলৌকিকত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই ভালোবাসি। এটা একটা গুরুতর প্রমাদ।

www.pathagar.com

যাই হোক, মিরাজের পর দেড় বছর বা তার কিছু বেশি-সময় অতিবাহিত হবার প্রাক্কালে সংঘটিত হলো রাসূল (সাঃ)এর হিজরত। মক্কা থেকে মদীনায় এসে তিনি মদীনাকেন্দ্রিক যে-নগররাষ্ট্রের পত্তন করলেন, সেটাই ইসলামের প্রথম রাষ্ট্র; এবং মদীনাই হলো ইসলামী সমাজব্যবস্থার সর্বপ্রথম দৃশ্যমান অবয়ব। কিন্তু এই মদীনা শুধু মুসলমানদের নয়, সেখানে অনেক ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরও বসবাস। রাসূল (সাঃ) অনুধাবন করলেন, শুধু আনসার-মুহাজির নয়, সবাইকে নিয়েই মদীনা; ক্ষুদ্র একটি নগররাষ্ট্র। কিন্তু যত ক্ষুদ্রই হোক, রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তার দায়িত্ব ক্ষুদ্র নয়। তিনি অনুধাবন করলেন, রাষ্ট্রের সংহতি ও নিরাপত্তা প্রশ্নে একটি ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থা যেমন জরুরি, সর্বত্র সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান যেমন জরুরি, সকলের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য একটি ঐকমত্য এবং গোত্র-বর্ণ-ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি প্রগাঢ় পারস্পরিক বন্ধনও একই রকম অত্যন্ত জরুরি। বলা আবশ্যক, ইসলামপূর্ব কালে ও ইসলামের প্রাথমিক সময়ে বহু দেশ বহু রাষ্ট্র যেমন ছিল, বহু শাসনকর্তাও ছিল; কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় উল্লিখিত ধারাণাগুলির কোন অস্তিত্বই ছিল না। রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্য কি তারও পূর্বে গ্রীক রাষ্ট্র, এইরকম পৃথিবীর বহু দেশে বহু রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সেই সকল শাসনব্যবস্থার অধীনে সাধারণ মানুষ ছিল নিতান্তই কর ও শ্রমের যোগানদাতা; এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষায় অশ্ব কি হস্তীর মতোই তারা ছিল নিতান্তই ভারবাহী ভাড়াটিয়া সৈন্য। রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের আর অন্য কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা ছিল না। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন, রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং ব্যবস্থাপনায় জনগণের ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্টতা, সমানাধিকার ও রাষ্ট্রীয় সত্তায় স্বীকৃত-নাগরিকত্ব, রাসূল (সাঃ)ই এই আধুনিক রাষ্ট্রধারণার জনক। শুধু জনক বললে ঠিক বলা হয় না, বলা উচিত বাস্তব ও ব্যবহারিক রূপকার।

মদীনা সনদ-এর কথা উল্লেখ করি। বিধর্মীরাও সপ্রশংসচিত্তে স্বীকার করেন, পৃথিবীতে এই সনদই রাষ্ট্রপরিচালনার সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। শুধু সর্বপ্রথম নয়, সর্বোৎকৃষ্টও বটে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' 'মানবাধিকার' 'সমনাগরিকত্ব' ইত্যাদি নিয়ে বর্তমান পৃথিবী উচ্চরবে যে-আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করছে, তার সর্বোচ্চ সার্থক উদাহরণ হলো মদীনা-সনদ এবং রাসূল (সাঃ)এর পরিচালনাধীন নগররাষ্ট্র মদীনাতুন্নবী। মদীনা-সনদ-এর কতিপয় ধারা উল্লেখ করলেই এটা পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে, সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু ধর্ম বর্ণ গোত্রের ভেদাভেদ ইত্যাদি নানাকিছু নিয়ে যে রাষ্ট্রীয় সমস্যা, কাউকে এতটুকু আহত না-করে, সকলের দায়িত্ব ও অধিকার সমানভাবে অক্ষুন্ন রেখে একটি অব্যর্থ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা সহজ ও সম্ভব। নানা রকম ইবলিসি কূটকৌশল পরিত্যাগ করে, আর কিছু না-হোক, পৃথিবী যদি রাসূল (সাঃ)এর নিকট থেকে শুধু মদীনা-সনদের শিক্ষা ও শর্তটুকু গ্রহণ করে, তাহলেও এই পৃথিবী মানবপ্রেমে উদ্ভাসিত একটি সুন্দর আলোকিত পৃথিবীতে রূপান্তরিত হতে পারে।

www.pathagar.com

এবং এই বক্তব্য-যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জিত নয়, মদীনা সনদ-এর নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় ধারা থেকেই তা আমাদের কাছে সম্যক বোধগম্য হবে। শুধু আমাদের কাছে নয়, পৃথিবীর সকল বিবেকবান মানুষই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, ইসলামের রাষ্ট্রনীতি কত অব্যর্থ এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাসূল (সাঃ)এর সাফল্য কত গগনচুম্বী!

মদীনা সনদ-এর শর্তসমূহ এক. কোন মুমেন অন্য মুমেনের বিরোধিতা করতে পারবে না।

দুই. মুসলিম রাষ্ট্রে অনুগত অমুসলিমদের অধিকার সমানভাবে নিরাপদ। একজন নগণ্যতম অমুসলিমও পূর্ণ নিরাপত্তার অধিকারী।

তিন. ইসলামের স্বার্থে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হলে আপসরফা হবে ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে।

চার. কোনো অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। তাদের ধর্ম ধর্মস্থান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পূর্ণমাত্রায় সুরক্ষিত থাকবে।

পাঁচ. ইনসাফের প্রশ্নে কারো প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না।

ছয়. শত্রু কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হলে সবাই সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করবে; তবে জুলুম কিংবা অপরাধে লিপ্ত না-হলে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে-যাওয়া বা অংশগ্রহণ না-করা নিষ্ক্রিয় লোকও মদীনার ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ।

সাত. কেউ সততার পথ অবলম্বন করলে, তার পূর্বকৃত পাপাচার ক্ষমার চোখে দেখতে হবে।

আট. ঘোষণাপত্র গ্রহণকারীদের যারা মিত্র তারাও একই রকম মৈত্রী ও নিরাপত্তার অর্ন্তভূক্ত বলে গণ্য হবে।

নয়. মযলুমকে সাহায্য করা সকলের কর্তব্য। অতএব বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় কেউ যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না-করলে, যুদ্ধাবস্থায় তাকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

দশ. কোনো বিষয়ে কোনরূপ মতবিরোধ সৃষ্টি হলে, সে-বিষয়ে ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)এর শরণাপন্ন হতে হবে।

মোটামুটি এই হলো মদীনা সনদ-এর অন্তঃসার। পবিত্র মিরাজ থেকে প্রাপ্ত হেদায়েতের অবলম্বনে এই যে একটি সুখদ কল্যাণময় রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা নির্মিত হলো, সর্বকালের পৃথিবীর জন্য এটাই আদর্শ রূপরেখা।

বলাই বাহুল্য, একবারে নিখাদ-কাফের ও মুনাফিক ছাড়া, পবিত্র মিরাজ থেকে সওগাতরূপে প্রাপ্ত সমাজ বিনির্মাণে হেদায়াতের যে-শর্তাবলী এবং মদীনা সনদে বিধৃত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক যে-রাষ্ট্রীয় সংবিধান, তার সাফল্য ও অবিসংবাদিত সার্থকতার বিষয়টি কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এই জন্যই বহুকাল আগে মুসলিম সাম্রাজ্য

www.pathagar.com

থেকে অনেক দূরবর্তী দ্বীপদেশ বৃটেনে কিং ওফা (রাজত্বকাল : ৭৫৭-৭৯৬ খ্রীঃ) পোপসহ পুরো খ্রীস্টানবিশ্বের প্রচণ্ড প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ইসলাম কবুল করেছিলেন। 'ম্যাগনাকার্টা' খ্যাত বৃটেনের রাজা কিং জন (রাজত্বকাল : ১১৯৯-১২১৬ খ্রীঃ) পোপ পাদরি ও যাজকতন্ত্রের সর্বাত্মক হুমকি অগ্রাহ্য করে ব্যক্ত করেছিলেন ইসলাম গ্রহণের দুর্নিবার আগ্রহ। শুধু আগ্রহ নয়, কিং জন তাঁর পত্রসহ দু'জন বিশিষ্ট দূত হার্ডিংটন ও ফিজিচোলাস-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলও বাগদাদের খলীফা মুহাম্মদ আল নাসীর আল দ্বীনিল্লাহ'র নিকট প্রেরণ করেছিলেন (১২১২ খ্রীঃ)। চিঠিতে কিং জন ইসলাম গ্রহণের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে তাঁর রাজ্যকে মুসলিম খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত করারও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিশ্ববিখ্যাত নেপোলিয়নও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; এবং তাঁর আশা ছিল ইসলামের বিধান অনুযায়ী তিনি তাঁর সাম্রাজ্য পরিচালনা করবেন। অবশ্য ওয়াটার্লু-যুদ্ধে বিপর্যয়ের কারণে নেপোলিয়ন তাঁর সংকল্প বাস্তবায়িত করতে পারেন নি। আসলে যাদের খোশনসীব, ইসলামের সংস্পর্শে এসে তারা বদলে না-গিয়ে পারে না; আর যাদের বদনসীব তারাও একই রকম, ইসলামের দুশমনি না করে স্থির থাকতে পারে না।

যাই হোক, যা বলতে চাই তা হলো পৃথিবীভরা কত চিন্তানায়ক, কত সমাজবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, কত দার্শনিক মানবপ্রেমী রাষ্ট্রনেতা, কিন্তু এটা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত সত্য, তাঁরা তাঁদের প্রজ্ঞা ও বিবেচনা দ্বারা দেশ কি পৃথিবী-তো দূরের কথা, নির্ভুলভাবে একটি গ্রামও পরিচালনা করতে পারেন না।

কেউ হয়ত বলবেন, পৃথিবী-কি চলছে না? চলছে, কিন্তু চলছে ইবলিসি-কায়দায় লক্ষ্যহীন বল্গাহীন অশ্বের মতো। অথচ রাসূল (সাঃ)আনীত মিরাজ রজনীর চৌদ্দ দফা আদেশ-নিষেধ সম্বলিত সোনালী সওগাত যদি পৃথিবী গ্রহণ করতো, যদি গ্রহণ করতো রাসূল (সাঃ)প্রণীত মদীনা সনদ-এর শিক্ষা ও শর্তাবলী, কোনো সন্দেহ নেই, পৃথিবীর প্রতিটি পরিবার ও সমাজ ও রাষ্ট্র খেলাফতে রাশেদার মতই হিল্লোলিত হয়ে উঠতো জান্নাতী সৌরভে। কারণ মোহাম্মদ শুধু মোহাম্মদ নন, তিনি মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। তিনি যা-বলেছেন তা সবই আল্লাহর কথা, তিনি যে-পথ দেখিয়েছেন, সে-পথ আল্লাহরই নির্দেশিত পথ।

পৃথিবীর বড় দুর্ভাগ্য, এমন সুবর্ণপথের সন্ধান পেয়েও স্বেচ্ছায় পথ হারিয়ে উদভ্রান্ত হয়ে গেল, এমন সুবর্ণ আলোকবির্তকা হাতে পেয়েও দুর্ভাগা পৃথিবী অন্ধত্বকেই আপন করে নিলো।

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ)এর জীবন ও সহিষ্ণুতা

সমগ্র মানববংশের জন্য প্রেরিত যে-হেদায়াত বা পথনির্দেশ আল কোরআন, রাসূল (সাঃ) ছিলেন তারই স্বচ্ছতম বিশ্বস্ততম মানবিক প্রতিরূপ। অর্থাৎ কেউ যদি আল কোরআন অধ্যয়ন না-করেন, শুধু রাসূল (সাঃ)এর জীবন ও উপস্থাপিত জীবনাদর্শের প্রতি সমনস্ক দৃষ্টিপাত করেন, তিনি হুবহু আল কোরআনকেই অবলোকন করবেন। অথবা এটাও সমভাবে সত্য যে, রাসূল (সাঃ)এর সুন্নাহ ও সীরাত বা বাস্তব জীবনচরিত কেউ যদি কোন কারণে অবলোকন করার সুযোগ না পান, তিনি যদি কেবল যথোচিত বিশ্বাস ও অনুরাগ ও তাকওয়াসহ কুরআনুল কারীম মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেন, তিনি রাসূল (সাঃ)এর পুরো বাস্তব জীবনচিত্রকে নির্ভুলভাবে দেখতে পাবেন। অর্থাৎ সহজ কথায়, আল কোরআনে এমন একটি বাক্য নেই, যা রাসূল (সাঃ) তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পেশ না-করেছেন, এবং একইভাবে তাঁর বহু সমস্যাকীর্ণ যাপিত জীবনে এমন কোন কথা ও কর্ম নেই, এমনকি ইশারা ইঙ্গিত কি নীরবতাও নেই, যা আল কোরআনে অনুপস্থিত। অতএব তাঁকে দেখলেই কোরআন যেমন পড়া হয়ে যায়; ঠিক একইরকম কোরআন পাঠ করলে তাঁকে দেখাও হয়ে যায়। এইজন্যই রাসূল (সাঃ)এর জীবন সম্পর্কে কোনো একজন সাহাবীর কৌতূহলী-প্রশ্নের জবাবে আমাদের জননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা তাৎক্ষণিকভাবে বলেছিলেন, 'তোমরা কি কোরআন অধ্যয়ন করো নি'?

এই কথাগুলি আলোচনার প্রারম্ভেই উপস্থাপন করতে হলো এইজন্য যে, আমাদের প্রতিপাদ্য যে-বিষয়, রাসূল (সোঃ)এর তেইশ বছরের নবুয়তি জিন্দিগীতে সর্বোচ্চ সহিষ্ণুতা, তার কোনো কিছুই তাঁর নিজস্ব কৃতিত্ব কি কর্মকুশলতার অভিব্যক্তি নয়, সবই আল কোরআনের নির্ভুল ও অকাট্য পথনির্দেশ দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত। বর্তমান নিবন্ধে আমাদের মূল আলোচ্য-বিষয়ের শীর্ষনাম হলো, 'রাসূল (সাঃ)এর জীবন এবং সহিষ্ণুতা'। প্রথমেই উল্লেখ্য, সহিষ্ণুতা একটি বিরাট গুণ; যথাস্থলে যথোচিত সহিষ্ণুতা অবলম্বন একটি বিরাট ইবাদতও বটে। আর ইবলিসের মোকাবিলায় একমাত্র আল্লাহপাকের অখণ্ড অবিভাজ্য প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় এই বস্তুটির গুরুত্ব ও আবশ্যকতা যে কী-অপরিসীম ও অপরিহার্য, রাসূল (সাঃ)এর পুরো নবুয়তি-জীবন তারই প্রশ্নাতীত দৃষ্টান্ত।

আল্লাহপাক জিহাদ অর্থাৎ আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণকে ফরজ করেছেন। এবং একই সঙ্গে আল্লাহর মনোনীত যে-দ্বীন, সেই ইসলামকে প্রতিষ্ঠার দুর্গম কন্টকাকীর্ণ পথে অবিচল ধৈর্যে দৃঢ়পদ থাকাও আল্লাহর কাছে একটি পছন্দনীয় ইবাদত। অনেকে জানেন, আল কোরআনের ছয় শতাধিক আয়াতে এই জিহাদ ও

www.pathagar.com

ধৈর্যের কথা সর্বাধিক গুরুত্বসহ বিবৃত হয়েছে। অতএব রাসূল (সাঃ)যে জিহাদ ও সহিষ্ণুতার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এক অক্ষয় অপরাজেয় উদাহরণরূপে নিজেকে উপস্থাপন করবেন ও করেছেন, এটাই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এতদসঙ্গে এই কথাটিও মনে রাখা জরুরি যে, এই সহিষ্ণুতা ও সংগ্রাম যেহেতু সর্বতোভাবে শুধু ইসলামের বিজয় ও সুরক্ষা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে যুক্ত, যেহেতু আল্লাহর আদেশ ও অভিপ্রায়কে কেন্দ্র করেই শুধু আবর্তিত; রাসূল (সাঃ)এর সহিষ্ণুতার মধ্যে লেশমাত্র ভীরুতা ও শৈথিল্য ও অভিমান ছিল না। এবং তাঁর জিহাদী ভূমিকার মধ্যেও ছিল-না এতটুকু শ্লাঘা ও হঠকারিতার কোনো স্থান। সর্বকালের প্রেক্ষাপটে তাঁর জিহাদ ও ধৈর্যের এটাই একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, কোনো কিছুর মধ্যেই তাঁর নিজস্বতা বলে কিছু ছিল না; তিনি ছিলেন আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য সর্বস্ব-উৎসর্গীত এক আত্মমুক্ত মহামানব।

পৃথিবীতে বহু দিগ্বিজয়ী বীরের আবির্ভাব ঘটেছে। অশোক সিজর আলেকজান্ডার থেকে এ-কালের নেপোলিয়ন হিটলার পর্যন্ত অনেকের অনেক কথাই আমরা জানি; কিন্তু সর্বকালের ইতিহাসে এমন একটি দৃষ্টান্তও কি আছে, যেখানে প্রতিপক্ষের পরাজয়ে বিজয়ী-বীর এতটুকু উল্লসিত হন-নি? এমন কোনো সহিষ্ণু মানুষের সন্ধান কি পাওয়া যায়, যিনি বছরের পর বছর মুষ্টিমেয় সঙ্গীসাথীসহ অকথ্য অভাবিত নিগ্রহ নির্যাতন ও বৈরিতার মধ্যেও আপন আদর্শকে আঁকড়ে ধরে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে আছেন? নেই। এমন কোনো ধৈর্যশীল পুরুষ কি পৃথিবী কখনো দেখেছে, যিনি দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে প্রাণঘাতী দুশমনদের ক্রোধ ও ক্রূরতাকে নির্বিকারভাবে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন, কোনো প্রতিবাদ করেন নি, কিন্তু আদর্শ থেকে এক ইঞ্চি পশ্চাদপসরণও করেন নি? পৃথিবী কি প্রত্যক্ষ করেছে এমন কোনো আদর্শনিষ্ঠ মহানপুরুষের মুখচ্ছবি, যিনি নিজেকে ও কতিপয় সঙ্গীসাথীকে শুধু এই কথা বলে সব নৃশংসতাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবার নির্ভীক ও নির্বিকার উক্তি পেশ করেছেন যে, বিগত দিনে বহু নবী ও তাঁর উম্মতকে শুধু তাওহিদী দাওয়াতের 'অপরাধে' লোহার চিরুনি দিয়ে শরীর থেকে মাংস ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে? না; ইতিহাস অকপটে সাক্ষ্য দেবে, পৃথিবী তার আবহমানকালের গতিপথে এ-রকম কোনো মানুষের সাক্ষাৎ কখনো পায় নি, এমনকি কখনো কল্পনাও করে নি। সবটুকু বুঝিয়ে লেখা অসম্ভব, সবার পক্ষেই অসম্ভব, শুধু বলা যায়, এই হলো রাসূল (সাঃ)এর অটল অবিচল সর্বংসহা তিতিক্ষার মোটামুটি পরিচয়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তিনিও অন্যদের মতই মানুষ, তাঁর কাছে অহী অবতরণ করে, এইটুকু শুধু পার্থক্য। অর্থাৎ তিনিও একজন যথাযথ মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন রক্তমাংসের মানুষই ছিলেন। অথচ ইতিহাস মুগ্ধবিস্ময়ে অবলোকন করে, নির্বাক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে এমন একজন রক্তমাংসের চলিষ্ণু মানুষ, যাঁর সহিষ্ণুতার বাঁধে কখনো এতটুকু ফাটল ধরে না, শত বিপদেও যাঁর ধৈর্যের কোনো সীমা পরিসীমা

www.pathagar.com

নেই। ইসলামের প্রথম-শহীদ জননী সুমাইয়া (রাঃ) যখন অকথ্য নির্যাতনভোগের পর গুপ্তাঙ্গে আবু জেহেলের বল্লমাঘাতে শাহাদাত লাভ করেন, রাসূল (সাঃ) ধৈর্য হারান নি। হজরত ইয়াসির (রাঃ)কে দুই উটের সঙ্গে বেঁধে দুই দিকে চালিয়ে তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হয়, হজরত খাব্বাব (রাঃ)কে জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে রাখা হয়, উত্তপ্ত বালুকার উপর পাথরচাপা দিয়ে রাখা হয় হজরত বেলাল (রাঃ)কে, এ-সবই রাসূল (সাঃ)এর চোখের সামনে, তিনি ধৈর্য হারাননি। এমনকি শিয়াবে আবু তালিবের সংকীর্ণ গিরি-উপত্যকায় তাঁকেসহ পুরো বনি হাশিমকে একাদিক্রমে তিন বছর অবরুদ্ধ রেখে অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়, তখনো রাসূল (সাঃ) ধৈর্য হারান নি। সকল কঠিন ও অবর্ণনীয় দুর্যোগ দুর্ভোগের মধ্যে একটা বড় সান্ত্বনা ছিল হজরত খাদীজা (রাঃ) এবং পিতৃব্য আবু তালিব, তাঁরাও যখন উভয়েই স্বল্পসময়ের ব্যবধানে ইন্তেকাল করলেন, পৃথিবী দেখলো, রাসূল (সাঃ) তখনো পর্বতের মতই অটল ও নির্বিকার। সিদ্ধান্ত হয়েছে কাফেররা সম্মিলিতভাবে আজ রাতেই তাঁকে হত্যা করবে। এই সংবাদ তিনি অবগত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে বিন্দুপরিমান ভয় কি অস্থিরতা কি চাঞ্চল্য কিছুই দেখা দেয় নি। বরং সকল উদ্বেগ ও চিত্তবিক্ষেপ থেকে মুক্ত পর্বতের মতো নিষ্কম্প এই মানুষটি হিজরতের প্রাক্কালে প্রাণঘাতী দুশমন পরিবেষ্টিত গৃহ থেকে এই পবিত্র আয়াতটি পাঠ করতে করতে নিষ্ক্রান্ত হলেন, ' হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে যেখানেই নিয়ে যান, যেখান থেকেই নিয়ে যান, আমার পবিত্রতা অক্ষত রাখুন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে দান করুন রাষ্ট্রক্ষমতা (সূরা বনি ইসরাইল)। রাসূল (সাঃ) যখন হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)কে নিয়ে গারে-সওরে, তখনো তিনি সকল দুর্ভাবনামুক্ত এক অবিশ্বাস্যরকম আশ্চর্য মানুষ। গুহামুখে শত্রুদের পদধ্বনি শ্রুত হচ্ছে, আবু বকর (রাঃ) উদ্বেগে-উৎকণ্ঠায় বিচলিত, কিন্তু রাসূল (সাঃ) শতকরা শতভাগ নিঃশঙ্ক ও নিরুদ্বেগ। সত্যই কী-সব এক একটি দুর্বহ সংকট অথচ কী অনন্য অসাধারণ অচঞ্চল সহিষ্ণুতা! পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নমুনা নেই, যার সঙ্গে স্থৈর্য ও সহনশীলতার এই সবাক ছবির এতটুকু কোনো তুলনা চলে।

কিন্তু মানবশক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অগম্য এই অতলান্ত সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখানো সম্ভব হয় কী-করে? হয় এইজন্য যে, প্রথমত নবী-রাসূলদের এটা একটা গুণ, যা তাঁদের মধ্যে স্বভাবগতভাবেই সর্বদা বর্তমান। এই বস্তুটির অভাব বা অনুপস্থিতি, অথবা বলতে হয়, এই বস্তুটির প্রতি বিস্মৃতি কি অমনোযোগ যে-কোনো অবস্থাতেই নবী-রাসূলদের জন্য একেবারে পুরোপুরি নিষিদ্ধ; যে-কারণে কুরআনুল কারীম থেকে এটা প্রমাণিত, হজরত ইউনুস (আঃ)এর সামান্য ধৈর্যচ্যুতিও আল্লাহপাক অত্যন্ত কঠিনভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এবং রাসূল (সাঃ) তাঁর দুরূহ দুর্গম কর্তব্যপথে কিছুমাত্র যাতে বিচলিত না-হন, এজন্য আল্লাহপাক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'ওয়া ইসমাইলা ওয়া ইদরিসা ওয়া জাআলকিফলি কুল্লুম মিনাছ্ছাবিরীন' এবং ইসমাইল ইদরিস ও জুলকিফলির কথা

www.pathagar.com

স্মরণ করুন, তারা সকলেই ছিল ধৈর্যশীল (সূরা আল আম্বিয়া)।

দ্বিতীয়ত ঃ কুরআনুল কারীমে বর্ণিত সেই কাহিনী, যেখানে হজরত ইবরাহিম (আঃ) স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পুত্র ইসমাইলকে কোরবাণী দেবার কথা বলছেন; আর বালক ইসমাইল (আঃ)এর নিঃশঙ্ক প্রতিক্রিয়া, তিনি বললেন, যে-কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন, হে পিতা আপনি তা সত্বর পালন করুন। আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্তরূপে দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ (সূরা সাফফাত)। বলাই বাহুল্য, এ-সকল কথা রাসূল (সাঃ)এর কাছেই অবতীর্ণ ; অতএব পৃথিবী যতই বিস্মিত হোক, তিনি কি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষার কণামাত্রও অন্যথা করতে পারেন! নবী রাসূলদের জন্য সে-পথ খোলাই নেই; তিনি শ্রেষ্ঠতম নবী, তাঁর জন্য তো একেবারেই নেই। আর ইসলামের যে-পয়গাম নিরঙ্কুশ তাওহীদ, যা রাসূল (সাঃ) বহন করে এনেছেন সমগ্র মানববংশের জন্য, তার মূল কথাই হলো, 'কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্ইয়া ইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার সকল ইবাদত, আমার জীবন ও মরণ সবই বিশ্বপ্রতিপালক একমাত্র আল্লাহপাকের জন্য (সূরা আনআম)। অর্থাৎ নিজস্বতা বলে কিছু নেই, আল্লাহপাকের জন্য জীবনের সবকিছু নিঃশেষে নি:শর্তভাবে কোরবানী করে দেবার নামই ইসলাম ও ইসলামের একত্ববাদ। আর এই তাওহীদের অখণ্ড আমানত পৃথিবীবক্ষে পৌঁছে দেয়া ও প্রতিষ্ঠা করার গুরুদায়িত্ব আল্লাহপাক যাঁর স্কন্ধে অর্পণ করেছেন, তিনি কি অসহিষ্ণু হতে পারেন? আলো জ্বালানোই যাঁর কাজ, অন্ধ অধৈর্য মানুষের শিক্ষাদানে তিনি কি হতে পারেন বিরক্ত ও বিব্রত ও অভিমানী ? পারেন না, কখনো কোনো অবস্থাতে মুহূর্তের জন্যও পারেন না। পৃথিবীর জন্য কল্পনাতীত, ধারণা কি স্বপ্নের পক্ষেও অগম্য, কিন্তু ইতিহাস বার বার এই নির্ভুল সবাকচিত্রটি পেশ করে যে, রাসূল (সাঃ)এর কঠিন ও মসৃণ সহিষ্ণুতার প্রাচীরগাত্রে কোথাও একটি সূক্ষ্মতম ফাটলরেখাও কখনো দেখা যায় নি।

কিছু কূট তার্কিক অবশ্য বলতে চায়, মক্কীজীবনে অসহায়ভাবে সবকিছু মেনে নেয়া ছাড়া রাসূল (সাঃ)এর করার কিছু ছিল না। অতএব এই সহিষ্ণুতা আসলে সহিষ্ণুতা নয়, পরিস্থিতির কাছে একজন অসহায় অনন্যোপায় মানুষের আত্মসমর্পণ। এবং তারা এইকথাও বলে, মাদানী জীবনে শক্তি সঞ্চিত হওয়া মাত্র তাঁর সহিষ্ণুতা আর বিশেষ অবশিষ্ট থাকলো না, যুদ্ধে-যুদ্ধেই কাটিয়ে দিলেন জিন্দিগীর অবশিষ্ট দশটি বছর। বলা আবশ্যক, বস্তুতই এ-রকম যারা মনে করে, তারা শুধু অজ্ঞ নয়, পুরোপুরি আকাট মূর্খও বটে। কিছুই না-জেনে ইসলামের বিরুদ্ধে গর্হিত মন্তব্য করা তাদের স্বভাব, তাদের একটি নীচ ও গুরুতর বিলাসিতা। তবু এই লঘুবুদ্ধি তার্কিকদের জ্ঞাতার্থে এইটুকু উল্লেখ করা যায় যে, মক্কীজীবনে রাসূল (সাঃ)কে যতটা অসহায় বলে মনে হয়, তিনি ততটা অসহায় ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সার্বক্ষণিকভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল

www.pathagar.com

আলামীন। সূরা আনফাল-এ রাসূল (সাঃ)কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'ওয়া মাকানাল্লাহু লিইউয়াজ্জিবাহুম ওয়া আন্তাফিহিম' আপনি উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাদেরকে অর্থাৎ আপনার দুশমনদেরকে কোনো শাস্তি দেয়া হবে না (সূরা আনফাল)। আল্লাহর কাছে তাঁর কী অপরিসীম ও কত সুউচ্চ মর্যাদার কথাই-না এখানে ঘোষিত হলো। এই রাসূল (সাঃ) কি আল্লাহর কাছে একটু ফরিয়াদ বা অভিমানও জানাতে পারতেন না? যাঁর পবিত্র অঙ্গুলিহেলনে আল্লাহপাক চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করে কাফের মুশরিকদেরকে স্তম্ভিত করে দেন, সেই রাসূল (সাঃ) অসহিষ্ণু হলে একটু-কি বদ্‌দোয়াও করতে পারতেন না? অবশ্য এক দু'বার তিনি শুধু এইটুকু উচ্চারণ করেছেন, 'আল্লাহুম্মা আলাইকা বি-কুরাইশ' অর্থাৎ হে আল্লাহপাক, কুরাইশদের দায়িত্ব আপনার উপর। এই একটি কথায়ই কুরাইশরা দারুণভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো। তাদের খুবই ভয় হতো যে, তারাও আবরাহার মতো আল্লাহ-প্রেরিত কোনো আকস্মিক গযবের মধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে না-যায়। কাফের মুশরিকদের তরফ থেকে ক্রমাগত আপস-প্রস্তাব আসছিল, এতই যদি অসহায় হবেন নিরুপায় হবেন, রাসূল (সাঃ) কি একটু আপসও করতে পারতেন না? বুরবাকদের বুঝানো অসম্ভব, তবু আশা করা যায়, তাদের বোধোদয় না-ঘটুক, এই সকল তথ্যদৃষ্টে অন্তত তাদের কুফরি-কালামে অভ্যস্ত কুৎসিত রসনা কিছুটা সংযত হবে।

হিজরতের পর মাদানী-জিন্দিগীতে রাসূল (সাঃ) কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন একথা সত্য, ইন্তেকাল পর্যন্ত পুরো সময়টা অবিশ্রাম যুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছে, এই কথাও সত্য; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি হঠাৎ অসহিষ্ণু ও প্রতিশোধপরায়ন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যুদ্ধ করেছেন আগ্রাসী শক্তির মোকাবিলার জন্য, ইসলাম ও মুসলমানদের সুরক্ষার জন্য, কিন্তু কোনো বিচারেই অসহিষ্ণুতাবশত নয়। তাছাড়া এটাও মনে রাখা জরুরি যে, রাসূল (সাঃ)এর সহিষ্ণুতা কোনো অবস্থাতেই ভীরুতা নয়, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার অভাব নয়। তিনি পথ চলেন আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী। তাঁর সকল কার্যক্রম মহাগ্রন্থ আল কোরআন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এইজন্যই যেখানে দৃঢ়তা প্রয়োজন, প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় তিনি সেখানে সহস্র সম্মিলিত শার্দূলের চেয়েও অকুতোভয়। কিন্তু যেখানে উগ্রতার কোনো প্রয়োজন নেই, আনীত দ্বীন ও ইনসাফের প্রশ্ন যেখানে জড়িত নয়, সেখানে তাঁর মধ্যে প্রীতি ও সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও ঔদার্যের বিন্দুমাত্র অভাব ঘটে নি। মাদানী জীবনের ইতিহাস থেকেই এটা অনুধাবন করা যায় যে, তিনি কতই-না ধৈর্যশীল, কতই-না স্নেহপ্রবণ।

তিনিই সকল যুদ্ধজয়ের অবিসংবাদিত মহানায়ক, কিন্তু তিনি ভুলক্রমেও কখনো উল্লসিত হন-নি; বরং ভেতরে ভেতরে তিনি এই ভেবে কাতর ও মর্মাহত হয়েছেন যে, অনেক মানুষ তাঁকে চিনতে পারলো না, জান্নাতের সুসংবাদকে উপেক্ষা করে অন্ধত্ব ও

www.pathagar.com

মূঢ়তাবশত জাহান্নামকেই তারা আপন করে নিলো। অন্ধ ইসলাম-বিদ্বেষীরা আশ্চর্য হয় না, কিন্তু এটা সমূহ আশ্চর্যেরই কথা যে, প্রাণঘাতী দুশমনের জন্যও একটি মানুষের মধ্যে কী অকল্পনীয় মমতা ও সহানুভূতি! এবং যে-যাই বলুক, শুধু ধৈর্যের জন্য ধৈর্য নয়, এক মর্মপ্লাবী মমতাই তাঁকে কণামাত্র অসহিষ্ণু হতে দেয় নি।

রাসূল (সাঃ)এর সর্বমানবিক প্রেম ও সহিষ্ণুতা যে কত গভীর ও অভাবনীয় ছিল, একটি দু'টি উদাহরণ থেকেই আমরা তা সম্যক অনুধাবন করতে পারি। পিতৃব্য হজরত হামযার হত্যাকারী ওয়াহশি যখন এসে তাঁর কাছে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের আবেদন জানায়, পিতৃব্যের জন্য হৃদয়ভরা হাহাকার সত্ত্বেও তিনি ওয়াহশিকে ক্ষমা করে দেন। যে-এক পাষণ্ড ইহুদি নারী যয়নব তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছিল, তাকেও রাসূল (সাঃ) নিজের তরফ থেকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু বিষক্রিয়ায় একজন সাহাবী ইন্তেকাল করেন, যয়নব প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। লাবীদ নামক অন্য এক পাষণ্ড কর্তৃক যাদুগ্রস্ত হয়ে রাসূল (সাঃ)কে কিছুদিন গুরুতর অসুস্থতার মধ্যে কাটাতে হয়, পরে স্বপ্নযোগে পুরো বিষয়টি পরিষ্কার জানতে পারেন। সেই পাষণ্ড লাবীদের বিরুদ্ধেও তিনি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। এমনকি তার নামটাও প্রকাশ করতে চান নি। যে-কোনো ব্যবস্থাগ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই ব্যবহার কিসের উদাহরণ? এ-যদি ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত না হয়, তাহলে সহিষ্ণুতা আর কাকে বলে? মক্কা বিজয়ের কথা স্মরণ করতে পারি। কী অত্যুচ্চ মহত্ব ও ঔদার্য ও ধৈর্যশীলতার অধিকারী ছিলেন যে, অতীতের সবার সব দুশমনি ভুলে গিয়ে সকলকে হতবাক করে তিনি ঘোষণা করলেন, 'লা তাছরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা' আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই (সুরা ইউসুফ)। মহত্বের এমন অভিব্যক্তি কল্পনা করা যায়! অসম্ভব। এমনকি ইকরিমা, কাব বিন জুহায়ের প্রমুখ যে-মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রাণদন্ডের হুকুম ঘোষণা করেছিলেন, তারাও প্রায় সকলেই সসম্মানে মার্জনা লাভ করে। মক্কী জীবনের একটি ঘটনা। কাবাগৃহের রক্ষক ওসমান ইবনে তালহার কাছে রাসূল (সাঃ) একদা চাবি চেয়েছিলেন। ওসমান চাবি-তো দিলোই না, বরং তাঁকে না-হকভাবে তিরস্কার ও অপমান করলো। ওসমানের এই দুর্ব্যবহারে রাসূল (সাঃ) সেদিন খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ এই মক্কাবিজয়ের দিনে সেই ওসমানই যখন ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো, রাসূল (সাঃ) কী করলেন? তাঁর মানসপটে ফুটে উঠলো সেই পুরাতন অপমানের স্মৃতি, ওসমানের দুর্বাক্য ও দূর্ব্যবহার, কিন্তু তিনি একটি কথাও বললেন না। রাসূল (সাঃ) চাবি ওসমানের হাতে ফিরিয়ে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, পুরুষ পরম্পরায় কাবাগৃহের এই চাবি রোজ কেয়ামত পর্যন্ত ওসমান ইবনে তালহার বংশধরদের হাতেই থাকবে। কেউ যদি ছিনিয়ে নেয়, সে জালিম। কাবাগৃহের চাবি এখনো পর্যন্ত ওসমানের বংশেই আছে। ইনশাআল্লাহ রোজ কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কারণ কে আর স্বেচ্ছায় বা সখে এমন দুঃসাহস দেখায়, যাতে রাসূল (সাঃ) ঘোষিত

www.pathagar.com

জালিমের অভিধায় পরিচিত হতে হয়।

বলাই বাহুল্য, এ-রকম বিভাদীপ্ত অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে আছে রাসূল (সাঃ)এর মহিমান্বিত জীবনে। অথচ এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই যেখানে তিনি অসহিষ্ণু। এমনকি মসজিদে নববীতে কেউ যখন মূত্রত্যাগের মতো গর্হিত নোংরা কাজটি করে বসে, সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও, তিনি ওই বুরবাক লোকটিকে প্রাকৃতিক কর্মসম্পাদনের অবকাশ দান করেন, এবং পরে তাকে নম্রভাবে বুঝিয়ে দেন। ঘটনাটি ক্ষুদ্র, কিন্তু বিকারহীন সপ্রীতি সহিষ্ণুতার এক অনবদ্য নমুনা। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই রাসূল (সাঃ) কে নানাভাবে কষ্টে ও সমস্যায় ফেলেছে। তার আপন সন্তান আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ-সহ সবাই যখন যথোচিত দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছেন, রাসূল (সাঃ) এই চিহ্নিত মুনাফিকের বিষয়টি আল্লাহপাকের উপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন। তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাইকে কিছুই বলেন নি। বরং তার পুত্র সাহাবী আবদুল্লাহর অনুরোধে অনেক বিশিষ্ট সাহাবীর বাধা উপেক্ষা করে তাঁর নিজের জামা দিয়ে তার কাফনের ব্যবস্থা করেন এবং জানাযাও পাঠ করেন। এবং এই কথাও বলেন, সত্তর বার দোয়া করলেও যদি আল্লাহপাক ক্ষমা করতেন, তাহলে তিনি সত্তর বার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের জন্য দোয়া করতেন। ইতিহাসই বলুক, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার এমন একটি উদাহরণও কি পৃথিবীতে আছে? বাস্তবে তো নেই-ই, মানুষের মনগড়া গল্প উপন্যাসেও নেই।

আসলে ব্যক্তিগত মান অভিমান ক্রোধ ক্রূরতা ঈর্ষা অসূয়া থেকে বহু উর্ধে ছিল মহানবী (সাঃ)এর অবস্থান। একমাত্র আল্লাহর দ্বীনের প্রশ্নে ইনসাফের প্রশ্নে তিনি ছিলেন নিরাপস। এ-ছাড়া সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রেই তিনি শত-শতাংশ ধৈর্যশীল ও স্নেহপ্রবণ। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, 'ছিবগাতাল্লাহ, ওয়ামান আহছানু মিনাল্লাহি ছিবগাতাঁউ' তোমরা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও, তাঁর রঙের চেয়ে আর কার রঙ উত্তম হতে পারে, (সূরা বাকারা)। আল্লাহপাকের একটি বিশিষ্ট রঙ হলো ক্ষমা ও অনুগ্রহ ও সহিষ্ণুতা। এইজন্যই রাসূল (সাঃ) বলেন, আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা তাঁর ক্রোধকে বহুগুণ অতিক্রম করে গেছে। আর আল্লাহর এই অন্যতম উৎকৃষ্ট রঙে রাসূল (সাঃ)এর চেয়ে কে-আর অধিক নিজেকে রাঙিয়ে নিতে পারেন! এবং এই হেতুই শত্রুমিত্র নির্বিশেষে তিনি সবার জন্যই প্রেম ও ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অত্যুত্তম আদর্শ, সবার জন্যই রাহমাতুল্লিল আলামীন।

www.pathagar.com

রাসূল (সাঃ)এর জীবন জিহাদী-জীবন

আমরা অনেক বুঝি, শুধু একটি বিষয় আমাদের বুঝতে বড় ভূল হয়, এবং অনেক সময় বুঝতে চাইও না, তাহলো এই পৃথিবীতে রাসূল (সাঃ) কেন এসেছিলেন? অবশ্য এটুকু মোটামুটি বুঝি ও বিশ্বাসও করি যে, তিনি প্রেরিত রাসূল, 'তিনি নাজীরুম মুবীন' প্রকাশ্য ভয়প্রদর্শনকারী, তিনি 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বিশ্বজগতের আশীর্বাদ। কিন্তু কেবল এইটুকুই। আমাদের পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই যে, আল্লাহপাক তাঁকে কেন পাঠিয়েছিলেন ? অথচ মহানবী (সাঃ)এর একজন নগণ্যতম উম্মতেরও এই বিষয়টি স্বচ্ছভাবে ও যথাযথরূপে অনুধাবন করা খুবই জরুরি। কারণ এটা না-বুঝলে আমাদের মুসলমানিত্বও দুর্বল হয়ে পড়বে, আমাদের সকল ইবাদত-বন্দেগীও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। এবং পরিণামে এমন ইবাদতগুজারে পরিণত হবো, যাদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেছেন - এমন বহু ইবাদতগুজার আছে যাদের নামাজ রোজা ও সকল পুণ্যকর্ম আল্লাহপাক ঘৃণাভরে তাদের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। কেন দেবেন? দেবেন এইজন্য যে, আল্লাহপাক যা-চেয়েছিলেন, ইবাদত সেই লক্ষ্যে নিবেদিত হয় নি, আল্লাহ প্রদত্ত শর্ত ন্যূনতম মাত্রায়ও পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব এটা জানা খুব জরুরি যে, আল্লাহপাক কী চান এবং রাসূল (সাঃ) আসলে জগদ্বাসীর কাছে কী-বার্তা বহন করে এনেছিলেন।

আমরা আমাদের প্রতি-নামাজের প্রতি রাকায়াতেই নিয়মিত পাঠ করে থাকি, 'ইয়া কানা আবুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন। ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম' আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো (সূরা ফাতিহা)। এখান থেকে অনুধাবন করা আদৌ কঠিন নয় যে, আমাদের ইবাদত ও শক্তি-সাহায্য প্রার্থনার মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহপাকের নিকট থেকে একটি সঠিক ও সুনির্দিষ্ট ও কল্যাণকর পথের সন্ধান পাওয়া; এবং সকল বিকার ও চিত্তবিক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে সেই পথ ধরেই নিরন্তর নিবিষ্টচিত্তে অগ্রসর হওয়া। আর একটু পরিষ্কার করে বলা যায়, ভুল হলে আল্লাহপাক মাফ করুন, বান্দাহ বা দাস হিসাবে হাজির থাকাই যথেষ্ট নয়, দাসের জন্য কিছু কাজও নির্ধারিত আছে যা অবশ্যকরণীয়। এই কাজ থেকে গাফেল ও বেখবর থাকলে, বান্দাহ হিসাবে নিজেকে পেশ করা না-করার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। নামাজ রোজা হজ্ব জাকাত ইত্যাদি যে-সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদত মুমেনদের জন্য ফরজ, সেগুলি অত্যন্ত জরুরি ও অপরিহার্য বটে কিন্তু তার মূল্য এইজন্য বেশি যে, ব্যক্তি হিসাবে এই সকল কাজের মধ্য দিয়ে আল্লাহপাকের সার্বভৌম প্রভুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে আমরা তাঁর মহান দফতরে বান্দাহ বা দাস হিসেবে নিজেদের নাম নিবন্ধনের ঘোষণা প্রদান করি। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ইবাদত হলো সজ্ঞানে ও প্রকাশ্যে

www.pathagar.com

সর্বান্তঃকরণে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের মধ্যে দাখিল হওয়া, আমৃত্যু দাখিল থাকা। যাঁর আনুষ্ঠানিক ইবাদত যত উত্তম, ইসলামে দাখিল হওয়ার কাজটি তাঁর তত বেশি পাকা ও নিখাদ। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এইজন্যই এই সকল ইবাদতকে বলেছেন বুনিয়াদ।

কিন্তু এই দাখিল হওয়া, এই বুনিয়াদ রচনাই কি সব অথবা চূড়ান্ত ? না, বুনিয়াদই যে সব নয়, চূড়ান্ত নয়, এ কথা সাধারণ বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে। আসলে আরো অনেক কাজ সামনে অপেক্ষা করছে, অনেক পথ আরো অগ্রসর হতে হবে। এবং এইজন্যই আল্লাহপাক এই ভর্তিকৃত মুমেনদের সম্বোধন করে বার বার বহুকথা এরশাদ করেন। কখনো বলেন, 'হে মুমেনগণ, তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি প্রবেশ করো, এবং শয়তানের আনুগত্য করোনা' (সূরা বাকারা)। কখনো বলেন - হে মুমেনগণ, কঠিন আযাব থেকে আত্মরক্ষার উপায় একটা লাভজনক ব্যবসার কথা শোন, সে-ব্যবসার মূলধন হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস এবং জীবন-সম্পদ সর্বস্ব নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে অবতরণ (সূরা ছফ)। আবার আল্লাহপাক এইকথাও বলেন, মুমেনদের জীবন ও সম্পদ তিনি জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন (সূরা তাওবাহ)। এই রকম যত দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা সবই মুমেনদের উদ্দেশ্যে। রাসূল (সাঃ)ও একই ভাবে বলেন, বুনিয়াদ-তো খুবই জরুরি কিন্তু 'ইসলামের শীর্ষদেশ হলো জিহাদ'; বলেন ' জান্নাতের অবস্থান হলো তরবারির ছায়াতলে'। অতএব যে-কোন মুমেনকে-যে অনেক তিতিক্ষা অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির ছায়াতলে আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য হাসিল করতে হবে, এ-নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবং এরই নাম পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ এবং এই হেতুই ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন বা জীবনবিধান, ইসলামের অপরনাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য নিয়ে পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

যাই হোক, এ-সব কথা মোটামুটি সবিস্তারে লিখতে হলো এই কারণে যে, আমরা সমগ্র জীবনব্যাপী শুধু বুনিয়াদই নির্মাণ করে চলেছি, কিন্তু আল্লাহপাকের যে-আসল অভিপ্রায়, বুনিয়াদের উপর একটি মনোরম দৃশ্যমান ইসলামের সৌধরচনা, সেদিকে আমাদের ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। অর্থাৎ আল্লাহপাকের মূল অভিপ্রায় সম্পর্কে ও রাসূল (সাঃ) আনীত পয়গাম সম্পর্কে আমরা খুবই গাফেল। অথচ এটা না-বুঝলে ইসলামের কিছুই বুঝা হয় না; রাসূল (সাঃ)এর মুহাব্বতে জিকির-ফিকির যত যাই করি, তা-দিয়ে কাজের কাজ কিছু হয়-না। এবং এইজন্যই রাসূল (সাঃ)এর পবিত্র জীবনের নানাদিক নিয়ে আমরা সীমাহীন উচ্ছ্বাসে উতলা হয়ে উঠি, কিন্তু তিনি-যে ইসলামের বিজয় ও কামিয়াবির জন্য জিহাদের ময়দানে এক সংশপ্তক সিপাহসালার, এই কথাটি বুঝতে ব্যর্থ হই; প্রকৃতপক্ষে বুঝতে চাইও না। মুমেন যদি এ-রকমই হয়, সে যদি নিরাপদ

www.pathagar.com

নিরুপদ্রব পৃথিবী-নিরপেক্ষ বন্দেগীকেই মনে করে ইসলাম, তাহলে কথাটা রূঢ় হলেও সত্য, এই ধরনের মুমেনদের কোন বন্দেগীই আল্লাহপাক আখেরাতে গ্রাহ্য করবেন না। আল্লাহ বলেন, 'ইন্নালিল মুত্তাকীনা মাফাজান' মুত্তাকীদের জন্যই সাফল্য (সূরা নাবা)। কিন্তু কেউ যাতে মুত্তাকী বলতে অলস ও লক্ষ্যহীন ও কর্মবিমুখ তাকওয়া-সম্পন্ন না-বোঝে, এইজন্য আল্লাহপাক প্রথমেই আল কোরআন সম্পর্কে বলে দিয়েছেন, এই নির্ভুল মহাগ্রন্থটি মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক। অর্থাৎ মুত্তাকী-হওয়াই যথেষ্ট নয়, আল কোরআনকে সঙ্গে নিয়ে তাকে একটি নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু সেই লক্ষ্যটি কী? যতদূর বুঝি এবং রাসূল (সাঃ)এর জীবনব্যাপী নিরন্তর সংগ্রাম ও সাহাবীদের জীবন-ইতিহাস থেকে যেটুকু বোধগম্য হয়, সেই লক্ষ্যটি হলো, সকল খোদাদ্রোহী তাগুতি শক্তিকে পরাভূত করে আল্লাহর এই পৃথিবীতে আল্লাহর অখণ্ড অবিভাজ্য সার্বভৌম প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। যতদূর বুঝি, এইজন্যই নবী রাসূলদের আগমন, এইজন্যই ইসলাম এবং এইজন্যই আল কোরআন। উল্লেখযোগ্য, আমরা জন্মসূত্রে রাসূল (সাঃ)এর উম্মত হিসাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গৌরবের অধিকারী। বলাই বাহুল্য, আল্লাহপাক তাঁর একান্ত অনুগ্রহে এই অতুলনীয় নেয়ামত, এই অনন্য গৌরব আমাদেরকে দান করেছেন। কী-অপরিসীম রহমত আল্লাহপাকের, কোন কষ্ট-প্রচেষ্টা ছাড়াই আমরা তাওহীদ ও রেসালাতের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। অথচ কী নিদারুণ বদনসীব আমাদের, আমরা না তাওহীদ বুঝি, না রাসূল (সাঃ) এর জীবনাদর্শের মধ্যে প্রতিফলিত মূল পয়গামটিকে বুঝি।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, রাসূল (সাঃ)এর পুরো পার্থিব জীবনটাই জিহাদী জীবন। ইসলামকে বিজয়ী করবার এক কঠিন গুরুভার স্বন্ধে নিয়েই তাঁর নবুয়তি জিন্দিগীর যাত্রা শুরু। আল্লাহপাক যদিও বলেছেন, ' তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলো-কে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসুলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরন করেছেন, যাতে এই দ্বীন সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ করতে পারে, যদিও মুশরিকরা তা পছন্দ করে না' (সূরা ছফ)। কিন্তু রাসূল (সাঃ) ভালোভাবেই জানতেন, বিজয়ের এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, শুধু অবিচল সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আল্লাহপাকের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছনো সম্ভব হবে না; এক প্রচণ্ড বিরোধীশক্তির মোকাবিলায় তাঁকে আমৃত্যু প্রাণপনে লড়াই করতে হবে। কারণ আল্লাহপাক শুধু বিজয়ের সুসংবাদ জ্ঞাপন করেন-নি, সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে আল্লাহর দ্বীন-প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী ভূমিকার কথাও বলেছেন। এ-লড়াই ভূমি দখলের লড়াই নয়; এ-লড়াই আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। আল্লাহপাক-যে বলেন, জান্নাতের বিনিময়ে মুমেনের জীবন ও সম্পদ তিনি ক্রয় করে নিয়েছেন (সূরা তাওবাহ), আল্লাহর হাতে সর্বস্ব তুলে দেবার এই প্রথম বিক্রেতাটি কে? নিঃসন্দেহে রাসূল (সাঃ)। আল্লাহপাক

www.pathagar.com

একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসার কথা বলেন, যার অন্যতম অপরিহার্য শর্ত ও মূলধন হলো 'জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ' আল্লাহর জন্য সর্বস্ব নিয়ে জিহাদে অবতরণ। কিন্তু এই ফলপ্রসূ ব্যবসায়ে সওদাগর হিসাবে কার নাম সর্বশীর্ষে অবস্থান করবে? নিঃসন্দেহে তিনি রাসূল (সাঃ)।

কিন্তু আফসোস রাসূল (সাঃ)এর এই সংগ্রামী ভূমিকাটিকে আমরা বিশেষ গুরুত্বসহ অনুধাবন করতে চাই না। কখনো কখনো প্রকারান্তরে অস্বীকারও করি। বিশেষ করে অনেকদিন থেকে এমন একদল আপাদমস্তক মুত্তাকীর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা দেশ কি রাষ্ট্র কি পৃথিবী-পরিচালনার প্রশ্নে নীরব দর্শক হয়ে যে-কোনো ইসলামী আন্দোলনকে সর্বতোভাবে পরিহারযোগ্য একটি ফিতনা বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আফসোস, বহু টগবগে তরুণ ও যুবক, জিহাদী তামান্নায় উজ্জীবিত বহু উদ্যমী সাহসী মানুষ আজ এদের ভুল নসীহতে ঝিমুতে ঝিমুতে একেবারেই ঘুমিয়ে যাচ্ছে। অনেকে বলেন, মুসলিম মিল্লাতের সর্বনাশ সাধনে তাদের এই দলটি আসলে ইহুদি পৌত্তলিকদের একটি কুশলি চক্রান্তের ফসল। এই ধারণা কতটা সঠিক অথবা আদৌ সঠিক কিনা, আল্লাহপাক জানেন। তবে তাঁদের বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম ও ইসলাম-প্রেমের ধরন থেকে এটা না-বুঝে উপায় থাকে না যে, তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)এর অভিপ্রায় ও পথনির্দেশ থেকে বহু দূরবর্তী এক ভুলপথের অভিযাত্রী। তাঁরা বলেন, তাঁরাও সার্বক্ষণিক জিহাদের মধ্যেই আছেন। কুরআনুল কারীমে যে-জিহাদের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তাঁরাও সেই একই জিহাদের মুজাহিদ। আত্মপক্ষ সমর্থনে জিহাদের অপব্যাখ্যায় তাঁদের এই হাস্যকর অপচেষ্টা সত্যই বড় গুরুতর ও কৌতুকবহ। গুরুতর এইজন্য যে, এই বিভ্রান্তি বহু মানুষকে নিদারুণভাবে পথভ্রষ্ট করছে; আর কৌতুককর এইহেতু যে, জিহাদের এই ধরনের কোন সাক্ষ্য না কোরআনে আছে, না রাসূল (সাঃ)এর জীবনে কোথাও আছে। এমনকি কোনো একজন সাহাবীর জীবনেও এই ধরনের নিরস্ত্র নিরাপদ জিহাদের কোন সাক্ষ্য নেই।

নিরস্ত্র শত্রুমুক্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা সাধ্য-সাধনার নামই যদি জিহাদ হবে, তাহলে ইসলামের জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ) প্রথম তেরো বছরে কম সাধ্য সাধনা করেন নি। কারো অজানা নয়, কত নিগ্রহ কত প্রতিরোধের মধ্যে তাঁকে পথ চলতে হয়েছে। তিনি আশায় বুক বেঁধে ছুটে গিয়েছেন তায়েফে, ফিরে এসেছেন তায়েফবাসীদের নির্মম আক্রমণে রক্তাপ্লুত হয়ে। কুরাইশদের সর্বাত্মক বাধা ও বৈরিতার মধ্যেও তিনি ওকাযের মেলায় তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরেছেন; অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত সাহাবীদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন হাবশায়, পরিবার পরিজনসহ বরণ করে নিতে হয়েছে মক্কাবাসীদের চাপিয়ে দেয়া সর্বাত্মক দীর্ঘ দুঃসহ বয়কট। কিন্তু প্রাণ হাতে নিয়ে এতসব কাজের পরেও রাসূল (সাঃ)এর মক্কীজীবনের সংগ্রাম সাধনাকে না কুরআনুল কারীমের কোথাও জিহাদ বলা

www.pathagar.com

হয়েছে, না রাসূল (সাঃ) নিজে কোথাও এটাকে জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। অতএব সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের উচিত, কোন-রকম আভিধানিক অথবা কোন মতলবী-দলের বিভ্রান্তিতে না-জড়িয়ে জিহাদকে সশস্ত্র যুদ্ধ বা কিতাল হিসাবে গ্রহণ করা। মানুষের মধ্যে কোনরূপ সংশয়ের সৃষ্টি না-হয়, কোন ভিন্ন-ব্যাখ্যার অবকাশ না-থাকে, এজন্য আল্লাহপাক 'কিতাল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। নাহলে শুধু চেষ্টা প্রচেষ্টার নামই যদি হয় জিহাদ, তাহলে সেই চেষ্টা-প্রচেষ্টা মক্কী জিন্দিগীতেও ছিল, পূর্ণমাত্রায়ই ছিল। কিন্তু তখন জিহাদের কথা বলা হয় নি, জিহাদ ফরজ বলে কোন হুকুমও নাজিল হয় নি।

যাই হোক, প্রকৃত জিহাদ কী বস্তু, তারই নির্ভুল সাক্ষ্য মাদানী-জিন্দিগীর প্রেক্ষাপটে রাসূল (সাঃ)এর পুরো দশটি বছরের সশস্ত্র সংগ্রামী জীবন। তিনি আবহমান পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব শুধু নন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাহিদও বটে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি-যে পর্বতের মত অবিচল দৃঢ়তা ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তার কোন তুলনা নেই। আমরা নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারি, কিঞ্চিদধিক দশ বছরের মাদানী-জীবনে তাঁকে সর্বমোট ৫৪টি সারিয়া ও ২৭টি গাজওয়া অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছে। এমনকি তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়, তখনো এক বিশাল সৈন্যবাহিনী তাঁরই আদেশে বহির্গত হয়েছে রোম সীমান্তে শত্রুর তৎপরতা স্তব্ধ করে দেবার জন্য। এমন আমৃত্যু অব্যাহত সশস্ত্র সংগ্রামের রেকর্ড পৃথিবীর কোন সমরনায়কের নেই; আলেকজান্ডার সিজর নেপোলিয়ন, হিটলার কি মন্টগোমারি কারো নেই। তিনি নিরাপদ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গৃহে লুকিয়ে থাকা কোনো খেতাবী ফিল্ডমার্শাল ছিলেন না; তিনি ছিলেন যুদ্ধের তুমুল তান্ডবের মধ্যেও রণক্ষেত্রে অটল দন্ডায়মান একজন আসল ফিল্ডমার্শাল। অথচ আজ কী বদনসীব আমাদের, সর্বকালের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সমরবিদকে আমরা নিরীহ দরবেশী-নবী হিসাবে পরিচিত করার অপচেষ্টায় তৎপর। ভয়ে হোক বা কোন মতলবে হোক, রাসূল (সাঃ)এর সর্বাধিক উজ্জ্বল ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক-কে আড়ালে রাখবার এই চেষ্টা নিঃসন্দেহে অতীব গর্হিত একটি অপরাধ। আসলে ইবলিস অধিকাংশ সময় আল্লাহকে অস্বীকার করে না, আল্লাহর রাসূলকেও করে না; শুধু সুকৌশলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-অভিপ্রায়কে অপব্যাখ্যা করে। এবং এইভাবেই পথভ্রষ্ট করে বান্দাহকে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, জিহাদ হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠতম ইবাদত; এবং বলেছেন, জিহাদ হলো ইসলামের শীর্ষদেশ। এবং এটা শুধু মুখের কথা নয়, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সকল রণে ও রণাঙ্গনে এইকথার শতকরা একশত ভাগ বাস্তব প্রমাণ পেশ করেছেন। তাঁর জীবন থেকে এটা প্রমাণিত, ইসলাম কোন মেষশাবকদের ধর্ম নয়, কাফের মুশরিক মুনাফিকদের মোকাবিলায় মুসলিম উম্মাহর এক-একটি সদস্য এক একটি ভয়াবহ শার্দূল। রাসূল (সাঃ)এর এই জিহাদী উত্তরাধিকার নিয়েই সাহাবীরা

www.pathagar.com

তাদের উষ্ণ রক্তস্রোত বইয়ে দিয়েছে কত-যে অসংখ্য রণক্ষেত্রে, তাদের তরবারি থেকে বিকীর্ণ বিদ্যুতাভা ও তাদের অশ্বক্ষুরধ্বনি কত-যে রাজা সম্রাটদের বক্ষে তুলে দিয়েছে হৃৎকম্প, কত জালিমের চোখের নিদ্রা-যে হারাম হয়ে গেছে চিরতরে, তার ইয়ত্তা নেই। এবং এই অমিত উত্তরাধিকার নিয়েই পৃথিবীবক্ষে অবতরণ করেছে সালাহদীন আইয়ুবী, নূরুদ্দিন জঙ্গী, তারিক, মুহম্মদ বিন কাসিম মাহমুদ গজনভী, জওহর দুদায়েভ ওসামা বিন লাদিন মোল্লা উমার প্রমুখ তাওহিদী সিপাহসালার। এরা সবাই রাসূল (সাঃ) এর রেখে-যাওয়া সংগ্রামী ঐতিহ্যের এক-একটি আল্লাহর তরবারি। অথচ কী দুর্ভাগ্য আমাদের, রাসূল (সাঃ)কে কিছুই না-বুঝে আমরা আমাদের পর্বতপ্রমাণ ভুল ও শৈথিল্য ও ভীরুতার মধ্যে আজ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছি। যিনি ছিলেন জালিমদের বুকে ত্রাস, তাঁরই উম্মত হয়ে আজ আমরা সারা পৃথিবীর করুণাকামী পরিহাসের পাত্র। এই জিল্লতীর অবসানকল্পে মা-রেফাত হকীকত ও ফানাফিল্লাহর সবক আপাতত স্থগিত রেখে, বিশ্বব্যাপী সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের অবশ্যকর্তব্য হলো রাসূল (সাঃ)এর জিহাদী-জিন্দিগী থেকে শিক্ষা ও শক্তি ও প্রেরণা সংগ্রহ করা। আসলে সমস্যা হলো রাসূল (সাঃ)কে আমরা সঠিকভাবে চিনতেই পারলাম না। আল্লাহর রাসূল মানববংশের জন্য সর্বদিকে সর্বক্ষেত্রেই চূড়ান্ত আদর্শ। এইজন্য যে-কোন দিক থেকেই দেখি-না কেন, তাঁর নক্ষত্রচুম্বী মহিমান্বিত রূপ আমাদেরকে অভিভূত করবেই। কিন্তু তাঁকে যদি তাঁর সম্পূর্ণ রূপ ও অবয়বে আমরা আমাদের সাধ্যমত অবলোকনের চেষ্টা করি, আমরা দেখবো, ইসলামের প্রশ্নে, শিরকের মোকাবিলায় তাওহীদের প্রশ্নে, আল্লাহর একক অখন্ড প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে, জিহাদই হলো রাসূল (সাঃ)এর শিরোভূষন। তাঁর পুরো জিন্দিগীর যে-ঐকসঙ্গীত, জিহাদ হলো তার বাদীস্বর, অন্য যা-কিছু, সবই মূল সঙ্গীতের সঙ্গে সংলগ্ন সমবাদী।

ওহোদের যুদ্ধ চলছে, খুবই সংকটময় পরিস্থিতি। সাহাবী হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস শত্রুসৈন্যকে লক্ষ করে তীর নিক্ষেপ করে চলেছেন। রাসূল (সাঃ) পাশে থেকে বললেন, 'তোমার উপর আমার পিতামাতা কোরবান হোন'। তীরন্দাজ হযরত সাদের একক সৌভাগ্য, এই কথা রাসূল (সাঃ) আর কখনো কাউকে বলেন-নি। হযরত যোবায়ের (রাঃ) বদরের যুদ্ধে সর্বাঙ্গে বর্মপরিহিত একজন মুশরিক সৈন্য ওবাইদার চোখ লক্ষ করে নেজা ছুঁড়ে মেরেছিলেন। নিক্ষিপ্ত নেজাটি লক্ষ্যভেদ করে মস্তকের পশ্চাদ্দিক দিয়ে বের হয়ে পড়ে। অস্ত্রটি কাফেরের মাথা থেকে সজোরে টেনে বের করার সময় বাঁকা হয়ে যায়। এই অস্ত্রটি রাসূল (সাঃ) হজরত যোবায়েরের নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে সারা জীবন পরম যত্নে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন। কিন্তু এমন নজীর নেই যে, রাসূল (সাঃ) কখনো কারো আভূমিলম্বিত আলখাল্লা বা কারো জায়নামাজের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। রাসূল(সাঃ) বলতেন, 'আমার ইচ্ছা হয়, জিহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণ করি, আবার জীবিত হয়ে আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই আবার শহীদ হই'

www.pathagar.com

কিন্তু কখনো কি বলেছেন যে, তাঁর ইচ্ছা হয় নামাজে সেজদারত বা পবিত্র রমজানে রোজাদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে। না, বলেন নি। এইসব টুকরো ঘটনা ও কথা থেকেই বুঝা যায়, শয়নে স্বপনে তিনি ছিলেন একজন সার্বক্ষণিক মুজাহিদ; যিনি পরিষ্কার ভাষায় এই কথা এরশাদ করেছেন যে, জান্নাতের অবস্থান হলো তরবারির ছায়াতলে। আল্লাহপাকও এই কথাই বলেন, 'ফাকাতিলু আউলিয়াশ শায়তান' শয়তানের যারা সুহৃদ তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করো (সূরা নিছা)।

এবং এখানেই মুমেন ও কাফেরের প্রকৃত পরিচয় নিহিত; অর্থাৎ লড়াইয়ের পক্ষ প্রতিপক্ষ দেখেই বুঝা যায়, কে মুমেন আর কে কাফের। কারণ 'আল্লাজীনা আমানু ইউকাতিলুনা ফিসাবিলিল্লাহ, ওয়াল্লাজীনা কাফারু ইউকাতিলুনা ফিসাবিলিত্বাগুত' মুমেন লড়াই করে আল্লাহর পথে, অন্যদিকে কাফেরের লড়াই হলো শয়তানের সমর্থনে (সূরা নিসা)। বলাই বাহুল্য, রাসূল (সাঃ) অপেক্ষা বড় কোন মুমেনও নেই, বড় কোন মুজাহিদও নেই।

www.pathagar.com

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সাঃ)-এর অবদান

আশা করি এ-বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে, রাসূল (সাঃ) নিজে কোন ধর্মপ্রবর্তক নন; তাঁর আনীত দ্বীন ও ধর্ম একান্তভাবেই আল্লাহর। পৃথিবীকে শান্তি ও ইনসাফের পৃথিবীরূপে গড়ে তুলতে যে-নির্ভুল সাংবিধানিক পথনির্দেশ, তার একটি বাক্যও রাসূল (সাঃ)এর নিজস্ব নয়। আদ্যোপান্ত সবই আল্লাহ্পাক কর্তৃক প্রণীত ও প্রেরিত। তাঁর নিজস্ব কিছু নয়, তিনি শুধু আল্লাহপাক কর্তৃক মনোনীত বিশ্বস্ত বার্তাবহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সহজ কথাটি বুঝতে ভুল হয় বলেই আরো অনেক ভুল আমাদের বিশ্বাস ও কার্যক্রমকে মারাত্মকভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

উদাহরণস্বরূপ, বহু পাশ্চাত্যনিবাসী প্রাচ্যবিদ রাসূল (সাঃ)এর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আল কোরআনের প্রণেতা হিসাবে ধরে নিয়ে একটা বিরাট ভুল করে বসে। আর এই ধারণার বশবর্তী হওয়ার কারণেই, তারা মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অবদানকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করে সত্য, কিন্তু ইসলামকে বুঝতে পারে না। ইসলাম তাদের কাছে অধরাই থেকে যায়; শান্তির সুপ্রশস্ত রাজপথে দাঁড়াবার সৌভাগ্য ঘটে না। দ্বিতীয়ত, অমুসলিম বিশ্বের একটা বড় ভ্রান্তি হলো, তারা মুসলমানকে দেখে ইসলামকে বুঝতে চায়। অর্থাৎ আল কোরআনের পথনির্দেশ ও রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শকে সম্মুখে না-রেখে, মুসলমানদের গুণাগুণ, আপাত দৃশ্যমান ত্রুটি ও দুর্বলতা ও পশ্চাৎপদ অবস্থাকে ইসলামের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছে; যে-কারণে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্যকে তারা অবলোকন করতে পারছে না। অথচ খুব যৌক্তিক কারণেই এই অক্ষমতা অনভিপ্রেত। কারণ, চিকিৎসকের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য খারাপ হলেও হতে পারে, কিন্তু সেই হেতু চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অস্বীকারকরত ডাক্তার-প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রকে অবজ্ঞা করা মূর্খতা। বর্তমান মুসলিম মিল্লাতের অবস্থা যাই হোক, আল কোরআনের ও রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের যে-উজ্জ্বল উত্তরাধিকার, পৃথিবী যদি সেই দিকে সমনস্ক অনুরাগ নিয়ে পার্থিব ব্যবস্থাপনাকে পুনর্বিন্যস্ত করতে পারে, সকল রোগ নির্মূল হতে বাধ্য এবং পৃথিবী জুড়ে শান্তি নেমে আসতেও বাধ্য। কারণ আল্লাহর নির্দেশিত পথই-যে একমাত্র শান্তির পথ, এটা পরীক্ষিত।

অনেক আগের কথা, আল্লাহ্পাক যখন মানবসৃষ্টির অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন, ফেরেশতারা বলেছিলেন, তারা পৃথিবীতে অশান্তি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। আল্লাহপাক বললেন, 'আমি যা-জানি, তোমরা জানো না'। অর্থাৎ ফেরেশতাদের আশঙ্কার মধ্যে বাস্তবতা কিছু ছিল, কিন্তু আল্লাহ্পাক জানতেন, নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সকল অশান্তির অব্যর্থ প্রতিষেধক হিসাবে তিনি যে-হেদায়েত প্রেরণ করবেন, সেই হেদায়াতেই হবে বিশ্বশান্তির গ্যারান্টি, সকল অশান্তি ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অব্যর্থ

www.pathagar.com

রক্ষাকবচ। এবং বলাই বাহুল্য, এই চূড়ান্ত রক্ষাকবচই হলো আলকোরআন ও আল কোরআনের হুবহু বাস্তব প্রতিবিম্ব রাসূল (সাঃ)এর জীবনাদর্শ। এই দু'টি বস্তু যদি হয় মানবগোষ্ঠীর একমাত্র পথ ও পাথেয়, সকল অশান্তি, সকল দুঃখ ও দুর্ভাবনা পৃথিবী থেকে নিঃশেষে অন্তর্হিত হবেই। এটা কোনো অনুমান কি কল্পনা নয়; এটা আল্লাহ্পাকের ওয়াদা, এটা সর্বতোভাবে পরীক্ষিত একটি বিজ্ঞান।

আল্লাহ্পাক প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ ও সংবিধানসহ রাসূল (সাঃ)কে প্রেরণই করেছেন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁর জীবন ও জীবনাদর্শের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার একমাত্র চাবিকাঠি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন বিকল্পই নেই এবং এইজন্য তিনিই কেবল 'রাহমাতুল্লিল আলামীন'। অতএব তাঁকে পরিহার কি অস্বীকার করে, কোরআনুল কারীমের শিক্ষা ও নির্দেশকে উপেক্ষা করে, এই পৃথিবী সুখের-পৃথিবী হবে এটা অসম্ভব ও অভাবনীয়। কিন্তু কী সমূহ বদনসীব এই পৃথিবীর, শান্তির অন্বেষণে শুধু অসম্ভবের পশ্চাদ্ধাবনই তার প্রিয়তম কর্মসূচী। ফলত, যা-হবার তাই-ই হলো। পুরো পৃথিবী পরিণত হলো এক নির্ভুল নিরঙ্কুশ জাহান্নামে। আল্লাহপাক বলেন, 'রাসূল (সাঃ) যা প্রদান করেন, তোমরা গ্রহণ করো। যা থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলেন, তা বর্জন করো' (সূরা-হাশর); অর্থাৎ রাসূল (সাঃ)কে নিঃশর্তভাবে মান্য করার মধ্যেই মানবসমাজের কামিয়াবি। অথচ কী দুর্ভাগ্য এই মানবজাতির, বিশেষ করে এই আধুনিক পৃথিবীর, সে তার সকল চেষ্টা-শ্রম ও অধ্যবসায় সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় রেখেছে রাসূল (সাঃ)-এর সকল আদেশ ও নিষেধের বিপরীত মেরুতে। অথচ রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য মানে আল্লাহরই আনুগত্য। অতএব আল্লাহ যদি তাঁর এই অবাধ্য, আনুগত্যহীন বিদ্রোহী বান্দাহদের বেপরোয়া অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিদানস্বরূপ এই পৃথিবীকে একটী অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে দেন, সেটাই আধুনিক মানুষের উপযুক্ত প্রাপ্য।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় যেহেতু 'বিশ্বশান্তি ও রাসূল (সাঃ)-এর অবদান', আমার মনে হয়, আমাদের পর্যবেক্ষণ ও তৎসন্নিহিত আলোচনা যথাসম্ভব একটু বিশদভাবেই পেশ করা প্রয়োজন। আধুনিক বিশ্বের যে-দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহ, যা মূলত সকল অশান্তির কারণ, তার নিরাময়কল্পে রাসূল (সাঃ)এর জীবনাদর্শ ও শিক্ষার নিঃশর্ত আনুগত্য ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ-যে সত্যই নেই, সংক্ষেপে হলেও তার একটি তুলনামূলক আলোচনা বিশেষ জরুরি। প্রথমে যীশুখ্রীষ্টের কথাই বলি। কোনো সন্দেহ নেই, তিনি (হজরত ঈসা-আঃ) একজন বিশিষ্ট নবী ছিলেন। কিন্তু যেভাবেই হোক, তাঁর বাণীসমূহ শুধু বিকৃত হয়নি, প্রায় শতভাগই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এবং এই দুর্ভাগ্যজনক কাজটি সংঘটিত হয়েছে যীশুখ্রীষ্টের বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা যে-বাণীসমূহকে বাইবেল বা 'ইঞ্জিল শরীফ' বলে গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টের

www.pathagar.com

কোনো সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। সেটা আসলে সেন্ট পল ও তৎপরবর্তী কিছু লেখকের মনগড়া New Testament. উপরন্তু এটাও সত্য যে, হজরত ঈসা (আঃ)কে আল্লাহ্‌পাক পাঠিয়েছিলেন প্রধানত তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আসন্ন আবির্ভাবের সুসংবাদদাতারূপে। স্বল্পকালীন নবুয়তী জিন্দিগীতে এটাই ছিল তাঁর কাজ। অতএব বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর সরাসরি ভূমিকা ও অবদান খুব বেশি নয় এবং ইতিহাসও এই কথাই বলে। যাই হোক, New Testament যেমন মনগড়া, ইহুদিদের হাতে হজরত মূসা (আঃ)-এর তাওরাত এরও (Old Testament) হুবহু একই দশা হয়েছে। অতএব ইহুদি-খ্রীষ্টানেরা যাই বলুক, হজরত মূসা (আঃ) কি হজরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে আল্লাহ প্রেরিত যে-মানবশান্তির দিকদর্শন, তার প্রকৃত কোনো রূপরেখা আজ আর অবশিষ্ট নেই। বরং বিকৃতির কারণে এমন এক ভয়াবহ 'সুসমাচার' তৈরী হয়েছে ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, যা-থেকে শান্তি তো দূরের কথা, পুরো খ্রীষ্টানজগৎ পাপ ও অপরাধ, অশ্লীলতা ও বন্যতার আজ এক মনোরম অভয়ারণ্যে পরিণত। এবং এই বিষয়টি এত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট যে, দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য পশ্চিমাজগৎ এখন ধর্মকে ধর্মের মতো এবং পৃথিবীকে পৃথিবীর মতো চলবার এক ধর্মাধর্মহীন নিরপেক্ষ ব্যবস্থা চালু করতে বাধ্য হয়েছে। 'ওল্ড' হোক আর 'নিউ' হোক, কোনো টেস্টামেন্টেই যেহেতু কোনো সমস্যারই কোনো বাস্তবানুগ সমাধান নেই, পাদ্‌রি পাদ্‌রির মতো চলে, রাজা রাজার মতো । বড় সুন্দর এক ইবলিসী-সহাবস্থান! পশ্চিমাদের এই দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত ব্যবস্থাই আমাদের অনেক নামকরা বুদ্ধিজীবীদের সার্বক্ষণিক তপস্যা ও একান্ত-কাঙ্ক্ষিত ধর্মনিরপেক্ষতা।

বৌদ্ধধর্মের জনক সিদ্ধার্থের আন্তরিকতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি নবী ছিলেন না এবং তিনি তা কখনো দাবীও করেন নি। অর্থাৎ তাঁর কাছে কোনো Divine Message ছিল না। এক ডুমুর গাছের ছায়ায়, যাকে 'বোধিবৃক্ষ' বলে অভিহিত করা হয়, দীর্ঘ একাগ্র ধ্যানমগ্নতার মধ্য দিয়ে সিদ্ধার্থ একটি মানবমুক্তির সত্য আবিষ্কার করলেন। 'সত্য'টি কতখানি সত্য সে অন্য কথা, তবে বৌদ্ধধর্মের পরিভাষায় একে বলে 'নির্বাণ', যা 'অষ্টমার্গ' অর্থাৎ আটটি সদাচারের অনুশীলন থেকে মানুষ শান্তি ও মুক্তিলাভ করতে পারে। কিন্তু এই 'আলোকপ্রাপ্ত' প্রজ্ঞাঋদ্ধ বুদ্ধকে নিয়ে এই প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া যায়-না যে, তাঁর ব্যবস্থাপত্র যদিও অত্যন্ত মূল্যবান ও সদ্‌ভাবনাসমৃদ্ধ, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি পুরোপুরিই অন্তর্মুখী। অর্থাৎ আত্মমুক্তি বা মোহমুক্তি একটি বিষয় বটে, কিন্তু কর্মচঞ্চল অতিবাস্তব যে-বিস্তৃত বহির্জগতের স্তরে স্তরে-অশান্তি ও হাহাকার প্রতি মুহূর্তে মানবসমাজকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করে রাখছে, সেই দিকটি গৌতমবুদ্ধের আদৌ নজরে আসে নি। এবং এই না-আসার কারণেই আমরা আজ যখন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে অস্থির ও দিশাহীন, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা সেখানে খুব গৌণ।

www.pathagar.com

মহাবীর প্রণীত ও প্রচারিত জৈন ধর্মের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। অহিংসা, অস্বাভাবিক শারীরিক কৃচ্ছ্রতা, যে-কোনো ধরনের জীবহত্যাকে মহাপাপজ্ঞান, জন্মান্তর-বিশ্বাস মোটামুটি এইসবই হলো সতত-উলঙ্গ মহাবীর প্রবর্তিত জৈন ধর্মের মূল বক্তব্য। এই ধর্মের কিছু আধ্যাত্মিক মূল্য ও প্রভাব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যেহেতু একেবারেই বাস্ত বতানিরপেক্ষ, যেহেতু পৃথিবীর বহুমাত্রিক সমস্যার প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় এই জৈনধর্মের মধ্যে কোনরূপ ঝুঁকি গ্রহণের তাগিদ ও তৎপরতা নেই। প্রাচীন ইরানে খ্রীষ্টপূর্বকালে জরথ্রুস্ট নামে একজন ধর্মপ্রবর্তকের আবির্ভাব ঘটে। দিনে দিনে একসময় তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতের যথেষ্ট প্রসারও ঘটে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই জরথ্রুস্টীয় ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত। অতএব আধুনিক পৃথিবীর যে-সমস্যা ও সংকট, সেই প্রেক্ষিতে এই ধর্মের কার্যকারিতা নিয়ে যে-কোনোরূপ আলোচনা এক রকম নিরর্থক।

বর্তমান বিশ্বে একটি অতিশয় উল্লেখযোগ্য ধর্ম হলো সনাতন হিন্দু ধর্ম। এই ধর্মাশ্রিত লোকসংখ্যাও বিপুল; তাদের ধর্মানুরাগও প্রবল। কিন্তু সমস্যা হলো, ধর্মগ্রন্থ গীতায় কি বেদ-উপনিষদে যাই থাক, এই ধর্ম প্রায় আদি থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদী রক্ষণশীলতার দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে এমন এক চতুর্বর্ণীয় অমানবিক সমস্যার সৃষ্টি করে রেখেছে, যা মানবতার অপমান ও সমাজদেহের একটি স্থায়ী ক্ষত হিসাবে বিবেচনার যোগ্য। এই ধর্মেও অনেক নৈতিক শিক্ষা ও মানবকল্যাণের কথা আছে। কিন্তু অপরিহার্য পৌত্তলিকতা, উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণদের নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যরক্ষায় নানা ধরনের ধর্মীয় অনুজ্ঞার কারণে, হিন্দুধর্মকে গুরুতরভাবে উগ্র ও অসহিষ্ণু, বৈষম্যলাঞ্ছিত ও সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করতে হয়েছে। এইজন্যই এই ধর্মে শান্তির উপাদান যতটা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে নিরন্তরভাবে অপমানিত মানবাত্মার ক্রন্দন।

একটি দৃষ্টান্ত পেশ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। পুত্র রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন-অনুষ্ঠানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের এক আমন্ত্রিত কিশোর সহপাঠীকে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণ হওয়ার 'অপরাধে' অনুষ্ঠান থেকে নিষ্ঠুরভাবে বহিষ্কার করেছিলেন। অথচ তিনি মহর্ষি। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রবীন্দ্রনাথও করেছিলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়নের পর রথীনকে তিনি একাদিক্রমে তিন দিন গৃহে অন্তরীণ রেখেছিলেন শুধু এইজন্য যে, কোনো নিম্নবর্ণীয় হিন্দুর সঙ্গে যেন 'অশুভ' দৃষ্টিবিনিময় না-ঘটে। অথচ তিনি বিশ্বপ্রেমের বিশ্বকবি। বস্তুত, এটা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অপরাধ নয়, তাঁরা আসলে অনতিক্রম্য ধর্মীয় সংস্কারের উর্ধে উঠতে ব্যর্থ হয়েছেন; এবং এই ব্যর্থতা উচ্চবর্ণের কাছে উপভোগ্য হলেও, নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের কাছে তা-এতই অন্ত র্দাহী ও ভেতরে ভেতরে রক্তস্রাবী যে, কষ্টে-দুঃখে-অপমানে আম্বেদকর তাঁর তিন লক্ষাধিক অনুসারী নিয়ে বৌদ্ধধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ 'সনাতন' বটে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দ্বান্দ্বিক সমস্যায় হিন্দুধর্মের নিজস্ব অস্তিত্বই মাঝে মাঝে বিপন্ন হবার উপক্রম

www.pathagar.com

ঘটেছে; যে-কারণে বিশ্বশান্তি, বিশ্বমানবতা অনেক পরের কথা, নিতান্ত আত্মরক্ষার্থেই বাধ্য হয়ে আবির্ভাব ঘটেছে সমন্বয়বাদী শ্রীচৈতন্য বা শঙ্করাচার্যের, উদ্ভব ঘটেছে ব্রাহ্মধর্মের।

যাই হোক, মোটামুটি এই হলো সর্বমানবিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় আধুনিক বিশ্বে অনুসৃত ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রধান ধর্মসমূহের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা জরুরি যে, পৃথিবী আজ ইসলামের মোকাবিলায় ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি বড় আশ্রয় ও অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছে। তার একমাত্র কারণ, যে-সকল সমস্যা নিয়ে আধুনিক পৃথিবী আজ বিপর্যস্ত, তার কোনো একটিরও সমাধান কোনো ধর্মে নেই। ইসলামই একমাত্র দ্বীন, যেখানে সকল জীবন সমস্যার সর্বোত্তম তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সমাধান বিরাজ করছে। এবং এইজন্যই ইসলামের প্রায়োগিক সাফল্য থেকে পৃথিবীকে মাহরুম রাখার একটি মোক্ষম কৌশল হিসাবে ইবলিস তার বিশ্বস্ত অনুচরদের কাছে যে-এক নতুন মন্ত্র তুলে দিয়েছে, তারই নাম 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। পুরো পৃথিবীর জন্যই এ-এক মহাপাপের ছাড়পত্র। মুসলমান যদি এই ফাঁদে পা দেয়, অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ। কারণ মুসলিম উম্মাহ ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো পরিচয় বা উত্তরাধিকার বহন করে না; তার একমাত্র উত্তরাধিকার, পৃথিবীর যাবতীয় দ্বীন ও বিশ্বাসের মোকাবিলায় বিজয়লাভের নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত আল্লাহপাকের মনোনীত একমাত্র দ্বীন, ইসলাম। এবং রাসূল (সাঃ)এর কাছে চূড়ান্তভাবে অবতীর্ণ এই অবিনশ্বর ইসলামই হলো বিশ্বশান্তির একমাত্র গ্যারান্টি; সুখ ও স্বপ্নময় ও ব্যাধিমুক্ত পৃথিবীর একমাত্র রূপরেখা।

আলোচনার পরিসর বৃদ্ধি না-করে, এবার আমরা দেখতে চাই, বিশ্বমানবিক শান্তি -প্রতিষ্ঠায় রাসুল (সাঃ)-এর ভূমিকা ও অবদান কী এবং কতখানি। পুনরায় উল্লেখ করি, তাঁর যে-প্রদর্শিত পথ সেটা তাঁর নিজের নয়, সেটা সম্পূর্ণত আল্লাহপ্রেরিত পথনির্দেশ। তাঁর তেইশ বছরের সংগ্রামী জিন্দিগী, তাঁর পেশকৃত জীবনাদর্শ, সবই আল্লাহ্‌র এই পথনির্দেশেরই যথাযথ প্রতিবিম্ব। আবারও উল্লেখ করি, মোহাম্মদ (সাঃ) এই ধরাপৃষ্ঠে প্রেরিতই হয়েছিলেন শয়তানের সকল কুহক ও প্ররোচনামুক্ত এক সর্বমানবিক শান্তি ও নিরাপত্তা ও ইনসাফের পৃথিবী নির্মাণের জিহাদী-রূপকার হিসাবে। তাঁর প্রকৃত কাজই হলো শান্তিপ্রতিষ্ঠা, যে কারণে আল্লাহপাক নিজেই তাঁকে বলেছেন 'রাহমাতাল্‌লিল আলামীন' নিখিল বিশ্বের আশীর্বাদ ও রহমত।

রাসুল (সাঃ) পৃথিবীতে এসেই দেখলেন, এখানে অনেক কিছু আছে, শুধু শান্তি নেই সখ্য নেই ভালোবাসা নেই। সর্বত্র শুধু অসত্য অনাচার দ্বন্দ্ব বৈরিতা হানাহানি স্বার্থপরতা ও মানবতার অপমান, এইসব নিয়ে এক নিবিড় নিশ্ছিদ্র জাহেলিয়াত। জীবনের শুরু থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি এই-রকমই দেখলেন, কিন্তু দেখলেন এক অসহায় দর্শকের মতো। এবং এই দীর্ঘ সময়ে সর্বমানবিক মুক্তির কোনো দিশাই তিনি

www.pathagar.com

খুঁজে পেলেন না। তারপর আল্লাহপাকের নিকট থেকে তাঁর কাছে একটু একটু করে মানবমুক্তির পথরেখা উন্মোচিত হতে লাগলো, তিনিও একটু একটু করে অগ্রসর হলেন। এবং তেইশ বছরের নাতিদীর্ঘ নবুয়তি-জিন্দিগীর একাগ্র পথ-পরিক্রমায় তিনি পৃথিবীকে উপহার দিয়ে গেলেন আল্লাহপাকের প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত, পৃথিবীর জন্য এক অনন্য শাশ্বত নির্ভুল পথরেখা।

আগেই বলে রাখি, অশান্তি-তো শুধু-শুধুই সৃষ্টি হয় না, ভুল এবং অজ্ঞতার কারণেই হয়। এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন থেকে সমাজদেহের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক পর্যন্ত যে-বিস্তৃত সমস্যাসংকুল মানবজীবন, তার পরতে পরতে অনেক ভুল অনেক অজ্ঞতা পুঞ্জিভূত হয়ে আছে বলেই, পৃথিবীময় আজ এই অশান্তি, আজ এই ঘন অন্ধকার জাহেলিয়াত।

কিন্তু আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহ, তাঁর প্রেরিত পয়গামকে সামনে রেখে রাসুল (সাঃ) মানুষের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল ব্যর্থতা ও অশান্তির এমন সহজ ও সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধান মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিলেন, যা অনুসরণ করলে কোথাও কোনো অশান্তির লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। দাম্পত্যজীবনের মান-অভিমান ও পুত্রকন্যার আদর-আবদার থেকে শুরু করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ পর্যন্ত সবকিছু এক অনাবিল শান্তির মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে বাধ্য। এবং এটা কোনো অপরীক্ষিত তত্ত্বীয় হাইপোথেসিস নয়, কোনো কষ্টসংকুল উপপাদ্য নয়, এটা বিশ্বসমক্ষে সর্বতোভাবে প্রমাণিত ও উপস্থাপিত একটি সহজ প্রায়োগিক সম্পাদ্য। অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। খোলাফায়ে রাশেদার সময়কালই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

যাই হোক, রাসুল (সাঃ) এসেই যে-অশান্তি-পরিকীর্ণ আইয়ামে জাহেলিয়াতকে প্রত্যক্ষ করলেন, তার নিরাময়ের উপায় কী? বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এক বিশাল কার্যক্রম, কিন্তু তার প্রথম সবক্টি কী, যা বিশ্বকে ধীরে ধীরে তার প্রতীক্ষিত শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে? আল্লাহপাকের সুস্পষ্ট প্রত্যাদেশ থেকে তিনি অনুধাবন করলেন, তাওহীদ রেসালাত ও আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই হলো সেই প্রথম-পাঠ, যা সর্বান্তঃকরণে আত্মস্থ করলে অন্য যা কিছু শান্তি ও মানববিধ্বংসী এক-একটি প্রবল উপসর্গ, তার বিদায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অবধারিত। অতএব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের প্রথম কথাটিই হলো, পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রীতিভাজন প্রতিনিধি মাত্র, একক অখণ্ড অবিভাজ্য সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

দ্বিতীয় কথাটি হলো রেসালাত। অর্থাৎ মানুষ যেহেতু খুব যৌক্তিকভাবেই একেবারে স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন এবং অদূর-অপরিণামদর্শী, আল্লাহপাকের নির্দেশিত হেদায়াতই মানুষের জন্য চূড়ান্ত কল্যাণের পথরেখা। আর এই নির্ভুল দিকনির্দেশনা দিয়েই আল্লাহপাক তাঁকে সর্বশেষ নবী ও রাসুলরূপে পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতি এই

www.pathagar.com

বিশ্বাসটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সমানভাবে অবশ্যমান্য। এবং সর্বশেষ তৃতীয় কথাটি হলো, মহাবিশ্বের মহান প্রতিপালক আল্লাহর কাছে নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন, তাঁর সুমহান দরবারে পার্থিব এই নশ্বর জীবনের অপরিহার্য জবাবদিহিতা এবং অনন্তদিনের জন্য জান্নাত-জাহান্নামের অবশ্যম্ভাবী ফয়সালা।

এই তিনটি পরস্পর-সন্নিবিষ্ট বিশ্বাস, তাওহিদ রেসালাত ও আখেরাত, যদি একীভূত হয়ে অন্তরে দৃঢ়তা লাভ করে, কোনো সন্দেহ নেই, জীবন ও সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দৃশ্যমান সকল অশান্তির আবিলতা এমনিতেই অতিদ্রুত ও প্রায় অক্লেশে অপসারিত হয়। এইজন্যই ইসলামে ঈমানের এত মূল্য ও এত অপরিহার্যতা! এবং এইজন্যই বিশ্বব্যাপী মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাসুল (সাঃ) প্রথম যে-পাঠ দান করলেন, তা হলো তাওহিদ ও রেসালাত ও আখেরাতের-জবাবদিহিতা। বিশ্বশান্তি বিশ্বমানবতার এটাই মূল ভিত্তি। পৃথিবী-যে আজ এত বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জনের পরেও এক দুঃখী দুর্দশাগ্রস্ত আগ্নেয় জাহান্নামে পরিণত হয়ে গেল, তার একটিইমাত্র কারণ, পৃথিবীর অন্তর্দেশে উপরোক্ত তিনটি বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই। যেটুকু যা-আছে তা এতই দুর্বল, যা প্রায় না-থাকারই সমতুল্য।

রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে আমরা অনেক কথা বলি, তাঁর জীবনাদর্শ থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আঁকড়ে ধরবার চেষ্টাও করি, কিন্তু কোনোকিছু থেকেই কোনো ইতিবাচক ফললাভ সম্ভব হচ্ছে না। পৃথিবী বরং ক্রমশ নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেই অপ্রতিহতভাবে ধাবিত হচ্ছে। এর কারণ এই নয় যে, রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি পৃথিবীর কোনো মুহাব্বত নেই, সশ্রদ্ধ আস্থা ও বিশ্বাস নেই। আছে, মুসলমানদের-তো আছেই, এমনকি যারা মুসলমান নয়, তাদেরও আছে। কিন্তু রাসুল (সাঃ)-এর মূল যে-শিক্ষা, সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু মুহাব্বত নিয়ে দিন গুজরান করলে প্রকৃত কাজের কাজ-কি কিছু হয় অথবা হওয়া সম্ভব? মনে রাখা দরকার, রাসুল (সাঃ) এসেছিলেন, বলা উচিত প্রেরিত হয়েছিলেন, ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বপ্রকার শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত একটি তাওহিদী পৃথিবী রচনার দায়িত্ব নিয়ে। এবং এই তাওহিদই হলো পৃথিবীময় শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। কোরআনুল কারীমে আল্লাহপাক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, 'মুশরিকরা হলো নাপাক' এবং তারা 'জগতের নিকৃষ্টতম সৃষ্টি' এবং তারা এত নিকৃষ্ট যে, পিতামাতা আত্মীয় পরিজন হলেও 'তাদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ' (সুরা তাওবা, সুরা বায়িনাহ, সুরা তাওবা)। সুতরাং এই নাপাক নিকৃষ্ট অংশীবাদ যদি পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে থাকে, তাহলে সেই পৃথিবী শান্তির পৃথিবী হবে, এটা দুরাশা। কারণ কোনো মৌলিক জিনিষই আল্লাহপাক মানুষের এখতিয়ারভুক্ত রাখেন নি। শান্তি যেহেতু একটি মৌলিক জিনিস, এটা আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ থেকে নেমে আসে। অতএব আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য সবচেয়ে অপবিত্র যে-বস্তু শির্‌ক, সেই শির্‌কে আচ্ছাদিত

www.pathagar.com

পৃথিবীতে রহমত আসার-তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র লানত বর্ষিত হবে, এবং সেটাই স্বাভাবিক।

অতএব রাসুল (সাঃ)এর প্রথম শিক্ষাই হলো, শান্তি ও কল্যাণের স্বার্থে অংশীবাদ ও পৌত্তলিকতাকে সর্বাগ্রে বর্জনকরত জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বকে মেনে নেয়া। অন্যথায় যতভাবেই চেষ্টা করা যাক, পৃথিবীকে শয়তানের আধিপত্যমুক্ত করাও সম্ভব হবে না, শান্তিও আসবে না। কারণ এটাই-তো সাধারণ যুক্তির কথা, যে-মানুষ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি 'আশরাফুল মাখলুকাত', যে-মানুষ 'খলীফাতুল আরদ্' অর্থাৎ বিশ্বব্যবস্থায় আল্লাহর প্রতিনিধি, সে যদি স্বেচ্ছায় বা অজ্ঞতায় তার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে লাত-উজ্জার মতো প্রাণহীন দেবদেবীকে, মাজার কবর পীর পুরোহিতকে অথবা অপর কোনো আপাত ক্ষমতাবান মানবশক্তিকে পূজ্যপাদ ও প্রণম্য জ্ঞান করে, তাহলে বুঝতে হবে মানুষ নিজেই তার নিজের উচ্চাসনকে উন্মাদের মত অতল গহবরে নামিয়ে এনেছে। এই ধরনের আত্মমর্যাদাহীন তাওহিদী-প্রেরণাশূন্য মানুষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আরামের জীবন যাপন করতে পারে, কিন্তু তার নৈতিক অবস্থান চতুষ্পদ বন্যজন্তুর থেকেও অনেক নিম্নে।

অতএব, ভূপৃষ্ঠ থেকে উর্ধাকাশ পর্যন্ত যা-কিছু আছে সবই-যে মানুষের অধীন (সুরা জাছিয়া), একমাত্র আল্লাহ ছাড়া মানুষের-যে কোনো অর্থেই কোনো দ্বিতীয় উপাস্য নাই, এই তাওহিদী-চেতনা ছাড়া মানুষের আদৌ আত্মমুক্তি ঘটে না, বিশ্বমানবতার মুক্তি তো অনেক পরের ব্যাপার। অতএব অংশীবাদ, যার কারণে মানুষ নীচে নামতে নামতে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়, যখন সে আর মানুষই থাকে না, হয়ে পড়ে হীনতম দীনতম ও নিম্নতম-জগতের এক পশ্বাধম, পবিত্র কোরআনের ভাষায় 'আসফালা সাফিলীন'। শান্তি-প্রত্যাশী যে-কোনো মানুষ স্বীকার করবেন যে, এর একটি যথাবিহিত অবসান হওয়া অত্যন্ত জরুরি। জরুরি এইজন্য যে, এই পশ্বাধম মানুষের হাতে সারা পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য তুলে দিলেও কোনো লাভ নেই, কারণ ক্ষুদ্রতা ও নীচতা ও নির্বিবেক-স্বার্থপরতা দ্বারা গঠিত এই বিশাল পশুসম্পদ আসলে দৃশ্যতই মানুষ। প্রকৃতপক্ষে তাওহিদী চেতনারিক্ত এই পশুসদৃশ মানুষগুলি সর্বব্যাপী অশান্তি সৃষ্টিরই উৎপাদক যন্ত্রবিশেষ। আল্লাহপাকের নির্দেশানুসারে রাসুল (সাঃ) সর্বপ্রথম এই জায়গাটিতেই ঔষধ প্রয়োগ করলেন, সবাইকে আহবান জানালেন এই অব্যর্থ কালেমার দিকে : *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'*। যাঁরা সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আনুগত্য নিয়ে এই পবিত্র কালেমার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তাঁরা শুধু নিজেরাই লাভবান হলেন না, সমগ্র বিশ্বের সামনে তাঁরাই প্রবাহিত করে দিলেন সর্বমানবিক শান্তি ও নিরাপত্তার এক অমল সুবাতাস। এটাই বিশ্বশান্তির প্রথম পাঠ, যা আল্লাহর অনুগ্রহধন্য সওগাত হিসাবে পৃথিবীকে উপহার দিলেন রাসুল (সাঃ)।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, রেসালাতের প্রতি নিখাদ বিশ্বাস। মানবমুক্তি ও বিশ্বশান্তির জন্য এটা অপরিহার্য। 'বিশ্বাসের জন্যই বিশ্বাস' এ-রকম নয়, এটা সমস্ত সংশয় ও সন্দেহ থেকে মুক্ত একটি নিখাদ সত্য বলেই নিঃশর্তভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, রাসূল (সাঃ) আনীত ও উপস্থাপিত যে-পথনির্দেশনা, সেটাই শান্তি ও বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ। সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতে হবে, দ্বিতীয় আর কোনো পথ নেই। আর এই পথ যেহেতু তাঁর নিজস্ব কোনো রচনা নয়, স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত পথরেখা, এই নির্দেশনার মধ্যেই রয়েছে শান্তি ও সার্বিক কল্যাণের অকাট্য রূপরেখা। অতএব আল্লাহপাকের প্রত্যক্ষ পয়গামঋদ্ধ রাসুল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের মধ্যেই রয়েছে পৃথিবীর সার্বিক সাফল্য, এই কথাটি পরম আনুগত্যে চূড়ান্ত সত্য বলে মেনে নিতে হবে। এবং এইজন্যই তিনি *'উস্‌ওয়াতুন হাসানা'* জগদ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। অর্থাৎ তাঁর আদর্শরিক্ত যে-পৃথিবী, তাঁর রেসালাতের প্রতি বিশ্বাসহীন যে-পৃথিবী, সেই পৃথিবী অন্ধকার অভিশপ্ত এক পথভ্রষ্ট জাহেলিয়াতের পৃথিবী। অবশ্য এটা মনে রাখা জরুরি যে, রাসুল (সাঃ)-কে শুধু রাসুল বলে মেনে নিলেই আমরা শান্তি ও কল্যাণের স্নিগ্ধ-সরোবরে অবগাহন করতে পারবো তা নয়, তাঁকে মেনে নেয়া মানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করা, নিঃশর্ত আনুগত্যে একমাত্র তাঁরই আদর্শকে আঁকড়ে ধরা। অর্থাৎ জীবন ও জগতের গতিপথে রাসুল (সাঃ) ও তাঁর আনীত কোরআনই হবে একমাত্র পথনির্দেশক কম্পাস, একমাত্র আলোকবর্তিকা।

তৃতীয়, আখেরাত। একদিন অবশ্যই এক ভয়ংকর বিচারদিবসে কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হওয়া-যে মানুষের জন্য অবধারিত, এই বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। এ-নিয়ে কোনোরূপ দ্বিধা ও শৈথিল্যের কোনো অবকাশ নেই। অর্থাৎ অনন্তদিনের জান্নাত-জাহান্নামের ফয়সালা-যে একটি অকাট্য সত্য, এ-বিষয়ে সংশয় মানেই সর্বনাশ, এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে।

এই তিনটি মৌলিক সত্য, অর্থাৎ তাওহিদ রেসালাত ও আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের সবক্ দিয়েই রাসুল (সাঃ) বিশ্বশান্তির পথ রচনা করলেন। এই পথ আল্লাহপাকের নির্ধারিত পথ, অতএব সর্বাংশে নির্ভুল। আর এই আল্লাহপ্রদত্ত নির্ভুল পথনির্দেশনায় রাসুল (সাঃ)-এর যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক রূপরেখা, মানবমুক্তির সেটাই একমাত্র পথ।

www.pathagar.com

সভ্যতার বিপর্যয় এবং রাসুল (সাঃ)এর সমাজ-সংস্কার

সেই কোন্ উষাকাল থেকে অদ্যাবধি মানবসভ্যতার যে-আবহমান ইতিহাস, বা বস্তুতই অত্যন্ত দীর্ঘ। কেউ বলেন, এই-ইতিহাসের দৈর্ঘ ন্যূনপক্ষে দশ সহস্র বৎসর; কেউ বলেন, আরো বেশি। সে যাই হোক, সুদূর সেই অতীত থেকে মানুষ পুরুষানুক্রমে কালপরম্পরায় অগ্রসর হতে হতে আজ এই-যে একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করলো, এখন এ-নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সুদীর্ঘ কালপ্রবাহে বহু সভ্যতার উদ্ভব যেমন ঘটেছে, বহু সভ্যতা কালগর্ভে বিলীনও হয়ে গেছে। মানুষের ইতিহাস এক অর্থে সভ্যতার এই; উত্থান পতন ও নব নব সভ্যতার এই সৃষ্টি ও বিলয়েরই ইতিবৃত্ত। ইতিহাস আমাদেরকে যতখানি অবগত করে তা-থেকে জানতে পারি, একদা গ্রীক সভ্যতা বিশ্বমানচিত্রে একটি উন্নত সভ্যতার অভিজ্ঞান রচনা করেছিল। এবং তারও আগে ছিল চৈনিক সভ্যতা, ছিল মিশরীয় সভ্যতা, ছিল মেসোপটেমিয়া ও ভারতবর্ষের বুকে গড়ে ওঠা বেবিলনীয় এবং সিন্ধু সভ্যতা। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, প্রায় সমসাময়িক রোমান ও পারসিক সভ্যতার কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যা খ্রীষ্টপূর্ব কয়েক শতক আগে থেকে সপ্তম শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত সপ্রতাপে বিরাজমান ছিল। আসলে এই ধরাপৃষ্ঠে ক্ষুদ্র বৃহৎ কত-যে অসংখ্য সভ্যতার জন্মমৃত্যু বিকাশ ও বিলোপ ও বিপর্যয় ঘটেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। ধারণা করা যায়, ভবিষ্যতেও মানবসভ্যতার এই ভাঙ্গাগড়া যথারীতি অব্যাহত থাকবে।

আমাদের বর্তমান এই আলোচনা শীর্ষনাম 'সভ্যতার বিপর্যয় ও রাসুল (সাঃ)-এর সমাজ সংস্কার।' এই প্রেক্ষিতে প্রথমেই যে-প্রশ্নটির জবাব অনুসন্ধান করা দরকার তাহলো, মানুষ থাকে অথচ পূর্ণরূপে বিকশিত হবার আগেই মধ্যপথে অথবা একটা বিশেষ সময়বিন্দুতে এসে অতি যত্নে গড়া একটি সভ্যতার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় কেন? এটাই কি নিয়ম, নাকি আসলেই কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য কারণ আছে, যা অনিবার্যভাবেই কোন সভ্যতাকে বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করে? হতে পারে প্রবল কি উন্নততর কোন সভ্যতার আগ্রাসন হেতু এই রকমটি ঘটে। অথবা এমনও হতে পারে, সমরশক্তির দুর্বলতাহেতু পরাজিত জনগোষ্ঠী তার লালিত সভ্যতাকে ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়; অর্থাৎ নবাগত আগ্রাসী শক্তি শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করে না, অধিকৃত ভূখণ্ডের দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গিসহ পুরো সংস্কৃতিচেতনা ও জীবন দর্শনকেই পরিবর্তন করে দেয়। আবার কখনো বিপরীত প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা যায়, যেখানে সমরশক্তিতে বিজয়ী পক্ষ পরাজিত প্রতিপক্ষের সভ্যতা ও বিশ্বাস ও সংস্কৃতিচেতনার মধ্যে স্বেচ্ছায় আশ্রয় গ্রহণ করে ও মিশে যায়। কিন্তু যেভাবে যাই ঘটুক, নানা ধরনের ঘাত-প্রতিঘাত এসে সভ্যতার উদ্ভব কি বিদায় কি বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে যে অবস্থারই সৃষ্টি করুক, এটা সত্য যে, সব সভ্যতার অন্তর্মূলেই সক্রিয় থাকে একটি কোন জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শন ধীরে ধীরে স্তিমিত বা নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর বলে প্রমানিত

www.pathagar.com

হওয়ার ফলেই, একটি সভ্যতায় নেমে আসে প্রথমে বিপর্যয়, এবং অবশেষে বিলুপ্তি। অর্থাৎ বহিরাক্রমণ কি আগ্রাসন একটি বাহ্যিক আঘাত মাত্র; বিলুপ্তি ও বিপর্যয়ের প্রকৃত কারণ হলো শাশ্বত জীবনদর্শনের অভাব।

এখন এই প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের বর্তমান আধুনিক সভ্যতার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি। অর্থনৈতিক প্রশ্নে এই সভ্যতার মোটামুটি দুটি রূপ; একটি সমাজতান্ত্রিক, যা ইতোমধ্যেই ভুল দর্শনের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে পুরোপুরি ধরাশায়ী হয়েছে; অপরটি হলো পুঁজিবাদী সভ্যতা, যা বহাল তবিয়তে এখনো পৃথিবীবক্ষে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। অন্যদিক থেকেও আমরা বর্তমান বিশ্বে দুই ধরনের দুটি সভ্যতাকে ক্রিয়াশীল দেখতে পাই; একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক পশ্চিমা সভ্যতা, অপরটি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাপুষ্ট প্রাচ্য সভ্যতা। দেয়া-নেয়ার মধ্য দিয়ে উভয় সভ্যতা যদিও নিত্যই এক অপরকে প্রভাবিত করছে, পারস্পরিক এক প্রকার অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতাও সৃষ্টি হচ্ছে, তবু প্রাচ্য প্রতীচ্য এই দুটি সভ্যতার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। এখন বিপর্যয়ের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে প্রাচ্য সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই সভ্যতা আজ যে বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে, তার একমাত্র হেতু নিজস্ব স্বভাব ও শক্তি, চৈতন্য ও প্রবণতাকে অবহেলা করে পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুগমন। এই অন্ধ অনুগামিতা প্রাচ্যের জন্য কী-যে আত্মঘাতী, কত-যে বিপর্যয়কর, সে-কথা ইকবাল তাঁর কবিতায় যুগপৎ শ্লেষ ও বেদনার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, 'লড়কিয়াঁ পড় রহি হায় আংরেজি... ইহ্ ড্রামা দিখায়েগা কেয়া সীন'- মেয়েরা ইংরাজী পড়ছে .... এ-এক নাটক, দেখা যাক এই নাটক কী দৃশ্য মেলে ধরে? 'মাঙ্গকে লায়া হায় ফিরিঙ্গীসে নফ্স' ফিরিঙ্গীদের নিকট থেকে ধার করে আনা এই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কারণেই সমগ্র প্রাচ্যে আজ মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে বিপর্যয়।

আর পশ্চিমা সভ্যতা যে আজ অপ্রতিহত গতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার মূল কারণ নিরঙ্কুশ বস্তুবাদ। বস্তুবাদ এমন একটি গুরুতর জীবনদর্শন, যা শোষণ ও নির্বিচার-লুণ্ঠনকে আশ্রয় করে একটি প্রশস্ত কারাগার তৈরী করে মাত্র, এবং যা সকল মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে অসংখ্য মানুষকে কতিপয় অমানুষের হাতে বন্দী হতে বাধ্য করে। ইনসাফের অপমৃত্যু ঘটে, নৈতিকতা আড়ালে চলে যায়, এবং এই সঙ্গে উপসর্গ হয়ে দেখা দেয় মদ জুয়া যৌনতা বেহায়াপনা নারীপণ্যের অবাধ প্রসার ইত্যাদি কুৎসিত রোগব্যাধি। পশ্চিমা জীবনধারার দিকে লক্ষ করলে এটা স্পষ্টই অনুধাবন করা যায় যে, তার সর্বাঙ্গ আপাদমস্তক এখন এমন সব বহুবর্ণ কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত, যা 'গণতন্ত্র' 'নারী অধিকার' 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ইত্যাদি কতিপয় শ্রুতিমধুর শব্দের আড়ালে আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আর এতদসঙ্গে হান্টিংটন প্রমুখ গোবৈদ্য-ধরনের বুদ্ধিজীবীদের হাতুড়ে চিকিৎসায় রোগ আরো প্রবল রূপ ধারণ করেছে। এবং অবস্থা এতটাই করুণ ও ভয়াবহ ও দ্রুত-পতনোন্মুখ যে, মদ জুয়া এইডস মানববিধ্বংসী সমরাস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে

www.pathagar.com

পশ্চিমা সভ্যতা এমন এক স্বসৃষ্ট কারাগারে অসহায়ভাবে বন্দী, যা-থেকে মুক্তির কোন পথ আর এখন খোলা নেই। মনে হচ্ছে, ইউরোপ-আমেরিকা-যে আজ বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে দানবের মত আস্ফালন করছে, আসলে এটি আস্ফালন নয়, এটা হৃদযন্ত্র বিকল হবার পূর্বলক্ষণ, মৃত্যু-পূর্ববর্তী শেষ বিদায়ের আর্ত চিৎকার। কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। ভোগবাদের মদির পানীয় আমেরিকা ইয়োরোপকে-যে ভেতরে ভেতরে কতখানি নিঃশেষ করে ফেলেছে, সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না যখন দেখা যায়, একজন মোল্লা উমার কি একজন লাদিনের ভয়ে তাদের অঢেল ঐশ্বর্য ও অঢেল সমরাস্ত্র-সজ্জিত মসনদ থর থর করে কেঁপে ওঠে।

যাই হোক, শুধু ইয়োরোপ আমেরিকার কথা নয়, পুরো পৃথিবীই এখন অংশীবাদ, নাস্তিকতা, প্রচণ্ড পার্থিব ক্ষুধা ও বেপরোয়া ভোগবাদ দ্বারা এমনভাবে আক্রান্ত ও বির্পযস্ত যে, এই বিপন্ন আধুনিক সভ্যতার বিনাশ এখন নিতান্তই সময়ের ব্যাপার। আগেই বলেছি, যে-কোন সভ্যতারই প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান করে একটি জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শনই সভ্যতার আয়ু ও স্থায়িত্বের নিয়ামক। অদ্যাবধি, পৃথিবীতে যত সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছে, অন্য কারণে নয়, শুধু নির্ভুল জীবনদর্শন না-থাকার কারণেই সে-সকল সভ্যতা নানা বিপর্যয়ের শিকার হতে হতে এক সময় বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ইসলামী সভ্যতা। রাসুল (সাঃ) এর নবুয়ত লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রায় চৌদ্দশত বৎসর বহু বৈরিতা ও প্রতিবন্ধকতার সাথে লড়াই করে ইসলামী সভ্যতা একইভাবে টিকে আছে; এবং ইনশাআল্লাহ রোজ কেয়ামত পর্যন্ত একইভাবে টিকে থাকবে। শুধু টিকে থাকা নয়, ভাষা বর্ণ ভূগোলের সকল ব্যবধানকে পরাভূত করে পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দেড়শ কোটি মানুষের জীবনধারার সঙ্গে এই সভ্যতা আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইতিহাসের বহু ক্রান্তিকালে সময়ে-দুঃসময়ে মুসলিম উম্মাহর জীবনে নানা ধরনের বিপর্যয় নেমে এসেছে, কিন্তু ইসলামী সভ্যতার মাথা কখনো অবনত হয়নি। এমনকি স্পেন যখন মুসলিম-শূন্য হয়ে গেল, তখনো ইয়োরোপ এই ইসলামী সভ্যতার ছায়ায় বসে বসে শিক্ষা ও সৌন্দর্য ও মানবতার সবক গ্রহণ করছে। কিন্তু শুধু ইসলামী সভ্যতার পক্ষেই এমন অটুটভাবে টিকে থাকা সম্ভব হয় কী-করে? সম্ভব হয় এইজন্য যে, ইসলামী সভ্যতার মর্মমূলে রয়েছে একটি নিখাদ ও নির্ভুল সত্য, এক শাশ্বত অবিনশ্বর জীবনদর্শন, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই তাওহিদী সত্যের যেহেতু ধ্বংস নেই, এবং আল্লাহপাক নিজে যেহেতু এই সত্যের প্রেরক ও হেফাযতকারী, ইসলামী সভ্যতার কোন ক্ষয় ও বিনাশ নেই। আসলে ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতা হলো সর্বকালের সকল মানুষের জন্য আল্লাহপাকের বিশেষ নেয়ামত এক অনির্বাণ আলোকবর্তিকা।

সমগ্র মানবসম্প্রদায়ের জন্য শাশ্বত সভ্যতার এই পয়গাম, কল্যাণ ও হেদায়াতের এই অবিনশ্বর আলোকবর্তিকা যিনি ধরাপৃষ্ঠে বয়ে আনলেন, তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন মহানবী

www.pathagar.com

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। কোন সন্দেহ নেই, তাঁর প্রদর্শিত পথই একমাত্র পথ এবং তাঁর জীবনাদর্শই মানবের কল্যাণমুখী অভিযাত্রার একমাত্র পাথেয়। যিনি যে-ভাবেই বলুন বা ব্যাখ্যা করুন, আসলে রাসুল (সাঃ) এই পৃথিবীতে এসেছিলেন একটি নিরাপদ ও সুন্দর ও মানুষে-মানুষে ভালোবাসার এক শান্তি ও স্বপ্নময় পৃথিবী গড়বার দায়িত্ব নিয়ে। এবং আল কোরআনের নির্ভুল পথনির্দেশনাকে সামনে রেখে তেইশ বছরের নবুয়তি জিন্দিগীব্যাপী এই কাজটিই তিনি করেছেন; এবং তাঁর অব্যাহত সংগ্রাম ও সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি পৃথিবীকে উপহার দিলেন এক নতুন পৃথিবী, এক নতুন সমাজ ও নিখুঁত চরিত্রবলে অপরাজেয় দীপম্যান এক সর্বোত্তম উম্মাহ। পুনরায় উল্লেখ করি, রাসুল (সাঃ) এর দায়িত্ব ও লক্ষ্য ছিল এক নতুন পৃথিবী রচনার। কিন্তু মানুষ যদি মানুষ না-হয়, তাহলে এই লক্ষ্যসাধনে কামিয়াবি অর্জন করা কি সম্ভব? অতএব রাসূল (সাঃ)এর প্রথম কাজই হলো ব্যক্তি মানুষের জীবন থেকে সকল অশুভ উপসর্গ, সকল অন্ধকারকে বিদূরিত করে নতুন আলোক-চৈতন্যে উদ্ভাসিত এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হওয়া। এটাই হলো সুস্থ পৃথিবী সুস্থ দেশ ও আদর্শ জাতি বিনির্মাণের প্রথম পদক্ষেপ।

রাসুল (সাঃ) দেখলেন, তাঁর চতুর্দিকে যে-সমাজ, যে-সমাজের তিনিও একজন বাসিন্দা, ঘোরতরভাবে রোগাক্রান্ত সে-এক বহুদিনের অসুস্থ সমাজ। মদ্যপান জুয়া হত্যা লুণ্ঠন ব্যভিচার হানাহানি ইত্যাদি নিয়ে এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজ করছে এক প্রচণ্ড জুলমাত, এক নিশ্ছিদ্র জাহেলিয়াত। এই কঠিন জাহেলিয়াতকে উৎখাত করে সুখী সুন্দর ও নিরাপদ একটি সমাজ নির্মাণ করা শুধু কঠিন নয়, রীতিমত একটি অসম্ভব কাজ। কিন্তু বিস্ময়করই বটে, এই অসম্ভবকেই শতকরা একশত ভাগ সম্ভব করে নবী মোহাম্মদ (সাঃ) পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থাপন করলেন একটি আদর্শ আলোকিত সমাজ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রথমেই মনে রাখা আবশ্যক যে, রাসুল (সাঃ)কে কোন চিন্তা-গবেষণার মধ্য দিয়ে পথের অনুসন্ধান করতে হয়নি। তিনি যে-সংস্কার কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হলেন, সেই কর্মসূচী ও পরিকল্পনার একটি বর্ণও তার নিজের নয়। সবই আল্লাহপাক কর্তৃক প্রেরিত ও প্রদত্ত নির্দেশনা। তিনি কেবল তাঁর প্রাণান্ত চেষ্টা ও ধৈর্য ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই নির্দেশনাকে বাস্তব রূপ দান করেছেন। অর্থাৎ তিনি ব্যবহারিক রূপকার, মূল নক্শাটি আল্লাহপাক প্রণীত। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি, রাসূল (সাঃ) তাঁর তেরো বছরের মক্কী জিন্দিগীতে সমাজ কি ব্যক্তিমানুষের সংশোধনকল্পে কখনো অপরাধ অনাচারের কথা বলেন-নি; কখনো বলেন নি, হত্যা লুণ্ঠন হানাহানি মদ্যপান ইত্যাদি সামাজিক দুষ্কর্ম পরিহার করতে হবে অথবা পরিহার করা উচিত। তিনি শুধু তেরো বছর ধরে একটি কথাই বলেছেন ঃ তোমরা অংশীবাদকে ছেড়ে দাও, তাওহীদ ও রেসালাত ও আখেরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করো। এই কথা বলবার জন্যই তিনি তায়েফে ছুটে গিয়েছেন, ফিরে এসেছেন রক্তাক্ত দেহে ভগ্নহৃদয়ে; এবং এই কথা বলবার জন্যই তিনি ওকাযের মেলায় তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মেলায় আগত মদীনাবাসীদের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, আকাবার

www.pathagar.com

সেই বাইয়াত সমূহের সারমর্মও ছিল এই একই কথা। সাধারণ মানববুদ্ধিতে সংস্কার কার্যক্রমের এই পন্থা যথেষ্ট বিস্ময়কর মনে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহপাক জানেন, সমাজে আমরা যে-সকল পাপ ও অপরাধের চিত্র দেখতে পাই, তা একটিও কোন রোগ নয়, রোগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মানুষের জীবনে প্রকৃত রোগ হলো শিরক ও কুফরি; অর্থাৎ আল্লাহর একক অখন্ড সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার ও অংশীবাদের ভ্রান্তি নিয়ে বিভাজন সৃষ্টি, এবং এতদসঙ্গে মৃত্যু-পরবর্তী আখেরাতের অনন্ত জিন্দিগীর প্রতি অবিশ্বাস ও ভয়হীনতা। এটাই রোগ; এবং রাসুল (সাঃ) নবুয়ত-লাভের প্রথম থেকেই অনুধাবন করেছেন, বেশি কিছু নয়, শুধু তাওহীদ ও রেসালাতের প্রতি বিশ্বাস এবং আখেরাতের ভয় যদি মানুষের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হয়, সামাজিক-নৈতিক অপরাধ বললে যা বোঝায়, তা-সবই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঝরে যেতে বাধ্য। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, হুবহু এই রকমই ঘটেছে। এবং ইতিহাস তর্কাতীতভাবে এই সাক্ষ্যও দিচ্ছে, রাসুল (সাঃ) কর্তৃক পেশকৃত তাওহীদ রেসালাত ও আখেরাত, এই তিনটি মৌলিক বিশ্বাসকে যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরকে আর নতুন করে-কিছু বুঝাতে হয়নি; আল্লাহপাক প্রেরিত এক-একটি আদেশ নির্দেশ ও নিষেধ শুনিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। এবং আল্লাহর ভয়কে সামনে রেখে তাঁরা সবাই এমন এক-একটি সোনার মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন, যাঁরা নিষ্পাপ শিশুর মতই নিষ্কলঙ্ক। আর এঁদের নিয়েই লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল পরিব্যাপ্ত ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত যে-মানব সমাজ, সেই সমাজ হলো সর্বাধিক শান্তি ও নিরাপত্তাবেষ্টিত সর্বকালের সর্বোৎকৃষ্ট সমাজ।

অতএব উল্লেখ করি, সমাজের এই সংস্কার সাধন এবং নবতর এই আদর্শ সমাজ-প্রতিষ্ঠায় রাসুল (সাঃ) তাঁর নিজস্ব কোন হিকমত বা নিজস্ব-প্রণীত কোন পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেন নি; তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল আল্লাহপাকের নির্ভুল নির্দেশনা। আসলে আদর্শ সমাজ-নির্মাণ ও সুষ্ঠু সমাজ-পরিচালনার যে-হিকমত, তা একান্তভাবেই আল্লাহপাকের নাজিলকৃত। কোন মানুষ তো দূরের কথা, এমনকি নবী রাসুলদের পক্ষেও নিজ বুদ্ধি ও পরিকল্পনা নিয়ে এক্ষেত্রে আদৌ এতটুকু সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বব্যাপী আজ এই-যে প্রচণ্ড সামাজিক অস্থিরতা, এই-যে পৃথিবীবিস্তৃত হাহাকার, সমাজদেহে পাপ ও অপরাধের এই-যে অবাধ বিস্তার, এই-যে ঘন নিরন্ধ্র জাহেলিয়াত, এ-থেকে পরিত্রাণের একটিই পথ, সেটা হলো ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে আল্লাহর ভয়কে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসুল (সাঃ)এর প্রদর্শিত পথে আল কোরআনের কাছে নিঃশর্ত আনুগত্য নিয়ে ফিরে আসা। এ-এক পরীক্ষিত মহৌষধ। কিন্তু পৃথিবীর বড় দুর্ভাগ্য, আল কোরআন এবং রাসুল (সাঃ) প্রদর্শিত অব্যর্থ কর্মপন্থাকে সতর্কভাবে বর্জন করাকেই পৃথিবী আজ মনে করছে প্রগতি। এবং আরো বড় দুর্ভাগ্যের কথা, বিধর্মীদের সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর একটি বড় অংশও আজ এই একই ইবলিসী কুহক ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতিবাদের প্রণয়মুগ্ধ উপাসক। অতএব এই মূঢ়তা যতদিন অব্যাহত থাকবে, সমাজ সংস্কারের সকল প্রচেষ্টাও ততদিন ক্রমাগত ব্যর্থ হতে থাকবে। এবং এই কথা ইয়োরোপ-আমেরিকার ক্ষেত্রে যেমন সত্য, একই রকম সত্য মুসলিম জাহানের ক্ষেত্রেও।

www.pathagar.com

আধুনিক রাষ্ট্রগঠনে রাসূল (সাঃ)এর অবদান

রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাস অত্যন্ত সুপ্রাচীন। এত প্রাচীন যে, কবে কীভাবে রাষ্ট্র প্রথম গঠিত হলো, এ সম্পর্কে কারো কাছেই কোন সুস্পষ্ট তথ্য নেই। নানা রকম সম্ভাবনা যাচাই করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কেউ বলেন, রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে এক ধরনের সামাজিক চুক্তিকে অবলম্বন করে। কেউ বলেন, রাষ্ট্র বলতে যা-বোঝায়, সেই অবয়ব রূপ লাভ করেছে কোন শক্তিমান ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা ও ক্ষমতার ফলশ্রুতিস্বরূপ। অর্থাৎ অন্য সবাইকে একক একটি শক্তিকেন্দ্রের চারপাশে আবদ্ধ রাখার মধ্যেই রাষ্ট্রগঠনের প্রথম উন্মেষ পর্ব; রাষ্টবিজ্ঞানে যাকে বলা হয়েছে Theory of Force. বলাই বাহুল্য, রাষ্ট্রের প্রথম উৎপত্তি সম্পর্কে এরকম অনেক তত্ত্বই আছে; তার মধ্যে কোন্‌টা নির্ভুল, সে-বিষয়ে তর্কাতীত ও অকাট্য কোন স্থির-সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। তবে এটা সত্য যে, মানবসভ্যতার যে জ্ঞাত ইতিহাস, সেখানে কোন-না-কোনরূপে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রমুখী ধারণা সর্বদায়ই বিদ্যমান ছিল। এবং একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়, অজ্ঞাত প্রাগৈতিহাসিক সময়ে যাই থাক, নানা সূত্র থেকে প্রাপ্ত সভ্যতার যে-ইতিহাস সম্পর্কে আমরা মোটামুটি অবহিত, সেই ইতিহাস মূলত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়কদেরই ইতিহাস।

আমরা গ্রীক রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা জানি, পারস্য কি রোমান সাম্রাজ্যের কথাও জানি। এবং তারও পূর্বে ভারতবর্ষের অশোক, মিশরের ফেরাউন ও বেবিলন-খ্যাত নমরুদের যে-রাজ্য সাম্রাজ্য, সে-সব সম্পর্কেও বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা কিছু কিছু তথ্য লাভ করি। সেই সব তথ্যসূত্রে এটা বুঝা যায় যে, ভৌগোলিক পরিসীমা, সরকার, জনসমষ্টি ইত্যাদি নিয়ে গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে প্রাচীন ও এ-কালের আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যে বাহ্যিকভাবে খুব একটা পার্থক্য নেই। পার্থক্য ঘটেছে আদর্শের ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আগের দিনে কোন রাষ্ট্রেই কখনো জনগণের কোন মূল্য ছিল না। জনগণ ছিল পরাক্রান্ত কোন রাজার অধীনে রণক্ষেত্রে বা ফসলের ক্ষেত্রে নিতান্তই অশ্ব ও বলদের মত শ্রমঘনিষ্ঠ নিগড়বন্দী নীরব নিরীহ পশু মাত্র। তাদের বলার কিছু ছিল না, বলার সাহস কিংবা ইচ্ছাও ছিলনা। প্রত্যক্ষ নির্যাতন ও সেই সঙ্গে অখণ্ডনীয় নিয়তি, দেবতার ক্রোধ, জন্মান্তরবাদ, রৌরব নরক ইত্যাদি নানামুখী ভয়ের আবহ সৃষ্টি করে জনগণকে গৃহপালিত পশুর মতই বশীভূত করে রাখা হতো। কিন্তু বর্তমান কালের রাষ্ট্রব্যবস্থায় এদিক থেকে একটা আদর্শগত ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। অবশ্য জনগণকে শোষণের বহু চতুর কৌশল যদিও উদ্ভাবিত হয়েছে, যদিও নানা উপায়ে জনগণকে গুরুতর বহু ভ্রান্তি ও কুহকের মধ্যে নিক্ষেপ করা হচ্ছে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক যে, এখন আর কোন রাষ্ট্রেই জনগণকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে ফরাসী-বিপ্লবজাত গণতন্ত্রের কারণে, স্বীকার করতে হয়, পৃথিবীতে এখন সাধারণ জনগণের

www.pathagar.com

মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং অবস্থা এরকম যে, অতি বড় স্বৈরাচারী জালিম শাসকেরও মুখে অন্তত বলতেই হয় যে, তিনিও জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী। অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্র এখন আর কোন সিজর-আলেকজান্ডারের রাষ্ট্র নয়, লর্ড কি ব্যারনদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মৃগয়াক্ষেত্র নয়; মাঝে মাঝে হিটলার কি স্ট্যালিন কি ফ্রাঙ্কোর মত বেপরোয়া শাসকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও, সার্বিক বিবেচনায় যে কোন রাষ্ট্রই এখন মানবকল্যাণমুখী আদর্শ ও নীতি দ্বারা পরিচালিত। শোষণের অনেক গোপন কারচুপি যাই থাক, রাষ্ট্রীয় সংবিধানে এখন অন্ত ত মানুষের সুখ-দুঃখ মঙ্গলামঙ্গল, আশা ও বিশ্বাসের কথা বাঙময় করে রাখতেই হচ্ছে।

যা হোক, আধুনিক রাষ্ট্রের এই যে আদর্শিক পালাবদল, এক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ) এর ভূমিকা এবং অবদান কী ও কতখানি, সে-বিষয়ে আমরা আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারি। অবশ্য এই পর্যালোচনার একেবারে প্রারম্ভেই আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহপাক এই পৃথিবীতে রাসূল (সাঃ) কে প্রেরণই করেছিলেন এই দায়িত্ব দিয়ে যে, তিনি আল্লাহর একক ও অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বের অধীনে সকল অশুভ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে একটি নতুন নিরাপদ পৃথিবী রচনা করবেন। অনেকে অবশ্য রাসূল (সাঃ) এর উপর অর্পিত জরুরি-দায়িত্বের এই সহজ কথাটা বুঝতে চায় না; কেন চায় না, নিঃসন্দেহে সে-এক বিরাট রহস্য। অবশ্য সেই রহস্য উন্মোচন করা যেহেতু আমাদের কাজ নয়, আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে সামনে রেখে শুধু এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, মানবসৃষ্টির অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে গিয়ে আল্লাহপাক বলেছিলেন, তিনি পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চান। এবং একথাও বলেছেন, আন্নাল আরদা ইয়ারিসুহা ইবাদিইয়াস সালিহুন' তাঁর সালেহীন বান্দাহ্রাই এই পৃথিবীর বৈধ উত্তরাধিকারী। অতএব এটা পরিষ্কার যে, সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করবে কাফের মুশরিক ও মুনাফিক সম্প্রদায়, খোদাদ্রোহী-ফেরাউনের দল; আর মুসলমান মুদিত চক্ষু মুত্তাকীর বেশে পৃথিবীর দয়ার উপর নির্ভর করে প্রায় কাঙালের মত দিন গুজরান করবে, এটা হয় না এবং আল্লাহপাকের অভিপ্রায়ও আসলে এ-রকম নয়। আল্লাহপাক কী চান, কী তাঁর অভিপ্রায়, তারই সার্বিক ও সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর তেইশ বছরের নবুয়তি জিন্দিগীর একাগ্র অবিরাম সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃষ্ট রূপ।

যাই হোক, হিজরতের পর রাসূল (সাঃ) মদীনায় এসে মদীনাকেন্দ্রিক ৬ বর্গমাইলের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠন করলেন, মাত্র দশ বছরের মধ্যে রাসূল (সাঃ) এর ওফাত্কালে যার পরিসর দাঁড়িয়েছিল ৮ লক্ষ বর্গমাইল। এই রাষ্ট্রের চরিত্র ও প্রকৃতি সম্পর্কে, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই, শুধু এটুকু উল্লেখ করি, সমসাময়িককালের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না, অদ্যাবধি, এবং অগ্রিম ব্যক্ত করা

www.pathagar.com

যায়, রোজ কেয়ামত পর্যন্ত রাসূল (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সেদিনের সেই মদীনাকেন্দ্রিক রাষ্ট্রটিই মানবসভ্যতার সর্বকালের সর্বোত্তম রাষ্ট্রের বাস্তব নমুনা। বলাই বাহুল্য, এটা কোন অত্যুক্তি নয়, পক্ষপাতমূলক অতিশয়োক্তি নয়; যে-কোন দেশের যে-কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে, রাসূল (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত যে- রাষ্ট্র, আবহমান বিশ্বসভ্যতার প্রেক্ষাপটে তদপেক্ষা উত্তম ও উৎকৃষ্ট কোন রাষ্ট্রের নজীর পৃথিবীতে নাই। অবশ্য এটা স্বাভাবিকও বটে, কারণ স্বয়ং আল্লাহ-প্রণীত সংবিধান যেহেতু প্রশ্নাতীতভাবে নির্ভুল ও নিখুঁত ও সর্বোৎকৃষ্ট, সেই সংবিধানের ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রটিও হবে স্বাভাবিকভাবেই অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ উদাহরণ। এবং সাফল্যের এই বাস্তব নমুনা সামনে ছিল বলেই মনীষী-লেখক বার্নার্ডশ একদা পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলেছিলেন, 'আগামী এক শতাব্দীর মধ্যে কোন একটি ধর্মের দ্বারা যদি ইংল্যান্ড তথা ইউরোপে শাসিত হবার ঘটনা ঘটে, সে ইসলাম।' অর্থাৎ যে-রাষ্ট্রীয় আদর্শের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নমুনা নবী মোহাম্মদ (সাঃ) পৃথিবীসমক্ষে পেশ করলেন, তার সর্বমানবিক কল্যাণমুখী কার্যকারিতা সমগ্র পৃথিবীর জন্যই আদর্শস্বরূপ; সকল ব্যবস্থাকে নিষ্প্রভ ও পরাভূত করে যে আদর্শ একদিন পুরো পৃথিবীকেই অধিকার করে নেবে।

আমরা এ-বিষয়ে আর একটু বিশদ আলোচনা করতে চাই। রাষ্ট্র কাকে বলে, তা-নিয়ে খুব-একটা মতভেদ নেই যে কারণে পৃথিবীতে বহু রাষ্ট্র যেমন আছে, একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে তাদের স্ব স্ব অস্তিত্বের মোটামুটি সর্বস্বীকৃত গ্যারান্টিও আছে। অবশ্য একটি বিষয় এখানে অনুল্লেখ রাখা অসমীচীন হবে, সেটা হলো সার্বভৌমত্ব। এই প্রশ্নে আধুনিক, প্রাচীন নানা রাষ্ট্রে নানা ধরনের মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব যেহেতু অনেকটাই অধরা ও নৈর্ব্যক্তিক, সার্বভৌমত্ব গীর্জার মধ্যেই লুকিয়ে থাক বা জনগণই হোক সে-ক্ষমতার অধিকারী অথবা হনুমান গুবরেপোকা জিউসের মন্দির বা সদা-প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড ইত্যাদি যাকেই বলা হোক রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস, এ-নিয়ে বিশেষ পেরেশানির কিছু নেই। কারণ সার্বভৌমত্বের ধারণাগত অস্তিত্বের চেয়ে রাষ্ট্রের ব্যবহারিক ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে আবার একটু পিছিয়ে গিয়ে বলতে হয়, পৃথিবীতে এ-কালে সেকালে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের যে-ধারণা তা খুবই তাৎপর্যহীন ও অলীক; যে-কারণে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ-নিয়ে যথেষ্ট পেরেশানও বটে। কারণ নশ্বর ও সসীম কোন-কিছু কখনো সার্বভৌম হতে পারে না। একক অখণ্ড অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বের অধিকারী কেবল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও প্রতিপালক সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আর রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে সার্বভৌমত্বের এই অকাট্য-অত্যাবশ্যক বিশ্বাসটিকে সংযোজন করে আধুনিক রাষ্ট্রগঠনের কাজকে সহজ ও নির্ভুল করে দিলের নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এই কাজটি যে কত বড় এবং রাষ্ট্র-কাঠামোর জন্য কী অপরিহার্য, পৃথিবী এখন তা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করতে শুরু করেছে।

www.pathagar.com

সে যাই হোক, রাষ্ট্রের গঠনপ্রকৃতি, আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে অনেক দিক থেকে অনেক কথা বলা যায়; কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো, রাষ্ট্রের প্রকৃতপক্ষে কাজ কী এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে আশা করি মহানবী (সাঃ) এর ভূমিকা ও অবদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো। বলাই বাহুল্য, আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের (Nation state) এখন ক্ষমতা অনেক, উদ্যোগ এবং আয়োজনও বিপুল। কিন্তু প্রজাতন্ত্রই হোক আর গণপ্রজাতন্ত্রই হোক, আবার সেই প্রশ্ন, রাষ্ট্রের লক্ষ্য কী, কাজটাই-বা কী? রাষ্ট্রের মুখ্য কাজ যদি হয়, মানুষের জীবন ও সম্পদের সার্বিক নিরাপত্তা-দান তাহলে বলতেই হয়, রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে এমন অভাবিত নিরাপত্তা বিরাজমান ছিল, যেখানে সানা থেকে হাদ্‌রামাউত পর্যন্ত একজন অলংকার-শোভিত সুন্দরী নিঃসঙ্গ মহিলা নির্ভয়ে ভ্রমণ করতে পারতো, একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন ভয় ছিল না। রাষ্ট্রের কাজ যদি হয়, সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন নিরঙ্কুশ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, তাহলে আমরা স্মরণ করতে পারি রাসূল (সাঃ) এর সেই অবিনশ্বর বাক্যটি ঃ 'এমনকি আজ যদি আমার কন্যা ফাতেমাও চুরির দায়ে অভিযুক্ত হতো, তারও হাত কাটা যেতো।' এবং স্মরণ করতে পারি রাসূল (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত সেই ইসলামী রাষ্ট্রে ইনসাফের ভিত্তি এতটাই মযবুত ছিল যে, খলীফা উমার (রাঃ) খলীফা আলীকেও (রাঃ) একজন সাধারণ অপরাধীর মত বিচারকের সম্মুখীন হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। রাষ্ট্রের অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব্য দি হয়, সকল নাগরিকের খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদার পূরণ, তাহলেও আমরা দেখতে পাই, বিস্তর অভাব ও বিস্তর নিরক্ষরতার মধ্যে যাত্রা শুরু করা সত্ত্বেও কত অল্পদিনেই মদীনাকেন্দ্রিক সেই রাষ্ট্র এমন অবস্থায় উপনীত হলা, যখন অভাবী জাকাতগ্রহীতা কোন মানুষকে যেমন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, নিরক্ষর মানুষও বিরল। যদি ঐক্যের বন্ধনই কোন রাষ্ট্রের সাফল্য ও সার্থকতার মুখ্য মাপকাঠি বলে ধরা হয়, তাহলেও, ইসলামের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ঐতিহাসিকেরাও অকপটে স্বীকার করেন, মদীনা সনদের ভিত্তিতে সকল ধর্ম বর্ণ বিশ্বাসের নানামুখী মানুষকে রাসূল (সাঃ) তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এমন একটি অখণ্ড ও মজবুত ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন, যা এখনো এই আধুনিক পৃথিবীর কাছে বিস্ময়। মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতা, বর্তমানকালে এই দু'টি বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। যদিও আজ আর এমন একটিও রাষ্ট্র নেই, যেখানে এই দু'টি বস্তু পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত। অথচ রাসুল (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে এই দু'টি বিষয় এত বেশি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে, যা আধুনিক পৃথিবী কল্পনাও করতে পারে না। মানবাধিকার, বাক স্বাধীনতা ও নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ববোধ কী-চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, দু'একটি ঘটনা থেকেই আমরা তা সম্যক অনুধাবন করতে পারি। হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাঁর সাংসারিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে হজরত উমারের প্রস্তাবক্রমে যখন ভাতা নির্ধারণের কথা ওঠে, তখন এই প্রথম খলীফা বলেছিলেন, রাষ্ট্রে দরিদ্রতম ব্যক্তি যে খরচে সংসার নির্বাহ করে, খলীফার ভাতা যেন কোনক্রমেই তার চেয়ে বেশি না-হয়। হজরত উমার (রাঃ)

www.pathagar.com

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে কখনো ভালো খাবার খান-নি; আমৃত্যু জায়তুনের তেল দিয়ে শুকনো রুটি খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেছেন। এবং যিনি বলতেন, মানুষতো দূরের কথা, 'ফোরাতের নদীকূলে একটি কুকুরও যদি অনাহারে মারা যায়, খলীফা উমারকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।' কল্পনা করা যায়? আর এটাই কি কল্পনা করা যায় যে, মাত্র এক প্রস্থ কাপড়ের জন্য মসজিদ নববীর প্রকাশ্য সমাবেশে আমীরুল মুমেনীন খলীফা উমারকে (রাঃ) একজন সাধারণ নাগরিক কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দিতে হচ্ছে।

গভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে উল্লেখ করি, এই সবই হলো মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আদর্শগত বাস্তব ও ব্যবহারিক রূপ; আল্লাহর ভয় দ্বারা পরিচালিত যে-রাষ্ট্রে প্রথম চারজন খলীফাই ছিলেন জীবদ্দশায় অগ্নির সুসংবাদপ্রাপ্ত জান্নাতী। এ-নিয়ে আরো বিশদ আলোচনা করা সম্ভব; কিন্তু আশা করি এই নাতিদীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়েই এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ)-এর নিজ হাতে গড়া রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ভেতরে-বাইরে যে-অত্যুচ্চ মানব-কল্যাণমুখিতা, যে-পক্ষপাতহীন ইনসাফ এবং যে-সার্বিক ও সর্বমানবিক প্রেম বিদ্যমান ছিল, মানব-প্রণীত সংবিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত পৃথিবীর কোন-রাষ্ট্রের পক্ষেই সেই অত্যুচ্চ নক্ষত্রচুম্বী সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। সম্ভব যে-নয়, দুই শতাধিক রাষ্ট্রমালিকানায় সজ্জিত বর্তমান এই ব্যর্থ বিপন্ন পৃথিবী নিজেই তার প্রমাণ। এত যে ধনাঢ্য, এত যে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকা, সেই আমেরিকার শুধু নিউইয়র্ক শহরেই আড়াই লক্ষ বদ্ধ উন্মাদ বাস করে। আর লেলিন স্ট্যালিনের যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তার লৌহ যবনিকার (Iron curtain) অন্তরালে পঁচাত্তর বছর ধরে কী-যে হয়েছে আর না-হয়েছে, সেই কাহিনী অকথ্য। শুধু রাশিয়া কি শুধু আমেরিকার কথা নয়, কম-বেশি হয়ত আছে, কিন্তু সারা পৃথিবীতে এই একই দুরবস্থা বিরাজমান। বস্তুত, আগে যা-উল্লেখ করেছি, সে-কথা একশ ভাগ নির্ভুল; এই দুর্ভাগ্য জয় করা পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর সকল কথা ও কার্যক্রমের মত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনারও নিয়ন্ত্রক ছিল মহান আল্লাহপাক প্রদত্ত সংবিধান, আল কোরআন। অতএব আজকে যারা রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী দায়িত্ব ও ভূমিকার কথা বলছেন, বলছেন মানুষ ও মানুষের অধিকারের কথা, বলছেন সর্বমানবিক বিশ্বদৃষ্টির কথা, তাঁরা যদি তাঁদের বক্তব্যে যথার্থই সৎ ও আন্তরিক হন, তাহলে সকল ধরনের কুহক ও আত্মশ্লাঘা ও বালখিল্য-জিদ পরিত্যাগ করে তাদেরকে আল কোরআন ও রাসূল (সাঃ) এর পেশকৃত নির্ভুল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে সাফল্য অনুসন্ধান করতে হবে। নেপোলিয়ন বিষয়টি সম্যক অনুধাবন করেছিলেন যে, এ-ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই। এবং এই পথে আসতে পৃথিবীর যত বিলম্ব হবে, রাষ্ট্রসমূহের বহুমুখী উদ্যোগ ও আয়োজন বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু যথার্থ সাফল্য ক্রমাগত দূর থেকে আরো দূরে সরে যাবে, যার নাগাল পাওয়া কোনদিন সম্ভব হবে না। শেষ

www.pathagar.com

তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দরতম

মহানবী (সাঃ)কে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আপনি উত্তম স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত' 'সত্যপথের উপর অবিচলভাবে দণ্ডায়মান'। বলা হয়েছে, 'রাসুল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ করো, যা নিষেধ করেন তা-থেকে বিরত থাকো;' তিনি 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বিশ্বজগতের জন্য অনুগ্রহ; তিনি সর্বোত্তম আদর্শ 'উসওয়াতুন হাসানা'। হার্ভার্ড কি অক্সফোর্ড প্রদত্ত সনদ নয়, নয় কোন নোবেল কমিটির চা-চক্রপ্রসূত অভিজ্ঞানপত্র; মহানবী (সাঃ)কে এই পরিচয়ে অভিনন্দিত করেছেন বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ; এবং সেই আল্লাহপাক যিনি 'আহকামুল হাকিমীন' শ্রেষ্ঠতম বিচারক। এবং আল্লাহতায়ালা যেহেতু সর্বপ্রকার সীমাবদ্ধতা ও পক্ষপাতিত্ব থেকে পবিত্র—তাঁর বিচার অভ্রান্ত, তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল, তাঁর প্রদত্ত সার্টিফিকেট তর্কাতীত। আর যেহেতু আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে অবিসংবাদিতরূপে উচ্চারিত এই বিশেষণ ও অভিজ্ঞান, সন্দেহের কোন অবকাশই নেই; নেই এইজন্য যে, আল্লাহ যেহেতু স্বয়ং বলছেন, অতএব তা বিশ্বাসীদের কাছে অকাট্য ও প্রশ্নাতীত। আল্লাহ বলেছেন, সেটাই বড় প্রমান, এক্ষেত্রে এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত যে-কোন বক্তব্যের ক্ষেত্রে, কোনরূপ সংশয়ের ক্ষীণতম রেখাও যদি জেগে ওঠে, সেটা ঈমানের একটি বড় বিপর্যয়। তবু কেউ যদি মনে করেন, বিশেষণসমূহ যথার্থই ষোল আনা খাঁটি কিনা, যথাপাত্রে আরোপিত কিনা, তা যাচাই করে দেখা আবশ্যক, তিনি তা অবশ্যই সর্বতোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

আল্লাহপাক বলেছেন, মহানবী (সাঃ) উত্তম স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যপথের উপর অটুট ও অবিচল। কতিপয় আজন্ম-জাহান্নামীর কথা আলাদা, কিন্তু এটা সত্য যে, বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা করেও এমন একটি সূক্ষ্মতম ত্রুটিও খুঁজে পাওয়া যায় নি, যা এই মহামানবের মানবিক স্বভাবের মহত্বকে কণামাত্রও অবনমিত করে। এবং তাঁর স্বভাবের উৎকর্ষতা এতই প্রশ্নাতীত যে, পারমাণবিক মাইক্রোস্কোপ দিয়েও একটি খুঁত আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। তাঁর শত্রুমিত্র কি সার্বক্ষণিক সহচর সবাই দেখেছে, মানবস্বভাবের যে-অভিব্যক্তি সর্বাধিক সর্বোত্তম, সর্বতোভাবে যথাযথ এবং সর্বাপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য ও সুষমাময়, তারই উজ্জ্বলতম প্রতিফলন তাঁর কথা ও কাজ ও আচরণ। এবং তাঁর পুরো জীবন, একেবারে তুচ্ছতম খুঁটিনাটি কর্মসমূহ-সহ, এমন একশ' ভাগ সত্য ও সৌন্দর্যের নিখুঁত প্রতিবিম্ব যে, আল্লাহপাক যদি ঘোষণা নাও করতেন পৃথিবীর মানুষই তাঁকে এই অভিধায় বিভূষিত করত যে, মোহাম্মদ (সাঃ) নিঃসন্দেহে চিরকালীন বিশ্বের কাঙ্ক্ষিত কিন্তু কল্পনাতীত উৎকর্ষতা ও সত্যের অদ্বিতীয় বাস্তব দৃষ্টান্ত। আল্লাহপাক দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, কিন্তু তিনি যদি

www.pathagar.com

নীরবও থাকতেন, মানুষ নিজেই বলতো, বারবার বলতো 'এমন আর হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়'; যেমন পূর্ণ জাহেলিয়াতের ঘন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েও সকল আরববাসী তাঁকে বলেছিল 'আল-আমীন' পরম বিশ্বস্ত পরম সত্যবাদী।

মানবসৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ মানুষেরই মধ্যে আদর্শ অনুসন্ধান করে আসছে। কিন্তু মানুষের পর্যবেক্ষণ ও বিচারক্ষমতা কোনদিনই খুব একটা নীরোগ ও সম্পূর্ণ ছিল না, বরং ছিল নানা ধরনের কুহক ও বিভ্রম ও তাৎক্ষণিক আত্মস্বার্থ দ্বারা চালিত। এই কারণে মহত্ব কখনো অতিরঞ্জিত হয়েছে, অথবা জেনেশুনে কখনো অপাত্রে আরোপিত হয়েছে, অথবা মানবিক সুষমা ও সৌন্দর্য ও সম্পূর্ণতার পরিবর্তে, সমসাময়িক চাহিদা অনুযায়ী, মহত্ব-বিচারের মাপকাঠি ধরা হয়েছে অলৌকিকত্ব কি ক্ষমতা কি আপাত-অজেয় চাতুর্যশক্তি। একদা রোমানদের আদর্শ ছিল জুলিয়াস সিজর, গ্রীক বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ ছিল প্লেটো-এ্যারিস্টটল, আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ বার্ট্রাণ্ড রাসেল অথবা সার্ত্রে, সাম্যবাদী কমরেডদের কাছে মার্কস কি লেনিন কি মাও, মার্কিনীদের কাছে লিঙ্কন বা ওয়াশিংটন, কবিদের কাছে আদর্শ হলো গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়র—আবহমান ইতিহাসের প্রচ্ছদে এইরকম কত-যে অসংখ্য আদর্শ ছড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে ছিল, তার শেষ নেই। তাঁদের সম্মানিত অবস্থান নিয়ে তর্ক করা বাহুল্য, কারণ স্ব স্ব যোগ্যতাবলে এই গুণান্বিত পুরুষেরা-যে যথার্থই মানুষের সম্ভ্রম অর্জন করেছিলেন, এটা সত্য। কিন্তু সার্বিক বিচারে 'সর্বোত্তম' হওয়া-তো দূরের কথা, উত্তমই নন। চার্চিল ছিলেন কূটনৈতিক মিথ্যাচারে 'বিশ্ব ওস্তাদ,' রুজভেল্ট নিজে নিজের সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের শতকরা পঞ্চান্ন থেকে ষাট ভাগ ছিল ভুল। লেনিন ছিলেন নিষ্ঠুর, যাঁর আদর্শই ছিল নরহত্যা; মার্কস প্রতিভাবান কিন্তু পাগলাটে ও বাস্তব-জীবন-বিচ্ছিন্ন। আর মাও সে তুং? অনেক গুণের অধিকারী কিন্তু তিনি ছিলেন নির্বিচার বৈভববিলাসী ও নির্বিবেক নারী-নিপীড়ক। আব্রাহাম লিঙ্কন, সন্দেহ নেই একজন বড় মাপের মানুষ, কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁকে অতিশয় নগণ্য ও উপেক্ষার যোগ্য বলেই জ্ঞান করতেন। ঋষিপ্রতিম গান্ধী গভীর দুঃখের সঙ্গে এই স্বীকারোক্তি করেছেন, মৃত্যুপথযাত্রী জননীকে ফেলে তিনি অন্য কক্ষে সস্ত্রীক নিশিযাপনের তুচ্ছ আরামটুকু পরিহার করতে পারলেন না বলেই, তাঁর জননী তাঁর কোলে মাথা রেখে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন, তা হলো না। বার্ট্রান্ড রাসেল একজন শান্তিকামী ও অঙ্কবিদ ও দার্শনিক বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছিলেন আত্মসংযমে অক্ষম ও রিরংসু। গ্যেটে ছিলেন পদ-লিপ্সু ও রাজশক্তি-কেন্দ্রের যথাসম্ভব নিকটবর্তী থাকার চেষ্টায় একটি ঘূর্ণায়মান লাটিম। আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই মহাকবি ও দেবোপম, কিন্তু ছিলেন খুবই প্রচারব্যগ্র ও প্রজাপীড়ক। জগদ্বিখ্যাত কলম্বাস ছিলেন, মিথ্যাবাদী ও লোভী। জাহাজ থেকে যিনি প্রথম ভূমি দেখতে পাবেন, তার জন্য নির্ধারিত ছিল পুরস্কারস্বরূপ একটি বড় মসোহারা; কিন্তু সত্য সত্যই যিনি দেখেছিলেন, তাকে প্রতারণা করে কলম্বাস নিজে এই মাসোহারা

www.pathagar.com

আত্মসাৎ করেছিলেন। আর ক্যালেণ্ডার দেখে দেখে চন্দ্র কি সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করে সরলমনা রেড-ইণ্ডিয়ানদের কাছে তিনি-যে দেবতা সেজেছিলেন, সেই চালাকির কথা তো বহুবিদিত। বরং এ-তুলনায় কালোমানিক পেলে অনেক ভালো। তাঁকে একটি অর্ধমিনিটের বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণের জন্য একদা প্রস্তাব করা হয়েছিল। একটি সিগারেট কোম্পানীর হয়ে পেলে শুধু বলবেন, 'হায়! আমি পেলে এবং আমি ধূমপান করিনা, কারণ এটা আমার স্বাস্থ্য ও শিশুদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু আমি যদি ধূমপান করতাম তাহলে এই সিগারেটই খেতাম'। দশ মিলিয়ন ডলারের এই প্রস্তাব পেলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এবং মেরি টেলর, ফিলাডেলফিয়ার সেই অনিন্দ্যসুন্দরী রমনী, যাকে 'প্লেবয়' ধরনের একটি পত্রিকার প্রচ্ছদে ছবি দেবার জন্য, ল্যারি নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি টাকার অঙ্ক বাড়াতে বাড়াতে, শেষ পর্যন্ত দশ লক্ষ ডলার অফার করেও এই নারীকে রাজী করাতে ব্যর্থ হলো। কী অসাধারণ ও পূত চরিত্রের অধিকারিনী এই নারী। ডলারের কাছে সম্পূর্ণ খরিদ হয়ে-যাওয়া ক্রীতদাসরূপী আধুনিক পাশ্চাত্যবিশ্বের একেবারে বিপরীত মেরুতে দণ্ডায়মান এই মহীয়সী নারী সারা জগতের এক নি:শব্দ অহংকার। অথচ এর চেয়ে অনেক কম টাকায় ও তুচ্ছ কারণে বিক্রি হয়ে গেছে বহু পৃথিবীবিখ্যাত আদর্শবান পুরুষ। কম্যুনিষ্ট মেনিফেস্টোতে উল্লেখ আছে, টলস্টয় ছিলেন 'সাম্যবাদী' কিন্তু 'ফিউডাল সাম্যবাদী', অনেকটা ব্রেখটের মতই, যে-ব্রেখট বলতেন, আমি সাম্যবাদের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত বটে, কিন্তু এই ভক্তির কারণে আমি আমার বাড়ি ও গাড়ি হারাতে রাজী নই। ইতিহাসে মহামানবরূপে চিহ্নিত এক-একটি ব্যক্তির এই হলো উদাহরণ। কিন্তু এসব কোনো উদাহরণই অস্বাভাবিক নয়, বরং খুব স্বাভাবিক। আসলে যা বলতে চাই তা হলো, আমাদের জ্ঞাত ইতিহাসের পাতায় পাতায় যাঁরা মহামানবরূপে বৃত ও অভিনন্দিত, তাঁরা সবাই ছিলেন নানা দিকে নানারূপ স্ববিরোধিতা ও মানবিক দুর্বলতার স্বাভাবিক শিকার। বুদ্ধদেব 'নির্বাণ' লাভ করেছিলেন কিন্তু তা ছিল প্রকৃতপক্ষে জীবনের রূঢ়তা থেকে পলায়নপরতারই নামান্তর; এবং শ্রীচৈতন্যের 'সর্বপ্রেমের' প্রকৃষ্ট আহবান ছিল সত্যাসত্যের ব্যবধানলুপ্ত এক আপসকামী আপাতমধুর সমন্বয়ধর্মিতা। কনফুসিয়াসের শিক্ষা ও তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবন ছিল মোটামুটি উৎকৃষ্ট, কিন্তু তিনি ছিলেন নিতান্তই চীনা সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ এক ভাষ্যকার, যাঁর অবস্থান ছিল সর্বমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বহু দূরবর্তী। এবং এই কনফুসিয়াসের শিক্ষা তাঁর সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাবিধানে কিছু সাফল্য বয়ে আনলেও, সেই শিক্ষায় মানুষের ব্যক্তিজীবন খুব একটা আলোকিত হয় নি। এবং বহুবিখ্যাত সন্তপল (Saint Paul) সত্যই কতটা 'সন্ত' ছিলেন, তা তর্ক ও গবেষণাসাপেক্ষ, কিন্তু তিনি ছিলেন প্রশ্নাতীতভাবে চতুর। এবং এই সাধু যিনি জীবদ্দশায় ছিলেন যীশুখ্রীষ্টের প্রধানতম শত্রু, যীশুর পর তিনিই হয়ে গেলেন যীশুর 'স্বকণ্ঠ নির্দেশবলে' যীশুর প্রতিনিধি। তারপর 'যীশুকথিত বাণী'র এই নব ব্যাখ্যাকার

www.pathagar.com

সব নিষিদ্ধ বস্তুকে শুধু সিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হলেন না, সম্পূর্ণ অনুচিত ও অসম্ভব ও অবৈজ্ঞানিক এক তত্ত্ব 'Doctrine of Atonement' প্রায়শ্চিত্তবাদ উপহার দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেলেন। আবারও উল্লেখ করি, এ সব অস্বাভাবিক নয়, এই ধরনের বহু চাতুর্য মিথ্যা ও আত্মবিভক্তি, বহু ফাঁক ও ফাঁকি নিয়েই মানবচরিত্র। কোন 'মহামানবই' এমন নেই, যার বিকীর্ণ আলোকরশ্মির ভেতরে-বাইরে প্রকাশ্যে কি গোপনে ছড়িয়ে নেই কৃষ্ণবর্ণ কিছু কিছু মেঘপুঞ্জ। সর্বকালের ইতিহাসে কেবল একটিই ব্যতিক্রম, তিনি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)।

আল্লাহপাক তাঁকে বলেছেন 'সর্বোত্তম আদর্শ'। আগেই বলেছি, আল্লাহপাক যদি কোরআনপাকে এই উচ্চারণ থেকে বিরত থাকতেন, পৃথিবীর সরল ও সত্যপ্রিয় ও চক্ষুষ্মান মানুষ মহানবী (সাঃ)কে মানবাদর্শের 'সর্বোত্তম' নমুনা হিসেবেই স্বীকৃতি দিত। তাঁর পেশকৃত 'তওহিদবাদ' কি 'রেসালত' নিয়ে মতানৈক্য ঘটতে পারে, বক্রদৃষ্টিসম্পন্ন হতভাগ্যরা তাঁকে নবী বলে না মানতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসাবে তাঁর নিখাদ ও সর্বকালজয়ী সতত-সমুজ্জ্বল মহত্বকে সেকালের বা একালের বা কোন কালের কোন আবু জেহেলও একবাক্যে মেনে নিতে কোনরূপ দ্বিধা করবে না, করার কোন পথও নেই। নাজ্জাশীর দরবারে কাফেররা উপস্থিত হয়ে যখন মোহাম্মদ (সাঃ)এর দেশত্যাগী অনুসারীদেরকে তাদের হাতে প্রত্যর্পণের আরজু পেশ করলো, নাজ্জাশী জানতে চাইলেন, 'মোহাম্মদ লোকটা কেমন?' মোহাম্মদ (সাঃ)এর সর্বতোভাবে ক্ষতিসাধনে বদ্ধপরিকর এই কাফেরদের অন্তর শত্রুতার আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছে, কিন্তু নবী (সাঃ)এর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরাধিক কালের জীবন থেকে এমন একটি সামান্য ত্রুটিও তারা খুঁজে পেলো না, যা নাজ্জাশীর কাছে তুলে ধরা যায়। কাফেররা তাঁকে বুঝতে না পেরে অথবা অন্ধ একগুঁয়েমিবশত যাদুকর বলেছে, কবি বলেছে, ভূতে পাওয়া উন্মাদ বলেছে, কিন্তু কেউ কখনো বলেনি, তিনি মিথ্যাবাদী কি দুশ্চরিত্র অনির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী বা লোভী। তাঁকে হত্যা করবার জন্য বহু নিষ্ঠুর পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, কিন্তু এই নৃশংস দুশমনেরা কেউ বলে নি, মোহাম্মদ অসৎ বা দুষ্টপ্রকৃতির, হিংসুক বা স্বার্থপর বা কলহপ্রিয়। তাহলে ? প্রাণঘাতী শত্রুরাই যখন একটিও কোন দোষের কথা বলে না, বলতে পারে না, তখন আর সন্দেহ কি যে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম। হেরা পর্বতের গুহায় যেদিন প্রথম জিব্রাইল (আঃ)এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, ভয়ে-আতঙ্কে তিনি কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলেন ঘরে। এবং এসেই খাদীজা রাদীয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমি বোধ হয় বাঁচবো না'। সেই মুহূর্তে খাদীজা (রাঃ) তাঁকে অভয় দিয়ে কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, 'অসম্ভব, আল্লাহ আপনাকে কিছুতেই অসম্মানিত করবেন না এবং আপনার খ্যাতির যথোচিত প্রসার না ঘটিয়ে তুলেও নেবেন না। কারণ, মানবতার চরমোৎকর্ষের যে মূল সাতটি গুণ, তা সবই আপনার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আপনি আত্মীয়তার হক আদায়কারী, সর্বদা

www.pathagar.com

সত্যবাদী, পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী আমানতদার, অনাথ অক্ষম এতীম বিধবা প্রতিবন্ধীদের ভার বহনকারী, অভাবগ্রস্ত বেকারদের জন্য উপার্জনের ব্যবস্থাগ্রহণে সদাসচেষ্ট, অতিথিদের প্রতি যত্নবান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় দুঃস্থ মানুষের নিকটতম বন্ধু ও সাহায্যকারী, এতগুলি মানবিক গুণের পূর্ণতম বিকাশ ঘটেছে যাঁর চরিত্রে, কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহপাক তাঁকে অবশ্যই সাফল্য দান করবেন'। বলাই বাহুল্য, দীর্ঘ পনর বছরের একান্ত জীবনসঙ্গিনীর এই বক্তব্য। কে-না জানে, প্রকৃত রহস্য উন্মোচনে স্বামী প্রসঙ্গে স্ত্রীর সাক্ষ্যই হলো সর্বাপেক্ষা নির্ভুল ও অকাট্য; অতএব এই সাক্ষ্য থেকেও সন্দেহবাদীরা অনুমান করতে পারে মোহাম্মদ (সাঃ) কেমন ছিলেন, কী অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তিনি। অথচ নবী (সাঃ)এর এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য যখন সর্বমান্য ও সর্বগ্রাহ্যরূপে মক্কাবাসীদের কাছে একটি অবিসংবাদিত সত্য, একটি পরম গৌরবের বস্তু, তিনি তখনো নবী হন নি; অন্তত লোকসমক্ষে এবং তাঁর নিজের কাছেও নবুয়তের বিষয়টি তখনো লুক্কায়িত ও অজ্ঞাত ও অঘোষিত। অতএব নবুয়তপূর্ব জীবনেই যিনি পূত-পবিত্র ও ত্রুটিহীন ও কলঙ্কশূন্য এক সর্বজনস্বীকৃত মহান চরিত্রের অধিকারী, তাঁর কিঞ্চিদধিক বাইশ বছরের নবুয়তি-জিন্দিগীর মহত্ব নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সব নবী রাসুলই নিষ্পাপ ও সর্বপ্রকার মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত। কারণ যাই হোক, তাঁদের প্রকৃতিই এমন যে, কোনো পাপ কি অন্ধকার তাঁদেরকে স্পর্শই করতে পারে না। ইতিহাসবিশ্রুত মহামানবদের সঙ্গে নবী রাসূলদের একটি বড় প্রভেদ হলো, অন্যেরা দু'একটি বিশেষ দিকে কিছুটা আলোকোজ্জ্বল বটে কিন্তু তাঁদের জীবনের বাকি অংশে তাঁরা খুবই সাধারণ। অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, এতদসঙ্গে আরো দু'একটি উল্লেখ করতে পারি। সিজার ছিলেন প্রজাবৎসল, বীরও ছিলেন, অথচ আততায়ীর হাতে নিহত হবার বহু আগেই আত্মজয়ে অক্ষম এই বীর ধরাশায়ী হয়েছিলেন ক্লিওপেট্রার মোহিনী শরবর্ষণে। এ্যান্টনীও একই রকম, গ্লানিদগ্ধ এই বীরপুরুষ জীবনের সঙ্গে রণে ভঙ্গ দিয়ে ক্লিওপেট্রার উচ্ছিষ্ট যৌবনের মদির পেয়ালায় হাবুডুবু খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিলেন। আর একালের মহামতি আইনস্টাইন মস্তিষ্কচর্চায় মেধাবী ও বাহ্যত মানবপ্রেমী বটে, কিন্ত মানুষটি প্রকৃতপক্ষে দায়িত্বহীন ও আপন খেয়ালের হাতে স্বেচ্ছাসমর্পিত এক 'নকল ভালোমানুষ'। এবং এই কারণেই তাঁর বিশেষ-অনুরাগী জীবনীলেখকদেরও সংশয় জাগে যে, তাঁর সারল্য সম্ভবত অকৃত্রিম নয়, এই সারল্য লোকসমক্ষে উপস্থাপনকল্পে একটি প্রস্তুত নাটক। এই হেতু যেখানে অভিনয় করবার কি সতর্ক ছদ্মবেশ ধারণের সুযোগ ছিল না, সেখানেই ধরা পড়ে গেছেন এই মহামানব। পরিত্যক্ত প্রথমাকে অর্থদানে 'বাধিত' করা ও অতি-তরুণী দ্বিতীয়াকে সর্বস্ব সমর্পণ, কোনটাই মহামানবোচিত নয়। আইনস্টাইন আণবিক বোমার মর্মান্তিক ধ্বংসক্ষমতাদৃষ্টে 'খুবই' দু:খ পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু এই বোমানির্মাণের জরুরি অনুরোধ জানিয়ে রুজভেল্টকে যিনি প্রথম চিঠি লিখেছিলেন, তিনি আইনস্টাইন। এবং এই মহামানব

www.pathagar.com

ছিলেন এতটাই নিপুণ ও অক্লান্ত 'সুরসিক' যে, কৌতুকবর্ষণে তিনি স্থানকালপাত্র জ্ঞানকে খুব কমই বিবেচনায় আনতেন, যে কারণে তাঁর কৌতুক মাঝে মাঝেই অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতার জন্ম দিতো। তাঁকে একদা কোন এক দু:স্থ সঙ্গীতজ্ঞ আর্থিক কষ্টের কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন; আইনস্টাইন প্রত্যুত্তরে তাঁকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন ও খবরের কাগজ না-পড়ার 'সদুপদেশ' দিয়েই 'মহান' দায়িত্ব সম্পাদন করেন। কিন্তু নবী রাসূলদের জীবনের সংগঠনই আলাদা। তাঁদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়, শরীর ও শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাঁদের অভিপ্রায় স্বপ্ন ও কথা ও কল্পনা, সবকিছুই অকল্পনীয়রূপে সৎ ও পবিত্র এবং চূড়ান্ত ঔচিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য নবীরা অবশ্যই এক একজন সাহসী যোদ্ধা, কিন্তু তাঁরা কেউই এতটুকু নৃশংস হতে পারেন না; তাঁদের সমগ্র চেতনায় সর্বক্ষণ জড়িয়ে থাকে মুগ্ধতা ও সৌন্দর্যবোধ, কিন্তু কণামাত্র অশ্লীলতার কোন আভাস মেলে না। প্রেম ও স্নেহে নবীদের অন্তর সর্বদায়ই কুসুমের চেয়ে কোমল, ক্ষমা ও ঔদার্যে ভরপুর, কিন্তু সত্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় তাঁদের ভূমিকা সামান্যতম শৈথিল্য কি দুর্বলতা দ্বারাও এতটুকু বিচলিত হয় না। মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন এই পূত-চরিত্রের উৎকর্ষতা যে কী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা বস্তুতই কল্পনাতীত।

কথার শেষ নেই, শেষ হবারও কথা নয়, কারণ অনন্তকাল ধরে বর্ণনা করলেও এই বর্ণনার শেষ হবে না। এইজন্যই আল্লাহপাক সংক্ষিপ্ত ও চূড়ান্ত কিছু বিশেষণ সহযোগে মানব সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে দিয়েছেন, অনন্ত মহাশূন্যের মত অনন্ত মহত্বের শুভ্রতম ও সততোজ্জ্বল এক দীপাধার এই মোহাম্মদ (সাঃ)। সত্যই মহানবী (সাঃ)-এর গুণগত উৎকর্ষতা এমন উচ্চতম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌচেছিল, যা যে-কোন মানুষের ধারণা ও কল্পনারও অতীত। যখন দেখি তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে কণামাত্র অসংগতি নেই, নেই এতটুকু স্ববিরোধিতা, যখন দেখি পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জগতের বিশাল প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে যে আদেশ নির্দেশ ভয় ও নিষেধ ও দায়িত্বের কথা তিনি বলেন, তিনি নিজে সেই উচ্চারণের পরিপূর্ণতম নিখুঁত প্রতিকৃতি, তখন আর বুঝতে কষ্ট হয় না, আল্লাহপাক কর্তৃক বিঘোষিত বিশেষণসমূহ কী অমোঘ! পবিত্র কোরআন শরীফে যত কথা আছে, মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন তার প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের এক নির্ভুল অবয়ব। তাঁর তেষট্টি বছরের যে নাতিদীর্ঘ পার্থিব জীবন, পবিত্র হাদীস গ্রন্থসমূহ সেই জীবনের এক অতি বিশ্বস্ত দর্পণ; ক্ষুদ্র বৃহৎ খুঁটিনাটি সব কথা ও কাজের একটি হুবহু লেখ্যরূপ। এই হাদীস শরীফ থেকে এটা প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত, জীবনের যে-কোন বিষয়ে তিনিই উৎকৃষ্টতম নমুনা। কোন একটি বিষয়েও তাঁর পেশকৃত নিয়ম ও নির্দেশের চেয়ে উৎকৃষ্টতম কিছু হয়, তা ভাবাই যায় না। মানুষ স্বভাবতই বড় অগভীর ও সত্যমিথ্যা সম্পর্কে উদাসীন এবং প্রায় সততই চিত্ততারল্য ও ছেলেমানুষি তর্কপ্রবণতা দ্বারা চালিত; ফলে অনেক মানুষই তাঁকে চিনতে পারছে না, অনেক মানুষ তাঁকে চিনেও চিনতে পারছে না। অথচ আদৌ বেগ পাবার কথা নয়, নবী মোহাম্মদ (সাঃ) যে-কী

www.pathagar.com

বিশাল মহিমা ও মহত্ব ও পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন, তা খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়। এমন মানুষ কি পৃথিবী কখনো দেখেছে, যে-কোন বিষয়ে যাঁর এক-একটি কথাই কোটি কোটি অনুসারীর জন্য সর্বকালোপযোগী এক-একটি অবশ্যমান্য অপরিবর্তনীয় আইন। একটি মানুষ সত্যই কী অভাবিত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হলে এটা সম্ভব যে, বাথরুম থেকে যুদ্ধক্ষেত্র, মেহমানদারি থেকে রাষ্ট্রপরিচালনার উচ্চতম দফতর পর্যন্ত তিনি যে-বিষয়ে যা বলেছেন তাই-ই অকাট্য। নিদ্রায় কি জাগরণে বিশ্রাম কি সফরে সজনে বিজনে গৃহে কি মসজিদে, সংকটে সাফল্যে, তিনি যা-করেছেন যেভাবে করেছেন, যা বলেছেন, যেটুকু বলেছেন, তা সবই চিরদিনের জন্য চূড়ান্ত হয়ে গেল। অথচ কত কংগ্রেস, কত মনীষী-সমন্বিত উর্বর পার্লামেন্ট কত কত আইন ও ধারা ও উপধারা তৈরী করেছে, কিন্তু সম্মিলিত মেধা ও প্রজ্ঞাপ্রসূত সেই আইন কোনটাই বেশিদিন স্থায়ী হয় নি, পুনঃ পুনঃ বর্জন ও সংশোধন ও পরিমার্জনই হলো এই সব আইনের স্বাভাবিক নিয়তি ও পরিণতি। অথচ কী বিস্ময়কর, খেজুরপাতার ছাউনি দেয়া একটি জীর্ণ মসজিদ বা ততোধিক জীর্ণ একটি অপরিসর বাসগৃহ বা যখন যেখানে আছেন, সেখান থেকে একেবারেই অক্ষর-পরিচয়হীন একটি মানুষ যা-বললেন, তাই হয়ে গেল সর্বকালের সকল মানুষের জন্য এক অক্ষয় ও চিরন্তন ঐশ্বর্য। শুনতে যাই হোক এটা সত্য, নবী (সাঃ)এর শেখানো, এমনকি বাথরুম প্রবেশের একটি 'দোয়া'ও অত্যাবশ্যক বিবেচনায় কোটি কোটি মুসলমান যেভাবে হাজার হাজার বছর ধরে পাঠ করে আসছে ও করবে, সেই স্থায়িত্বের একটি ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ অর্জনও যে-কোন অমরত্বলিপ্সু মহাকবির কোন শ্রেষ্ঠতম পংক্তির পক্ষে অসম্ভব।

শত মনীষীর জীবন নিয়ে মাইকেল হার্ট একটি বই লিখেছেন। এই বইয়ে যথোচিতভাবেই মহানবী (সাঃ)কে এক নম্বরে স্থান দেয়া হয়েছে। এই সততা ও ঋজু-সত্যপ্রীতি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু নির্বাচিত মনীষীদের স্থান-নির্ধারণে লেখকের একমাত্র বিবেচ্য ছিল 'প্রভাব'। লেখকের দৃষ্টি যদি নিবদ্ধ হতো, শুধু প্রভাব কি অবদান নয়, মানবিক মহত্ব ও সৌন্দর্যের উপর, তাহলে মাইকেল হার্ট নিশ্চয়ই অন্যরকম ভাবতেন। অনুমান করি, হার্ট তাঁর প্রকাশককে সম্মত করে এমন একটি গ্রন্থ উপহার দিতেন, যার প্রথমে থাকতো মহানবী (সাঃ)এর কথা এবং তারপর কিছু পৃষ্ঠা সাদা ও শূন্য রেখে শুরু হতো অন্য মনীষীদের জীবনী। এবং ওই অপরিহার্য শুভ্র-শূন্য পৃষ্ঠাগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হার্ট লিখে দিতেন—এটা প্রতীকী, আসলে সৌন্দর্য শুভ্রতা ও পবিত্রতার প্রশ্নে মোহাম্মদ (সাঃ)এর এত বিপুল পশ্চাতে অন্য যে-কোন মহামানবের কুণ্ঠিত অবস্থান যে, ন্যায় ও সত্যের খাতিরে কোন মনীষীকেই তাঁর সংলগ্ন করা সমীচীন নয়, মধ্যবর্তী সাদা পৃষ্ঠাসমূহ এই সত্যেরই একটি প্রতীকী অভিব্যক্তি।

মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন বিশ্বজগতের আশীর্বাদ; পবিত্র কোরআনের ভাষায়

www.pathagar.com

'ওয়ামা আরসালনাকা ইল্‌লা রাহমাতাল্লিল আলামীন' 'আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে'; এক বর্ণ এদিক-ওদিক নয়, একেবারে শতকরা একশ' ভাগ খাঁটি এই পরিচয়। তাঁর সস্নেহ দৃষ্টি এমন সর্বব্যাপী ও সজাগ ছিল যে, একটি শীর্ণ ক্ষুধার্ত উট দেখলেও তার মালিককে তিনি দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন; সবাইকে কঠিনভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন–উট ঘোড়া যাই হোক, কোন বাহনের উপরই যেন তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপানো না হয়, অপ্রয়োজনে গাছের একটি পাতা ছেঁড়াও নিষিদ্ধ। একটি দুটি নয়, এইরকম বহু তথ্য থেকে এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, শুধু মানুষ নয়, মানুষ তো বটেই, পশু-পতঙ্গ বৃক্ষলতা সবদিকেই তাঁর প্রেম ও মমতা ছিল স্বতোৎসারিত ও সদাজাগরুক। এবং কী অনুপম ও অব্যর্থ এই প্রেম ও প্রেমের সঞ্চরণ, যা কেবল তাঁর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, তাঁর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অনুসারীর মধ্য দিয়ে এক প্রবহমান নদীর মত বয়ে চলেছে সেই প্রেম কাল থেকে কালান্তরে। পৃথিবীর বয়স কম হলো না, পৃথিবী তার দীর্ঘজীবনে অসংখ্য মহামানবকে দেখেছে। কিন্তু প্রেমে বীরত্বে, বিনয়ে ঔদার্যে, সততা শুদ্ধতা ও শ্লীলতায়, ত্যাগে ও মহানুভবতায়, ত্রুটিহীন বিচার ও বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণে, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর সর্বগুণান্বিত নিখুঁত একটি মানুষ ছিল পৃথিবীর এমনকি ধারণারও অতীত। এইজন্যই সম্রাট নাজ্জাশী তাঁকে না-দেখেও সবচিত্তমথিত শ্রদ্ধা ও আনুগত্য নিয়ে সমর্পণ করেছিলেন নিজেকে; আর প্রবল প্রতাপান্বিত হিরাক্লিয়াস তাঁর অন্তর্নিহিত রূপান্তর ও চাঞ্চল্যকে গোপন করেছিলেন সত্য, কিন্তু সে-কেবল রাজ-অমাত্যদের প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের আশঙ্কায়। আসলে মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন পূর্ণ ভৈবে সতত দীপ্যমান এক সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। মানব ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের খুব একটা অভাব নেই, কিন্তু সকল জ্যোতিষ্ক সঠিক অর্থে খুবই ক্ষীণপ্রভ খুবই নিষ্কিরণ; এবং বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, তাঁদের আলো দ্বারা অন্যেরা বিশেষ আলোকিতও হয় নি। এক ধরনের পার্থিব মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে, ভক্ত ও অনুসারীবৃন্দ তাঁদেরকে পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করেছে মাত্র। অথচ মহানবী (সাঃ) ছিলেন এমন এক আলোর অধিকারী, যাঁর সংস্পর্শে আসা-মাত্রই সব অন্ধকারকে পরাভূত করে মানুষের চৈতন্য জেগে উঠতো এক অনি:শেষ প্রভায়। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত উমার ফারুক (রাঃ)সহ লক্ষ লক্ষ সাহাবীর জীবনচিত্র এর প্রমাণ। জিদ বা অন্ধত্ববশত যে যাই বলুক, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভ্রভেদী এই বিশ্ব কি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম যে, তার শত শত মনীষীসমৃদ্ধ হার্ভার্ড ও অক্সফোর্ড ও হাজার হাজার সমৃদ্ধ লাইব্রেরীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একজন অতি সাধারণ সাহাবীর সমতুল্য মানবিক গুণসম্পন্ন সৎ ও চরিত্রবান একটি মানুষও গড়ে তুলতে পারে। পারে না, পারা সম্ভবই নয়; কারণ সাহাবীরা ছিলেন মোহাম্মদ (সাঃ) নামক এক নিষ্কলঙ্ক দীপাধার থেকে আলোকিত ও প্রজ্জ্বলিত এক-একটি প্রকৃত নক্ষত্র। সে তুলনায় আধুনিক ও পৌরাণিক বহু আলোকবর্তিকা নিতান্তই হঠাৎ ও দ্রুত জ্বলে-ওঠা এবং ততোধিক দ্রুত নিভে-যাওয়া

www.pathagar.com

এক-একটি উল্কা মাত্র। অথচ সাহাবীরা-তো বটেই, এমনকি তাবেয়ীন তাবে-তাবেয়ীন সবাই ছিলেন ক্ষুদ্রবৃহৎ এক-একটি আসল জ্যোতিষ্ক। বলার অপেক্ষা রাখে না, কোন্ বিশেষ নীহারিকা থেকে এই সকল জ্যোতিষ্কের জন্ম, তিনি নবী মোহাম্মদ (সাঃ)। এবং এই নবী (সাঃ)এর চরিত্রমহিমা থেকে বিচ্ছুরিত আলোর স্বরূপই আলাদা, যে- কারণে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোকরশ্মি নিঃশেষ কি নিষ্প্রভ হয়ে যায় নি; আল্লাহপাক এমন অক্ষয়ভাবে সংরক্ষণ করেছেন যে, রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত এই আলো বিকীর্ণ হতেই থাকবে। বধির ও জন্মান্ধেরা যাই বলুক, এটা কোন ভক্তের অত্যুক্তি নয়, এটা সর্বকালীন শাশ্বত বাস্তবতা। আশ্চর্য নয় কি যে, এই পৃথিবীতে এমন একটি মুহূর্ত নেই, একটি স্থান নেই, যেখানে মহানবী (সাঃ)এর পবিত্র নাম কোটি কোটি কণ্ঠে সর্বাধিক শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে সরবে-নীরবে উচ্চারিত না-হচ্ছে। আল্লাহপাক অবশ্য কোরআন শরীফে দ্ব্যর্থহীনভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী আগেই করেছেন, 'সুউচ্চে তুলে ধরা হয়েছে আপনার নাম'। পৃথিবীর মানুষ আজ হতবাক হয়ে দেখছে, একজন মানুষের 'পরিণতি' সত্যই কী সীমাহীন উজ্জ্বলতা ও 'নাম' কী অপরিমেয় উচ্চতা লাভ করতে পারে! এবং এই ঔজ্জ্বল্য ও নাম কী অবিনশ্বর তাও দেখছে। এবং দেখছে, মোহাম্মদ (সাঃ) তো বটেই, এমনকি তাঁকে নিয়েও সপ্রেম অনুরাগে যাঁরা যেটুকু লিখেছেন, সেই রচনাও তাঁরই নামের মহিমায় আল্লাহপাকের অভিপ্রায়ে চিরকালের জন্য এমন স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করলো, যে-অনুরণন কখনো থেমে যাবে না। সেখ সাদী (রঃ)এর 'বালাগালউলা বি কামালিহি' না'তটি এর প্রমাণ। মাত্র চারটি পংক্তি অথচ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু এই চতুর্পদী না'তটি বেঁচে থাকবে চিরদিন চিরকাল। পূর্ণতম শুদ্ধতা ও পবিত্রতা ও সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত নাহলে কি এই অসম্ভব সাফল্য লাভ করা সম্ভব!

এইজন্যই কোন গবেষক যদি পৃথিবীর সব অভিধান তন্ন তন্ন করে খুঁজে দুটি তালিকা প্রস্তুত করেন-একটি ত্রুটি ও কলঙ্কের, অপরটি গুণ ও সৌন্দর্য ও সততার, তাহলে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষায় তিনি দেখতে পাবেন মহানবী (সাঃ)এর মধ্যে তালিকাভুক্ত একটি ত্রুটিও নেই; এবং বহু পরিশ্রমে প্রস্তুতকৃত তালিকায় এমন কোন গুণই নেই, যা মোহাম্মদ (সাঃ)এর মধ্যে অনুপস্থিত। অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রকার ত্রুটি ও ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত এক সর্বগুণান্বিত সর্বোৎকৃষ্ট ও ধারণাতীত সৌন্দর্যের অধিকারী সর্বোত্তম সুন্দরতম মানুষ। এইজন্যই ব্লাসফীমি আইনের খুব একটা আবশ্যকতা নেই। নেই এইজন্য যে, হাজার হাজার বছরের মানববংশে এমন কোন মহামানবের সাক্ষাৎ কি এই পৃথিবী কখনো পেয়েছে যিনি বলতে পারেন বা পারতেন,—তোমরা আমার সম্পর্কে যা জানো, গোপন কি প্রকাশ্য, সবকিছু সবাইকে জানিয়ে দিও। কণামাত্র কোন ত্রুটি থাকলেও কি এভাবে বলা যায়? অতএব এমন পরম পবিত্র মহাব্যক্তিত্বের সুরক্ষার জন্য কোন আইনের প্রয়োজন পড়ে না। যারা মহানবী (সাঃ)এর উপর স্বকপোলকল্পিত উদ্দেশ্যমূলক কলংক লেপন করে কথা বলে, ইবলিসের সেই শিষ্য-প্রশিষ্যদের কাজই

www.pathagar.com

হলো সত্য ও সুষমার বিরুদ্ধে তৎপরতা অব্যাহত রাখা। তারা নিন্দুক নয়, তারা মিথ্যাবাদী তস্কর কি জালিয়াতদের যে আইনে বিচার হয়, এই মিথ্যাবাদীরা সেই আইনেরই আওতাধীন। এই মিথ্যাবাদীরা কিসের ক্রীতদাস কাদের ক্রীতদাস তারাই জানে। এবং বলা বস্তুতই বড় দুরূহ, কেবল আল্লাহপাক জানেন, নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে এই মূঢ় মিথ্যাচারিতার। অবশ্য এ-নিয়ে আমাদের কোন কৌতূহল নেই; শুধু দুঃখ হয় এই ভেবে যে, সত্য ও সুন্দরের বিপরীতে কত মানুষ কত শস্তায়ই-না একেবারে পানির দামে বিক্রয় হয়ে গেল!

www.pathagar.com

মোহাম্মদ (সাঃ) নবী ও বিশ্বনবী

সব দেশে সব ভাষাতেই মহানবী (সাঃ)কে নিয়ে এত অসংখ্য পুস্তক রচিত হয়েছে যে, সেই বিপুল গ্রন্থরাজি সর্বকালীন পৃথিবীর এক অপরাজেয় রেকর্ড ও বিস্ময়। কিন্তু চৌদ্দশতাধিক বৎসরের এই ক্রমাগত আলোচনার পরেও মনে হয়, মহানবী (সাঃ)কে নিয়ে এতদিনের এই সমগ্র আলোচনা-সমষ্টি একটি মুখবন্ধ মাত্র, প্রকৃত আলোচনা এখনো শুরুই হয় নি। এ-রকম যে মনে হয় তার কারণ, নবী মোহাম্মদ (সাঃ)কে নিয়ে মানুষের ভাবনা ও প্রেম ক্রমশ বেড়েই চলেছে, মানুষের চিন্তা ও গবেষনা ও রচনা শত বৈরিতার মধ্যেও আরো তীব্র আরো বেগবান হয়ে উঠছে। সত্যই কী মনোরম এই দৃশ্য, এমন কোন দেশ কি সমাজ কি ভাষা নেই, যেখানে এই মহামানবকে সামনে রেখে নি:স্বার্থ আলোচনার এক নির্মল প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে না! অর্থাৎ কিছু মানুষ বা অনেক মানুষ যতই অনীহ কি পরান্মুখ হোক, মহানবী (সা:)এর জীবন ও চরিত্র ও আদর্শ, সর্বদেশ ও কালে পরিব্যাপ্ত সমগ্র মানববংশের জন্যই এক শাশ্বত সম্পদ। কেউ তাঁকে অস্বীকার করে স্বকপোলকল্পিত স্বল্পায়ু 'সুখস্বর্গ' রচনা করতে পারে, কিন্তু মানবগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণের প্রেক্ষাপটে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের অপরিহার্যতা চিরদিন একইভাবে অটুট ও উজ্জ্বল। সময় বদলে যায়, ভাষা বদলে যায়, বদলে যায় দেশের ভৌগোলিক সীমরেখা, বার বার পরিবর্তিত হয় পৃথিবীর রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বিন্যাস, কিন্তু মহানবী (সা:)এর জীবন ও আদর্শের কার্যকারিতা কণামাত্র হ্রাস পায় না, বরং দিন-বদলের সাথে সাথে আরো বেশি চূড়ান্তরূপে অনুভূত হয় তাঁর অপরিহার্যতা, এবং সকল রোগের চূড়ান্ত প্রতিষেধক হিসেবে ধরা পড়ে এই মহামানবের কথা ও কাজ ও মানবকল্যাণ কার্যক্রমের বাস্তব উদাহরণ। প্রকৃতপক্ষে এইজন্যই তিনি বিশ্বনবী, এইজন্যই সতত সমভাবে ফলপ্রসূ এক অপরিহার্য আদর্শ ও জীবনবিধানের রূপকার তিনি শেষ নবী; এবং এইজন্যই তিনি বিশ্বজগতের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ প্রেরিত এক অত্যুত্তম আদর্শের আধার, আগত অনাগত সকল সংকটের তিনি অব্যর্থ প্রতিষেধক। যারা তাঁকে অস্বীকার করে এবং অস্বীকার করার মধ্যেই দেখতে পায় আধুনিক পৃথিবীর স্বাস্থ্যরক্ষা, তারা মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত। একদল, তারা সত্যের প্রতিশ্রুত শত্রু, তারা কেউ সম্পূর্ণ জেনেশুনে মার্লো-চিত্রিত ডক্টর ফস্টাসের মত ইবলিসের কাছে স্বেচ্ছায় খরিদ হয়ে যাওয়া পণ্য, কেউ-বা আপন মুখরক্ষার্থে আবু জেহেলদের ভূমিকায় অবতীর্ণ খলনায়ক। এবং অপরদল কিছুই না-জেনে মিথ্যা ও অন্ধকার ও কুহকের হাতে বন্দী ও শৃঙ্খলিত এক অতি অবোধ বালক-সম্প্রদায়। এই বালকদের ব্যাধি ও অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু বটে, কিন্তু তাদের মেজাজ ও মস্তিষ্ক নানা ধরনের উৎপাতে এমন বক্র ও বিদ্বিষ্ট ও ভারাক্রান্ত যে, তাদের পক্ষে নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব, কোন্‌টা পুষ্প আর

www.pathagar.com

কোন্‌টা পুষ্পবেশী পতঙ্গশিকারী বর্ণময় ফাঁদ। দরিদ্রবিশ্বে এই বালকেরা কেউ অতি-উদার বুদ্ধিজীবী, কেউ 'সংস্কারমুক্ত নিরপেক্ষ মানবদরদে উদ্দীপিত স্বাপ্নিক', কেউ-বা নতুন এক বিশ্বরচনার উন্মাদনায় অতিবিপ্লবী। কিন্তু প্রকৃত পরিচয় হলো, দেশ বা দূরদেশে অবস্থানরত কোন-না-কোন প্রভুর অভিপ্রায়লালিত এরা এক-একজন বশংবদ ক্রীতদাস। কোন সন্দেহ নেই, ইসলাম আজ অনেক দেশ ও অনেক মানুষের দিবারাত্রির দুঃস্বপ্ন। এবং মোহাম্মদ (সাঃ) যেহেতু ইসলামেরই পূর্ণতম মানবিক রূপ, মোহাম্মদ (সাঃ)কে না-চেনা ও তাঁর আদর্শকে সর্বপ্রযত্নে আড়াল করাই এই বিক্রীত বালক-সম্প্রদায় ও তার প্রভুদের সর্বপ্রধান 'কর্তব্যকর্ম'।

মহানবী (সাঃ)কে মুহূর্তমধ্যে চিনতে পেরেছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), না-দেখেও চিনেছিলেন নাজ্জাশী, হিরাক্লিয়াস, কিন্তু খসরু চিনতে পারে নি। আপন পিতৃব্য আবু লাহাব ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু বহু-দূরাগত বহু সংকটে পোড়-খাওয়া হযরত সালমান ফারসি (রাঃ) প্রথম দর্শনেই চিনে নিয়েছিলেন। বুঝা যায়, সৌন্দর্যকে সত্যকে চেনা ও গ্রহণ করার সৌভাগ্য সকলের হয় না। আধুনিক পৃথিবীর একটা বড় বদনসীব যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েও তার বোধোদয় ঘটলো না। বিশ্বের পণ্ডিতেরা গবেষণার বহু বিজ্ঞানসম্মত পন্থা ও প্রক্রিয়া তৈরী করেছেন, যা-থেকে একটি নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হয় না। কিন্তু সত্যানুসন্ধানের এই পন্থা ও প্রক্রিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ও তাদের প্রাচ্যদেশীয় ভাবশিষ্যেরা ইসলামের ক্ষেত্রে খুব কমই ব্যবহার করেন। করেন-না তার কারণ, তাঁরা দূষিত আবেগ ও অতি তুচ্ছ স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত হতে ভালোবাসে ও সত্যকে তাঁরা ভয় পান। বিশ্বকাঁপানো বিটল্‌স দলের অধিনায়ক জন লেনন পাশ্চাত্য-মানসতার এই ভয়াবহ শূন্যতার কথা ভেবে এইজন্যই একদা বলেছিলেন, যখন খ্যাতি ও ঐশ্বর্য আকাশ থেকে বৃষ্টির মত ঝরে পড়ে, তখন এটা বলা অত্যন্ত কঠিন যে, আমি রাজা হতে চাইনা, আমি সত্যকে চাই। জন লেনন কথিত এই দুরারোগ্য অক্ষমতাও একটি হেতু, যে-কারণে আধুনিক পৃথিবী আজ মহানবী (সাঃ)কে চিনেও না-চেনার ভান করছে, জেনেশুনেও সর্বশক্তি নিয়ে রচনা করছে প্রতিরোধ। মোহাম্মদ (সাঃ)এর মহিমা ও মহত্ব শুধু তর্কাতীত নয়, তুলনারহিত। পারলৌকিক প্রশ্ন, জিব্রাইল (আঃ)–বাহিত তাঁর কাছে নাজিলকৃত কোরআন ইত্যাদি বিষয় কেউ যদি অস্বীকারও করে, শুধু জাগতিক মানদণ্ডেই এটা নিরঙ্কুশভাবে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত যে, দশ হাজার বছরের এই আবহমান মানববংশে তিনিই শ্রেষ্ঠতম, তিনিই সুন্দরতম। বৈজ্ঞানিকেরা মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সূর্যেরও কলঙ্ক আছে, চাঁদের-তো আছেই; কিন্তু সুপার-এ্যাটমিক অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এটা আবিষ্কার করা অসম্ভব যে, মোহাম্মদ (সাঃ)এর চরিত্রে একটিও কোন খুঁত কি ত্রুটি কি অসংগতি ছিল। উল্লেখ করেছি যে, তিনি তুলনারহিত; তবু দু'টি বিশেষ মুজিযা-র প্রেক্ষাপটে কিছু প্রতিতুলনার অবতারণা করতে চাই; হয়ত এ-থেকে মোহাম্মদ (সাঃ)এর

www.pathagar.com

অনন্যতা সম্পর্কে জন্মান্ধরাও কিছু ধারণা করতে সক্ষম হবে।

সারা পৃথিবীর আবহমান ইতিহাস থেকে এমন একটি দৃষ্টান্তও কি উপস্থাপন করা সম্ভব, যে-ব্যক্তির দশম কি অষ্টম উর্ধতন অবস্থান থেকে পুরুষানুক্রমিক পরিচয় অক্ষত আছে। নেই, সক্রেটিস প্লেটো এ্যারিস্টটল, নিউটন গ্যালিলিও আইনস্টাইনসহ প্রাচীন ও আধুনিক জগতের সকল মনীষীরই পূর্বপুরুষদের নাম-পরিচয় নিঃশেষে অবলুপ্ত। এমনকি একেবারে কাছের মানুষ আমাদের অতিপ্রিয় রবীন্দ্রনাথেরও প্রপিতামহ পর্যন্ত উঠতে পারি, তদূর্ধে গাঢ় থেকে গাঢ় অন্ধকার। এবং এত-যে বিখ্যাত লালন ফকির, তিনি লোকটি কী ছিলেন, হিন্দু না মুসলমান, সেই রহস্যই এখনো অবগুণ্ঠিত। আর জগদ্বিখ্যাত শেক্সপিয়রকে নিয়ে তর্কের তো কোন শেষই নেই; শেক্সপীয়রই আসল শেক্সপীয়র, নাকি নেপথ্যে কোন আত্মগোপনতালিস্মু অমাত্য বা যুবরাজই আসল, এই সমস্যা বহু শেক্সপীয়র-বিশেষজ্ঞকে এখনো ব্যাকুল করে তোলে। অথচ কী বিস্ময়কর, মহানবী (সাঃ)এর বংশপঞ্জী কোন্ সুদূরকাল থেকে উজ্জ্বল ও অক্ষয়! পৌত্তলিক ও পুরোহিত আজরের পুত্র হজরত ইব্রাহীম (আঃ)এর আবির্ভাব সেই খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে, সেই থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে নেমে এসেছে মোহাম্মদ সাঃ)এর পুরুষানুক্রমিক বংশলতিকা। আশ্চর্যই বটে, সমগ্র মানবকুলে এই একটিই মাত্র ব্যতিক্রম, পূর্বাপর বংশধারায় যেখানে কোন ছেদ নেই। কিন্তু বংশপরিচিতির এই অলৌকিক সুরক্ষা সম্ভব হলো কী করে? হলো এই কারণে যে, এটা আল্লাহপাকের অভিপ্রায়। আল্লাহপাক চেয়েছেন তাঁর প্রিয়তম হাবীব, পৃথিবীর জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠতম উপহার, এই মনোনীত মানুষটির পূর্বাপর বংশধারা পৃথিবীর কণ্ঠে মুক্তোমালার মত উজ্জ্বল অবিকৃতরূপে শোভা পাক, এবং তাই-ই পাচ্ছে। বিনীত চিন্তাশীলদের জন্য এ-এক অবশ্যই চূড়ান্ত শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ।

পৃথিবীতে ধর্মের অভাব নেই; কিন্তু সেই সকল ধর্মের অনুসারীরাই বলুক, তাদের ধর্মপ্রবর্তক বা ধর্মগুরুদের সম্পর্কে সত্যই কতটুকু তারা জানে। এবং যেটুকু জানে, বলাই বাহুল্য, তা অতি অল্পই নির্ভরযোগ্য এবং অতি অল্পই অবিমিশ্র তথ্যভিত্তিক। সত্য যে, বেদ একটি বহুবিখ্যাত ও বহুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু কেউ কি জানে, কে বা কতজন রচনা করেছেন এই গ্রন্থ? কী তাঁদের নাম, সঠিক কোন্ সময়ে তাঁদের আবির্ভাব? ব্যাসদেবের কথা যদিও আসে কিন্তু তিনি মূল রচয়িতা নন, শ্রুতিলেখক মাত্র। এবং এই ব্যাসদেব সম্পর্কেও কোন চতুর্বেদী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও প্রায় কিছুই জানে না। কনফুসিয়াস সম্পর্কে একই কথা। এবং জরথুষ্ট কি গৌতমবুদ্ধের জীবনচিত্রও এত অস্পষ্ট ও অনুমান-নির্ভর যা-থেকে কোন সিদ্ধান্তেই আসা যায় না। তওরাত মুসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ, কিন্তু ইহুদিরা আবেগে অনুরাগে যাই বলুক, তারা ভালোই জানে, তওরাত শুধু বহুমাত্রিক বিকৃতির শিকার নয়, বর্তমান তওরাতের লেখকই আলাদা, এবং মুসা

www.pathagar.com

(আ:)এর জীবনীও নিদারুণ বিস্মৃতির শিকার। যীশুখ্রীস্টের (হজরত ইসা আ:) জীবনচিত্রও আলাদা কিছু নয়, একই রকম কঠিন কুহেলিকায় আবৃত। ঈশ্বরের এই একমাত্র 'পুত্রের' মাত্র তেত্রিশ বছরের যে জীবৎকাল, তার মধ্যে শৈশব ও শেষ তিন বছরের কতিপয় ঘটনার কিছু মোটা দাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া মধ্যবর্তী পঁচিশ বছরের কোন খবরই নেই। কিন্তু কেন এমন হলো এবং হয়? কারণ যাই হোক, পৃথিবী কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে, মোহাম্মদ (সা:)এর জীবন এক্ষেত্রেও এক অলৌকিক ব্যতিক্রম। শুধু নবুয়ত-উত্তর জীবন নয়, নয় শুধু বছর কি মাসের হিসাব, মাতৃগর্ভ থেকে ভূপৃষ্ঠে অবতরণের পুণ্যমুহূর্ত থেকে উম্মুল মুমেনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা:)র কোলে মাথা রেখে পৃথিবী থেকে বিদায়গ্রহণ পর্যন্ত তেষট্টি বছরের যে-জীবন, তার প্রত্যেকটি দিন ঘন্টা ও মিনিট পর্যন্ত এমন নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ, যেন ক্ষুদ্রবৃহৎ সমস্ত ডিটেইলসহ একটি অক্ষয় সবাক চলচ্চিত্র। পৃথিবী জীবনীগ্রন্থ ও আত্মজীবনী অনেক দেখেছে, কিন্তু পৃথিবীর পক্ষে কল্পনাতীতরূপে বিশুদ্ধ এই একটিই অবিনশ্বর জীবনালেখ্য, যার কোন-একটি মুহূর্তও হারিয়ে যায় নি, এবং হারিয়ে যাবার সকল পথই আল্লাহপাক রুদ্ধ করে দিয়েছেন। মোহাম্মদ (সা:)এর সব কথা ও কাজ ও আচরণ এমনকি নীরবতা পর্যন্ত যথাযথ সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধকরণে, সংগ্রহ ও চয়ন ও বিন্যাসে, সত্যাসত্য নির্ণয়ের পরীক্ষা ও প্রক্রিয়ায় যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে মেধা সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন, তাঁদের সংখ্যা লক্ষাধিক। এবং এই লক্ষাধিক গবেষক ও সংকলকের জীবন নিয়েও রচিত হয়েছে অতি প্রামাণ্য ও বিশাল জীবনীগ্রন্থ 'আসমাউর রিজাল'; অর্থাৎ মোহাম্মদ (সা:)এর নিজের জীবন তো বটেই, এমনকি তাঁর সঙ্গে ও তাঁর জীবনচিত্রের নির্ভুল সংরক্ষণকর্মে যাঁরা কোন-না-কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত, তাঁরাও ইতিহাসে অমর। পৃথিবীর কোন ভাষা ও সাহিত্যে, কোন ধর্ম কি জ্ঞান কি গবেষণায় এর কোন নমুনাই নেই।

হার্ভার্ড-অক্সফোর্ডের অসূয়াতাড়িত পণ্ডিত কি দরিদ্রবিশ্বের প্রভুরঞ্জনে তৎপর বুদ্ধিজীবী সবাই স্বীকার করে, মোহাম্মদ (সা:)এর জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো এই-যে বিশাল ও ব্যাপক একটি বিজ্ঞানসম্মত ডিসিপ্লিন, এ-এক অপার বিস্ময়। জন্মান্ধদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যে-ধর্ম ও যে-বিশ্বাসেরই হোক, কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি, যুগপৎ বিস্ময়কর ও অতিপ্রাকৃতিক ও বাস্তব ও নির্ভুল এই সুরক্ষার ব্যবস্থাটিকে অলৌকিক না-বলে পারে না। কিন্তু সকল বিকৃতিমুক্ত এই-যে অক্ষত মহিমান্বিত জীবন-ইতিহাস, এর নেপথ্য রহস্যটা কী? রহস্য হলো, আল্লাহপাক ওয়াদা করেছেন– তিনি স্বয়ং কোরআন শরীফকে সকল বিকৃতি থেকে রক্ষা করবেন। এইজন্যই মানুষের যে-কোন প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে কোরআন শরীফের প্রতিটি বর্ণ ও বাক্য সুরক্ষিত। নবী মোহাম্মদ (সা:) ছিলেন এই কোরআনেরই হুবহু বাস্তব প্রতিরূপ; অতএব আল্লাহপাক কোরআন-মজীদের মত কোরআনের এই মানবিক রূপটিকেও সর্বকালের জন্য নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এবং এই শাশ্বত সুরক্ষাই প্রমাণ করে তিনি

www.pathagar.com

বিশ্বনবী, প্রমাণ করে তিনি সর্বকাল ও সর্বমানবের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, এবং প্রমান করে একমাত্র তিনিই অনুসরণযোগ্য বাস্তব দৃষ্টান্ত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের বড় বদনসীব, এমন অক্ষয় ও সহস্ররশ্মি আলোকবর্তিকার অতি-নিকটে অবস্থান করেও 'তারা অন্ধ ও বধির ও বাকশক্তিহীন' এবং সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনে অক্ষম ও অনিচ্ছুক। ভাগ্যহীন পৃথিবীর ততোধিক দুর্ভাগা এই মূঢ় মানবসন্তানদের প্রকৃত অবস্থা সেই ইহুদির মত, যে-ব্যক্তি মদীনার ঘরে ঘরে গিয়ে বলে বেড়াতো, 'খুব শীঘ্রই এখানে একজন নবীর আগমন ঘটবে, ভুল করো না, তাঁকে তোমরা অবশ্যই সত্য বলে গ্রহণ করবে'। তারপর নবী (সা:) যখন সত্য-সত্যই মদীনাতে আসলেন, মদীনাবাসীরা প্রস্তুতই ছিলেন, রাসুল (সা:) এর আহবানে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন; কিন্তু সেই ইহুদির মধ্যে কোন আগ্রহই পরিলক্ষিত হলো না। লোকে জানতে চাইলো, 'তুমিই সবাইকে অগ্রিম সুসংবাদ জানালে অথচ তুমি নিজে কেন মুখ ফিরিয়ে আছো?' ইহুদি বললো, 'তোমাদের যা বলেছি তা যথার্থ, কিন্তু এ-ব্যক্তি সে-ব্যক্তি নয়'। 'বহুদর্শী বিদ্যানিধি' ইহুদিটির কী পরিণতি হয়েছিল জানি না, কিন্তু মোহাম্মদ (সা:)এর প্রতি মুখ ফিরিয়ে-থাকা এই পৃথিবীর পারলৌকিক-তো বটেই পার্থিব পরিণতিও যে ক্রমাগত এক সমূহ ধ্বংসের দিকে দ্রুত-ধাবমান, এটা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। এবং বর্তমান পৃথিবীব্যাপী তীব্র থেকে তীব্রতর মানবিক সংকট আজ সেই কথাই প্রমাণ করে। উর্ণনাভের জালে অবরুদ্ধ মক্ষিকার মত মানবগোষ্ঠীর সংকট ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে। চৌদ্দশ বছর কম সময় নয়, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ক্লান্ত অবসন্ন ব্যর্থ বিপন্ন পৃথিবীর এইটুকু বোধোদয় হওয়া উচিত ছিল যে, মহানবী (সা:)এর সর্বোত্তম আদর্শকে নিঃশর্ত আনুগত্যে গ্রহণ করা ছাড়া পরিত্রাণের কোন পথই খোলা নেই, খোলা রাখাই হয় নি। এবং এইজন্যই মহান আল্লাহপাকের অমোঘ ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা : 'রাসুল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ করো, যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো'। 'তিনি অবশ্যই সর্বোত্তম স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত' 'বিশ্বজগতের আশীর্বাদস্বরূপ প্রেরিত' এবং 'তাঁর আদর্শই সর্বোত্তম'।

www.pathagar.com

মহানবী (সাঃ)এর কথা ও মর্মকথা

মহানবী (সা:)-যে মহান আল্লাহপাকের বার্তাবহ শ্রেষ্ঠতম নবী, তিনি-যে সমগ্র বিশ্বের রহমতস্বরূপ প্রেরিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, এ-বিষয়ে আমার মধ্যে কখনোই কণামাত্র অবিশ্বাস কি সন্দেহ কি দ্বিধার উদ্রেক করে না। কেউ কেউ একে হয়ত আমার সহজাত কুসংস্কার বা অন্ধত্ব বলে বিবেচনা করতে পারে, কিন্তু এই অন্ধত্বই আমার ঈমান ও অস্তিত্ব। এবং সর্বান্তঃকরণে অনুভব করি, নির্ভয়ে ব্যক্তও করি, এই 'অন্ধ বিশ্বাস' আমার সার্বিক চেতনাকে এমন গভীর ও গাঢ়ভাবে আবৃত করে রেখেছে যে, এক্ষেত্রে কোন যুক্তি কি বিতর্ককে প্রশ্রয় দেয়াও মনে করি একটি গর্হিত অপরাধ। কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ ও গৌরব ও ঐশ্বর্য কী? আমি বলবো, সৃষ্টিকর্তার একত্বের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস এবং নবী (সা:)এর প্রতি নিরঙ্কুশ ভালোবাসা। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, জীবনের নিকৃষ্টতম ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্য কি? বলবো, মহান আল্লাহপাককেই সকল শক্তি ও ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে জ্ঞান করার ক্ষেত্রে যে-কোন ধরনের ব্যত্যয় এবং মহানবী (সা:)এর অত্যুজ্জ্বল মহত্বকে অনুধাবন করার অক্ষমতা। কিন্তু সকলেই 'অন্ধ' নয়, কেউ কেউ 'চক্ষুষ্মানও'। তাই এ-বিষয়ে যারা তর্কপ্রবণ ও অবিশ্বাসী কি সন্দেহবাদী, তারা তো অবশ্যই দাবী করবে, আমার এই প্রেম ও বিশ্বাসের মূলে অকাট্য কিছু যুক্তির অবলম্বন; অন্যথায়, তাদের 'বিজ্ঞ' বিবেচনামতে এমন বিশ্বাস অগ্রাহ্য কি পরিত্যাগ করাই উত্তম।

আল্লাহপাক অবশ্য এই ধরনের কূট ও আত্মভ্রষ্ট তার্কিকদেরকে 'অন্ধ ও বধির ও মূক' আখ্যায়িত করে তাদের জন্য জাহান্নামের চূড়ান্ত 'সুসংবাদ' দান করেছেন। তারা আদৌ মনোযোগের যোগ্য নয়, কারণ তারা সত্যের প্রতিশ্রুত শত্রু। তবু বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে প্রশ্ন করতে পারি, আসলে কোন্‌টা বেশি শক্তিশালী, কোন্‌টা অধিক নির্ভরযোগ্য, যুক্তি না বিশ্বাস? বিজ্ঞানীরা যখন মহাশূন্যের নানা রহস্যের কথা বলেন, আমরা তা বিশ্বাস করি, কারণ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁরা বিশ্বাসযোগ্য। আইনস্টাইন বললেন, এক খন্ড নিরেট পদার্থের মধ্যে লুকিয়ে আছে লক্ষ কোটি দৈত্যের অমিত শক্তি, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ তা না-বুঝেও বিশ্বাস করেছে, কারণ এই বেহালাবাদক আত্মভোলা বৈজ্ঞানিকটি বিশ্বাসযোগ্য। কোন ফসিল-বিশেষজ্ঞ সমুদ্রগর্ভে প্রাপ্ত একটি ঝিনুকের ভাঙ্গা টুকরো নিয়ে যখন বলেন, এটির বয়স পাঁচ কোটি বছর; অথবা লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে অবলুপ্ত ডাইনোসরের জীবাশ্ম জোড়া দিয়ে দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাইনোসরের অবয়ব নির্মাণ করেন, আমরা তাও বিশ্বাস করি। এমনকি ২১২৬ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তারিখে 'সুইফট টাটল' নামক একটি ধূমকেতু যে পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, বিজ্ঞানীদের এই ভবিষ্যদ্বাণীও আমরা অস্বীকার করি না, কারন এই ভবিষ্যদ্বক্তারাও, বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সত্যভাষী। এই বিশ্বাস যদি অন্ধত্ব কি মূঢ়তা না হয়,

www.pathagar.com

মহানবী (সাঃ)এর কথায় বিশ্বাসস্থাপন কেন অন্ধত্ব বলে বিবেচিত হবে? পৃথিবীর জন্মকাল থেকে অদ্যাবধি তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বাসযোগ্য আর কে আবির্ভূত হয়েছেন? এই মানববংশে তাঁর চেয়ে অধিক সত্যবাদী ও আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য আর কে জন্মগ্রহণ করেছেন? বেশিদিনের কথা নয়, সব কথা ইতিহাসে জ্বল জ্বল করছে; তিনি সমগ্র জীবনে একটিও মিথ্যা কথা বলেন নি, একটি ওয়াদা ভঙ্গ করেন নি, তুচ্ছতম একটি আমানত মনের ভুলেও কখনো খেয়ানত করেন নি। এমন একজন মানুষের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন যদি মূঢ়তা হয়, সেই মূঢ়তা লক্ষ কোটি মানুষের সম্মিলিত যুক্তি ও জ্ঞানের চেয়েও অনেক বড়, অনেক মূল্যবান।

আসলে প্রকৃত সত্য কি জ্ঞান রহস্যজনকভাবে শুধুমাত্র কতিপয়ের হাতেই ধরা দেয়। এবং সেই বরদ ও নির্বাচিত কতিপয়ই অবশিষ্ট সকলের কাছে পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে পৌছে দেন সেই সত্য। তিনিই বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান, যিনি এই আলোকবার্তা গ্রহণ করতে সক্ষম হন। ইতিহাসে কারা মূঢ় বলে চিহ্নিত হয়েছে? হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), না আবু জেহেল আবু লাহাবেরা? বিস্ময়করই বটে, আধুনিক বিশ্বের তার্কিকেরা যুক্তির কথা বলে, অথচ তারা বোঝে না অথবা বুঝেও বোঝে না যে, তাদের শাণিত যুক্তিসমূহ সত্যকে আচ্ছাদিত করারই উপকরণ মাত্র। এবং এই সন্দেহপরায়ণ কুশলি কিন্তু অসুস্থ তার্কিকেরা এমনকি আবু লাহাবদের চেয়েও নির্বোধ। কারণ মহানবী (সাঃ)এর জরুরি বার্তাকে যারা সেদিন অস্বীকার করেছিল, তারা অন্তত যুক্তি কি বিজ্ঞানের দোহাই দেয় নি; তারা ঠিকই বুঝেছিল, যুক্তি আছে কি নেই সে পরের কথা, এমন একজন সর্বতোভাবে পবিত্র মানুষের মুখনিঃসৃত বাণী মিথ্যা- তো হতেই পারে না, ব্যর্থও হতে পারে না। অতএব তারা তাদের বহু শতাব্দীবাহিত পুরুষানুক্রমে লভ্য ধর্ম ও সংস্কারের অত্যাসন্ন পতনকে রোধ করবার জন্যই মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিরোধ রচনা করেছিল। তারা ঠিকই দেখতে পেয়েছিল যে, আরব্য মরুভূমির প্রাঙ্গণে জ্বলে উঠেছে একটি আলো, কিন্তু তারা তা নির্বাপিত করতে চেয়েছে, কারণ ওই বিবরবাসী সরিসৃপদের কাছে অন্ধকারই ছিল কাম্য। অন্ধকারই তাদের প্রিয়তম সহচর। নিতান্তই জিদ ও জন্মগত কুসংস্কারবশত তারা জেনেশুনেও সত্যকে আলিঙ্গন করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আজ যারা মহানবী (সাঃ)-কে অস্বীকার করে, তারা কী? কী তাদের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়? জিদ কি সংস্কার নয়, তারা এক স্বসৃষ্ট মিথ্যার মধ্যে নিমজ্জিত। তাদের যুক্তি, তারা এক অগ্রসর পৃথিবীর বাসিন্দা, পৃথিবীর বহু দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা, বহু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় পুষ্ট তাদের অন্তর্লোক; তারা মনে করে চৌদ্দশ বছর পূর্বের কোন আহবানের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের নাম গোঁড়ামি ও পশ্চাদপদতা। আসলেই বড় বদনসীব এই আধুনিক পৃথিবীর। থিকথিকে একপ্রকার অহমিকা দ্বারা আচ্ছন্ন এই মহাপণ্ডিতেরা অনেক বোঝে, শুধু এইটুকু অনুধাবন করতে অক্ষম যে, সত্য কখনো পুরনো হয় না; অস্বীকার কি অবহেলা করলেই স্বর্ণখণ্ডের মূল্য

www.pathagar.com

হ্রাস পায় না। কী দুর্বুদ্ধি এই পণ্ডিতদের এবং কতই-না আত্মঘাতী তাদের 'ডিবেটিং দক্ষতা'! প্রকৃতপক্ষে এদের অবস্থান আবু লাহাব ও তার স্ত্রী থেকেও কয়েক সোপান নিম্নে।

মহানবী (সা:) সর্বকালের মানুষের কাছে কী বার্তা পেশ করেছেন? তিনি শুধু বললেন, মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত এই ভূপৃষ্ঠে মানুষের যে-অবস্থান, এটাই শেষ কথা নয়। নশ্বর এই জীবন বস্তুত অনন্ত প্রসারিত অবিনশ্বর জীবনেরই এক অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সবাইকে আল্লাহর সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তাঁর কাছে অদ্যকার এই কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাবদিহি করতে হবে; এবং তারপর ফলাফলের ভিত্তিতে মানুষ প্রবেশ করবে জান্নাত কি জাহান্নামে। অতএব পার্থিব জীবন নামক এই পরীক্ষাকালটুকু আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে যাপন করাই মানুষের প্রকৃত কাজ। এইতো কথা। এই কথার প্রতি বিশ্বাস না-করার হেতু কী? তিনি কি মিথ্যাবাদী? তাঁর সমগ্র জীবনের কোন একটি ঘটনাও কি এই সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁর বক্তব্য মনগড়া ও স্বকপোলকল্পিত? এমন একটি দুর্বলতম প্রমাণও কি উপস্থাপন করা সম্ভব যে, তিনি কোন লাভ ও লোভের বশবর্তী হয়ে কথা বলেছেন? শতকরা একশ ভাগ সত্য না-হলে, কোন মানুষ কি কখনো স্বেচ্ছায় সমগ্র জীবনব্যাপী কঠিনতম সংকট ও কৃচ্ছ্রতার মধ্যে ভয়ে-আতঙ্কে নিষ্ঠায় ও ভালোবাসায় একমাত্র আল্লাহকেই সর্বস্ব জ্ঞান করতে পারেন? অবশ্য অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে বলা সম্ভব যে, চক্ষু কর্ণ জ্ঞান ও ধারণা বহির্ভূত সম্পূর্ণ অদৃশ্যে বিশ্বাসস্থাপন মানববুদ্ধির পক্ষে না সুখকর না সমীচীন। বরং এও এক ধরনের অবৈজ্ঞানিক ও ভৌতিক বিশ্বাস, যা কেবল 'মূঢ়দের' জন্যই তৃপ্তিকর। এবং এই ধরনের অলীক বিশ্বাস থেকে দূরে অবস্থান করাই হিতকর। বলা বাহুল্য, এই সংশয় ও অবিশ্বাস নিরাময়যোগ্য নয়। তবু উল্লেখ করি, সন্দেহ নেই যে আমাদের জ্ঞান বাড়ছে অভিজ্ঞতা বাড়ছে, আমাদের মস্তিষ্কের কোষ এখন পূর্ববর্তী যে-কোন সময়ের তুলনায় অভাবনীয়রূপে দক্ষ ও সৃজনশীল। এবং সত্য যে, আমাদের দেখা ও জানার বলয়রেখা নিত্যই অতিদ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু এটাও সত্য, ততোধিক দ্রুতবেগে ঘনীভূত হচ্ছে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের গাঢ়তম অন্ধকার। কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে এক-একটি নক্ষত্র কী করছে? অনন্ত প্রসারিত ছায়াপথে বালুকণার মত ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি নক্ষত্রের দু'একটি অকস্মাৎ কেন 'নোভা' কি 'সুপার নোভা' হয়ে জ্বলে জ্বলে ওঠে? চতুর্দিক সমুদ্রকে পাহারায় বসিয়ে প্রকৃতি কেন সারা পৃথিবীর অধিকাংশ তেল আরবভূমির অভ্যন্তরেই গুপ্তধনের মত লুকিয়ে রাখলো? মানববুদ্ধি অসহায়ভাবে নিরুত্তর ও হতবাক। অথচ কী করুণ পরিহাস ও স্ববিরোধিতা, অতি-প্রগতিবাদীদের শ্লাঘা ও অহমিকার বেলুন কিন্তু ক্রমাগতই স্ফীত হচ্ছে! আল্লাহপাক এদেরকেই চিহ্নিত করেন মোহরাঙ্কিত দুষ্ট আত্মার অধিকারী কঠিনতম জাহান্নামের অতি উপাদেয় খাদ্যরূপে।

ডিমের মধ্যেও একটি জগৎ আছে। সেখানে অবস্থানরত কুসুমকে যদি কানে কানে

www.pathagar.com

বলা যায়, খোলসের বাইরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এক বিশাল পৃথিবী, তোমার সোনালী ডানায় লেখা হবে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের প্রেম, তুমি হবে বসন্তদিনের বিহঙ্গ, পুষ্পিত কাননের পাখি। ডিমের অভ্যন্তরে আবদ্ধ কুসুম কি তা বুঝতে পারবে? মহানবী (সাঃ) এই স্বল্পায়ু জীবন নামক খোলসটির বাইরে অনন্তরূপে বিস্তৃত অনিঃশেষ অন্য এক জীবনের কথা শোনালেন। অতি সংকীর্ণ খোলসসদৃশ এই জগৎকেই একমাত্র ও সর্বস্বজ্ঞানে কেউ মহানবী (সাঃ)এর এই বার্তাকে অস্বীকার করলে করতে পারে, কিন্তু অবধারিত সত্যের কোন ব্যত্যয় হবে না। সেই অত্যাসন্ন শাস্তি কি পুরস্কার-দানের মহাদিবসে আল্লাহপাক বলবেন, এই সেই দিন যাকে তোমরা অস্বীকার করেছিলে। নবী (সাঃ)কে রাজা হবার জন্য আল্লাহপাক প্রেরণ করেন নি; তিনি এসেছিলেন বিপদ ও সতর্কসংকেত নিয়ে। এবং দীর্ঘ তেইশ বছর তিনি একাদিক্রমে বিরামহীনভাবে এই একই সাবধানবাণী সবাইকে শোনালেন যে, বড় গুরুতর ও ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে মানুষকে। মানুষের জন্যই সর্বদা অস্থির ও আতঙ্কগ্রস্ত তিনি। এবং এইজন্য বিদায় হজ্বেও সমবেত জনতার কাছে তিনি পুনঃপুনঃ একই প্রশ্ন করছেন যে, তিনি কি তাঁর প্রভুর বাণী সঠিকভাবে পৌছে দিয়েছেন? যারা সেদিন অনুপস্থিত তারাও যেন জানতে পারে, বার বার এই দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সবাইকে। এক মহাবিপদসংকেত নিয়ে তিনি সর্বক্ষণ এমনভাবে বিচলিত যে, সারাদিন সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাচ্ছেন উদ্ধারের উপায়, আর রাত জেগে সকল মানুষের হয়ে প্রভুর কাছে শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। তিনি রাজা হতে চান নি; আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব দান করেছিলেন, কিন্তু সে-কেবল এইজন্য যে, আরো সুচারুভাবে আরো সাফল্যের সঙ্গে তিনি যাতে বিপদবার্তা এবং তা-থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে সমসাময়িক ও অনাগত কালের মানবমণ্ডলীকে সচেতন ও অবহিত করতে পারেন। তিনি তাই-ই করেছেন। আল্লাহপাক তাঁর অশেষ করুণায় পবিত্র কোরআন এবং মহানবী (সাঃ)এর প্রতিটি কথা ও কাজকে সামান্যতম বিকৃতির হাত থেকেও চিরকালের জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন; সে-ও এইজন্য যে, কোন-কালের কোন মানুষ যেন বলতে না-পারে, —পরকালের অনন্ত প্রেক্ষাপটে ইহলৌকিক করণীয় সম্পর্কে সে কিছুই কখনো জানতে পারে নি। মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানলে খুব কমই হাসতে, সারাক্ষণ অশ্রু নির্গত হতো তোমাদের। সত্যই কী মহাদুর্যোগময় পরিস্থিতিই-না অপেক্ষা করছে মানুষের জন্য! বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহপাকই যথেষ্ট, তাঁরা আশাতীত প্রতিদান লাভ করবেন; কিন্তু সেদিন অবিশ্বাসীদের জন্য বড় দুঃসময়। আল্লাহপাকের প্রতিশ্রুতি কি কখনো মিথ্যা হয়? সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ ও রহমতস্বরূপ প্রেরিত নবী (সাঃ)এর সাবধানবাণী কি সুস্থ বিবেচনায় উপেক্ষার যোগ্য? আসলেই মানুষের বড় বদনসীব, যা তাকে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনে সর্বদা সাহসী করে রাখে।

কিন্তু এমনও তো হতে পারতো যে, অবিশ্বাসীরা তাদের আপাত-সুখস্বর্গকে অটুট

www.pathagar.com

রেখেও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হতো। কারণ এমন অনেক বিশ্বাসীও তো ছিল এবং আছে, যাদের জাগতিক আচরণ ও চরিত্র ঠিক বিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গীকৃত নয়। তারা বিশ্বাসে অবিচল কিন্তু স্বভাব ও কর্মে অবিশ্বাসীর মতই শিথিল ও স্বেচ্ছাচারী। নবী (সা:)এর বাণী ও জীবনবিধান অবশ্য এই ধরনের দ্বৈতাচার ও আত্মবিভক্তির কোন মূল্য দেয় না। কারণ ঝড়কে বিশ্বাস করে নিরাপদ বেষ্টনীতে প্রবেশ না-করা এবং ঝড়ের আগমনকে অস্বীকার করা একই কথা। উভয়ের জন্য ফলাফলে কোন প্রভেদ ঘটে না। অতএব একই নিয়মে আন্তরিক অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের নিমিত্ত জাহান্নাম দুজনকেই স্বাগত জানাবে। তবু বিশ্বাসীরা অন্তত এই অর্থে একটু অগ্রসর যে, তারা বিষয়টি মেনে নিয়েছিল, যদিও নানা দুর্বলতাহেতু বাহ্যত তারা অবিশ্বাসীদেরই দলভুক্ত। কিন্তু অবিশ্বাসীরা সত্যের এমনই প্রতিশ্রুত শত্রু যে, তারা বরং ইসলাম নির্ধারিত বহু সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করতেও সম্মত, অথচ এমনকি কোন দুর্বলতম মুহূর্তেও বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেবে না। দেবে না তার কারণ, তারা নৈতিক অপরাধবোধে আক্রান্ত হতে চায় না; তারা বদ্ধ উন্মাদদের মত নি:শর্ত ও নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতাকামী। বিশ্বাস মানুষের মধ্যে যে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করে, তা এমনকি উৎকট স্বেচ্ছাচারীকেও গোপনে গোপনে দুর্বল করে তোলে। আর অবিশ্বাসীরা এই দুর্বলতারই মূলোৎপাটন করতে চায়। তারা চায় নিরঙ্কুশ অমিতাচার, নিরঙ্কুশ আনন্দ ও ভোগ ও স্বাধীনতা। তাই তারা অনেক সময় অনেক ভালো কাজ করে, কিন্তু করে মন চায় বলে; অনেক সময় অনেক দুষ্কর্ম থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে, কিন্তু সেও কোন শুভত্বের প্রতি আকর্ষণবশত নয়, তা নিতান্তই স্নায়ুর ক্লান্তি কি আলস্য কি মানসিক অবসাদহেতু। এবং এইজন্যই তারা এক হাতে শোষণ ও প্রতারণায় মানুষকে নিঃস্ব করে তোলে, গড়ে তোলে সম্পদের পাহাড়; আবার অন্যহাতে জনকল্যাণে ব্যয় করে অঢেল অর্থ। সকালে কখনো উপাসনায় আত্মসমাহিত কি পরহিতব্রতে তৎপর ও মনোযোগী; বিকালে সেই মানুষই নিষিদ্ধ ড্রাগের চোরাচালান নিয়ে গোপন বৈঠকের সভাপতি অথবা পরস্ত্রীহরণে পুলকিত রাবণ। এই-যে দ্বৈত প্রতিমান, এই-যে নির্দ্বিধ আত্মবিভক্তি, পাপবোধমুক্ত সম্পূর্ণ নৈতিকতাশূন্য দৈত্য ও দেবতার এই-যে এমন বিদ্রূপাত্মক যুগল কার্যক্রম রচনা, এ কেবল অবিশ্বাসীর পক্ষেই সম্ভব। এইজন্যই বিশ্বাসকে তারা ভয় পায়, এবং সর্বশক্তি দিয়ে বিশ্বাসীকে শত্রুজ্ঞানে উৎখাত করাই তাদের 'মানবধর্ম' ও প্রগতিবাদ।

প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসীরা যাই বলুক, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ তার দৃষ্টিক্ষীণতা-হেতু যাই মনে করুক, মোহামমদ (সাঃ) প্রদত্ত সংবাদ অকাট্য। কেউ বলে নি, তিনি উন্মাদ কি বাতিকগ্রস্ত ছিলেন; কিছুতেই প্রমাণ করা যাবে না, তিনি যা বলেছেন তা বিকৃতমস্তিষ্ক প্রসূত কোন বিকার, এবং এমন কোন সাক্ষ্যও নেই যে, তাঁর কথা কোন ফাঁকি বা প্রতারণা বা চাতুরিমিশ্রিত শিকার-কৌশল। অনেকে অনেক কথা বলেছেন, নানা সময়ে নানা ধরনের নিন্দা ও কটূবাক্যে বিদ্ধও হয়েছেন তিনি, কিন্তু অদ্যাবধি কোন গবেষক

www.pathagar.com

একটি উদাহরণও তুলে ধরতে পারে নি যে, কোরআন শরীফের একটি বাক্য কি শব্দও অসত্য; নবী (সাঃ)এর একটি কথা কি কাজও প্রমাদস্পৃষ্ট। এবং এইজন্যই তাঁর কথায় যিনি যত বিশ্বাসী, তাঁর প্রতি প্রেম ও আনুগত্য যাঁর যত বেশি, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তিনি তত বেশি সফল ও সম্মানিত। তিনি বলেন, আল্লাহর ভয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান; আল্লাহও বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টিই জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাফল্য। অলৌকিকত্ব নয়, নয় কোন জীবনবিচ্ছিন্ন মায়াবাদ — মোহাম্মদ (সাঃ) যা বলেছেন তা এক সুস্পষ্ট বাস্তবতা। দূরদৃষ্টিহীন মানুষ কখনো গুবরে পোকাকেও সূর্যজ্ঞানে পূজা করে, কখনো এই মানুষকেই বলে 'প্রভু নারায়ণ', কখনো চন্দ্রগ্রস্ত শ্মশানবাসী উলঙ্গ উন্মাদকে বলে 'ত্রিকালদর্শী' মহাপুরুষ, গঞ্জিকামুগ্ধ পাগলের প্রলাপকে মনে করে 'বাণী'। অথচ যে-মহাপুরুষ মানুষকে তার সকল ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা ও অলীক আতঙ্ক থেকে মুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করলেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিরূপে সর্বাধিক উচ্চতম মহিমায়, সেই নবী মোহাম্মদ (সাঃ) অসংখ্য মনুষ্যরূপী বিশ্ববাসীর কাছে এখনো অবিশ্বাসের পাত্র। যিনি বললেন, মানুষের সমমর্যাদাসম্পন্ন আর কেউ নেই, সৃষ্টিকর্তার পরেই তার স্থান, সে-ই সৃষ্টিকর্তার প্রিয়তম ও একমাত্র প্রতিনিধি, সাগরে-সৈকতে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেখানে যা-কিছু সবই মানুষের জন্য, সেই পরম সুসংবাদদাতা মহামানবেরই এক চরম প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালো আধুনিক পৃথিবী।

অথচ এই আধুনিক বিশ্বের কী এমন গৌরব! বিজ্ঞানের সহায়তায় ভোগের কিছু উপকরণ বাড়ানো ছাড়া পৃথিবী আর কী কর্মটি করেছে? আর সেই ভোগেরও তো চারপাশে বিরাজ করছে এই মানুষেরই স্বসৃষ্ট সহস্র প্রকার অভিশাপ ও মারণাতঙ্ক। এইডস কি আণবিক বোমা, কোকেন ম্যানড্রেক্স, পরস্বাপহরণ, বিশ্ববিস্তৃত জুয়া, যুদ্ধ, গুপ্তচরবৃত্তি, নিরপরাধ শিশু ও নারীব্যবসা-এইসব নিয়ে মত্ত উন্মত্ত পৃথিবী আজ এক দুর্গন্ধময় নর্দমায় পরিণত। এই কি মানুষের স্বপ্নের পৃথিবী! চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ আজ বলতে বাধ্য হচ্ছে, মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করাই এক অভিশাপ। কিন্তু এটাই স্বাভাবিক ও যথোচিত, কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)এর প্রতি অবিশ্বাসী পৃথিবীর নসীব এর চেয়ে ভালো হওয়া উচিত নয়। যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ কি আদৌ কোন কাজ? মোশাদ কি সিআইএ, 'র' বা কেজিবি পালনও কি কোন প্রকৃত কর্ম? এর চেয়ে সহস্রগুণ-উৎকৃষ্ট কাজ মৌমাছিপালন বা কাজী পেয়ারার চাষ, এমনকি গোখাদ্য সংগ্রহ কি শৌচাগার নির্মাণ কি অশ্বের জন্য তৃণকর্তন। অতএব অকাজ-কুকাজে নিমজ্জিত আধুনিক মানবসম্প্রদায় যে মহানবী (সাঃ)কে কিঞ্চিত্তম অনুধাবনেও ব্যর্থ হবে, এটাই মনস্তত্ব সম্মত। অথচ এই মহামানবকে না-মানার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তিনি যা বলেছেন তার কিছুই কখনো অসার প্রমাণিত হয় নি। তিনি বলেছেন, মানুষের জীবন আপাতদৃশ্যমান এই জন্মমৃত্যুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; অনন্ত তাৎপর্যে মণ্ডিত এক অকল্পনীয় সুবিশাল প্রেক্ষাপটে স্থাপিত মানবজীবন। জীবনের এই ব্যাপ্তির কথা এই

www.pathagar.com

অনন্ত প্রসারিত অস্তিত্বের কথা মহানবী (সাঃ) ছাড়া আর কে এমন পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে অকুণ্ঠ উচ্চারণে তুলে ধরেছেন? যে মানুষ নিজেকে মনে করে 'খিড়কি পুকুরের গুগলিগ্রাসী' পৃথুলা পাতিহাঁস, তাকেই তিনি জানিয়ে দিলেন, তার ডানায় রয়েছে অফুরান শক্তি, সে আসলে এক নক্ষত্রবিহারী অপরাজেয় বলাকা। অথচ পাতিহাঁসসদৃশ মানুষ এ-কথায় কর্ণপাত না-করে বরং বক্তার প্রতিই লোষ্ট্র ও কটাক্ষ নিক্ষেপ করছে। অবিশ্বাস নামক দুরারোগ্য ব্যাধি যে কী পরিমাণে মানবচেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে, এই আচরণ তার প্রমাণ। অক্সফোর্ড কি হার্ভার্ড কি লেনিনগ্রাদের বিশ্ববিদ্যালয়প্রসূত অনেক পণ্ডিত শুধু বই লিখতে জানে; তাদের আসলে সদ্য-কথা-শেখা শিশুর মত কথা-বলাতেই আনন্দ। বয়স্ক শ্রোতাদের সকৌতুক ও সস্নেহ উৎসাহে মার্কস কি ম্যাকিয়াভেলী কি ক্যামু-পড়া এই পণ্ডিতমন্য অপরিণত শিশুরাই আজ মানবসভ্যতার পথপ্রদর্শক। মানুষকে তারা মনে করে উন্নতবুদ্ধির একটি জন্তু মাত্র। তারা মনে করে, বন্য কি গৃহপালিত পশুর সঙ্গে মানুষের যে ব্যবধান, তা আদৌ প্রকৃতিগত নয়, কথঞ্চিৎ বুদ্ধিবিকাশের মাত্রাগত। তার মনে করে, আল্লাহ নেই, থাকলেও তা নিয়ে বিচলিত হবার কিছু নেই। তাদের বিশ্বাস, প্রেরিত কোন রাসুল নেই এবং কোরআন একটি বানিয়ে-লেখা মেধাবী পুস্তক মাত্র; মনে করে, পরকাল কি পরকালের জবাবদিহিতা একটি কল্পিত উপাখ্যান, এবং কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত জান্নাত-জাহান্নাম একটি ছেলেভুলানো রূপকথা। সত্যই তথাকথিত এই আত্মমুগ্ধ অতিপ্রগতিশীল বীরপুঙ্গবেরা বড় কুশলেই আছে! অথচ এটাও তো যুক্তিরই কথা, অসৎ মানুষকে বিশ্বাস করে লাভবান হওয়ার চেয়ে, সৎ ও পবিত্র ও মানবপ্রেমে সতত জাগরুক কোন মানুষের প্রতি বিশ্বাস রেখে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও ভালো। কোন তর্ক নয়, অবিশ্বাসীরাই বলুক, মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে অধিক সৎ অধিক পবিত্র অধিক মানবপ্রেমী কোন মানুষ কি এই গ্রহে কখনো অবতীর্ণ হয়েছে?

আল্লাহপাক বলেন, তাঁর অনুমতি না-হলে মানুষের মতি হয় না। অতএব আল্লাহর করুণারিক্ত মতিভ্রষ্ট অস্বীকারকারীরা যে সর্বপ্রযত্নে আপনাপন দৃষ্টি ভুল লক্ষ্যেই নিবদ্ধ রাখবে, এটা বিধিনির্বন্ধ। ইবলিস একদা নবী (সাঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিল - সবাই আমাকে দোষারোপ করে কিন্তু হুজুর ভেবে দেখুন, আল্লাহ যখন জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, জাহান্নামের উপযোগী কিছু লোকও সৃষ্টি করেছেন। এই কথায় মহানবী (সাঃ) সত্যই অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, পৃথিবীতে আসলে অনেক মানুষের জন্মই জাহান্নামের সদাবুভুক্ষু উদরপূর্তির জন্য। আল্লাহপাক ভালো জানেন, তাঁর বিচার অভ্রান্ত, সবকিছু তাঁরই রহস্যময় ইচ্ছাধীন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এই কূট ও বক্র ও তার্কিকদের নসীব অপরিবর্তনীয়। সত্যই যে অপরিবর্তনীয় তার অনেক দৃষ্টান্তও আল্লাহপাক উপস্থাপন করেছেন। নবী (সাঃ) এর পিতৃব্য আবু তালিব তার ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য, ইসলামের জন্য অনেক শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মোহাম্মদ (সাঃ)এর প্রতি

www.pathagar.com

ছিল তাঁর অকৃত্রিম প্রেম ও দরদ, ইসলামের সত্যতাও ভেতরে ভেতরে অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, এই ধর্মের প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য, এমনকি মৌখিক স্বীকৃতি প্রদানেরও সৌভাগ্য হয়নি তার। অথচ ইসলামের এক প্রবল প্রতিশ্রুত শত্রু, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রাণসংহারে বদ্ধপরিকর ক্রোধান্বিত ওমর মুহূর্তমধ্যে পরিণত হলেন সম্পূর্ণ বিপরীত অন্য এক মানুষে। আবু জেহেলরা নবুওতের প্রমাণস্বরূপ দেখতে চেয়েছিল দ্বিখণ্ডিত চন্দ্র। আল্লাহপাকের অসীম করুণায় নবী (সাঃ) এর অঙ্গুলি সংকেতে চাঁদ যখন সত্যই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আকাশের দুই প্রান্তে অবস্থান নিলো, আবু জেহেলদের কোন পরিবর্তন হয়নি। তারা তখন বললো, আবদুল্লাহর ছেলে একজন বিরাট বড় যাদুকর। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এইরকমই বলে। যারা মহাসত্যের প্রতি উদাসীন ও বধির, তারা কোন কিছুতেই প্রভাবিত হয় না। মিথ্যা ছাড়া অন্যদিকে তাদের অনুরাগ জন্মে না। এইতো এই শতাব্দীর ১৯৩২ সালের একটি ঘটনা, বাগদাদে অবস্থিত দু'জন সাহাবীর সমাধি থেকে পবিত্র লাশ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে উত্তোলন করলেন তৎকালীন বাদশাহ্। সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বচক্ষে অবলোকন করলো এই ঘটনা। তের'শ বছর পূর্বে পরলোকগত ও সমাহিত হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ও হযরত হুজাইফা (রাঃ) সাহাবীদ্বয়ের পবিত্র দেহ হুবহু জীবিত মানুষের মতই জীবন্ত অবিকৃত এবং চোখ দুটি খোলা, যা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে জ্যোতি। ইরাকের এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এখনো কেউ কেউ জীবিত। কিন্তু এমন ঘটনার পরেও মূঢ় অবিশ্বাসীদের অন্তর কি কিছুমাত্র দ্রবীভূত হয়েছে? অতি সম্প্রতি মরিস বুকাইলি তাঁর 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' এবং 'মানুষের আদি উৎস' গ্রন্থদ্বয়ে কী অকাট্যভাবেই না চোখে আঙ্গুল দিয়ে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিলেন যে, কোরআন যথার্থই একটি ঐশী গ্রন্থ, যার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য ও সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবে নির্ভুল ও অভ্রান্ত। মাইকেল হার্ট 'The Hundreds' শীর্ষক যে অসাধারণ একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, সেখানে বিস্তর চিন্তাভাবনা ও গবেষনার পর হার্ট এই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন যে, মোহাম্মদ (সাঃ)ই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। হার্টের এই সিদ্ধান্ত কি ভুল? এবং এইতো কিছুদিন মাত্র আগে Professor Bruce Lawrence একটি বই লিখেছেন, বইটর নাম "Defenders of God the Fundamentalist Revolt against the Modern Age." ডিউক ইউনিভার্সিটির এই অধ্যাপক বইটিতে উল্লেখ করেছেন — অন্যতম চন্দ্রবিজয়ী নীল আর্মস্ট্রং চন্দ্রে অবতরণের মুহূর্তে একটি অদ্ভুত শব্দ শুনেছিলেন। পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক মিশরে এক শুভেচ্ছা সফরে প্রেরিত এই আর্মস্ট্রং কায়রোর রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটছিলেন, অকস্মাৎ চন্দ্রপৃষ্ঠে শ্রুত সেই শব্দ হুবহু আবার শুনতে পেলেন। কোন এক পথচারীর নিকট থেকে তিনি জানলেন, সেটা পার্শ্ববর্তী মসজিদ থেকে প্রচারিত আজানের ধ্বনি। কালক্ষেপ না-করে নীল আর্মস্ট্রং মুসলমান হয়ে গেলেন। কিন্তু দেশে ফিরে যখন তিনি তাঁর এই ধর্মান্তরিত হবার কথা

www.pathagar.com

বললেন, প্রচণ্ড হুমকি এলো, তাঁর পদ পদবি চাকুরীসহ সকল সুবিধা কেড়ে নেয়া হবে। অধ্যাপক ব্রুস লিখেছেন, নবদীক্ষিত আর্মস্ট্রং এখন 'জাকিয়া' অর্থাৎ আপন ধর্মবিশ্বাসকে আপাতত গোপন রেখে জীবন নির্বাহ করছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকার, চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী ও প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপযুক্ত ব্যহারই বটে! উদাহরণের অভাব নেই। চোখে আঙ্গুল দিয়ে কত পুনঃপুনঃই-না মানুষকে আল্লাহপাক তাঁর সার্বভৌম শক্তি ও অস্তিত্বের কথা অবহিত করেছেন; কিন্তু দুর্মর পথভ্রস্টদের আদৌ কোন ভাবান্তর ঘটে না। ঘটার কথাও নয়, কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন, 'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায়, তাদের দৃষ্টি আমি আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে রাখবো, তারা আমার কোন নিদর্শনই বিশ্বাস করবে না এবং সৎপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না'। কিন্তু পৃথিবীর এই লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষেরা যেদিকেই ধাবিত হোক, যেমন ইচ্ছা 'মুক্তবুদ্ধির' চর্চা করুক, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর কথাই-যে সর্বাংশে সত্য তা প্রমাণিত হচ্ছে, এবং আরো উত্তমভাবে অচিরেই প্রমাণিত হবে। অদ্যাবধি প্রাপ্ত সকল বস্তুর মধ্যে ইউরেনিয়মই সর্বাপেক্ষ ভারি, এক ঘনফুট ইউরেনিয়মের ওজন প্রায় চৌদ্দ মন। পেপারওয়েট তৈরীর পক্ষেই উরেনিয়ম খুবই উপযুক্ত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন বললেন, এই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটির অভ্যন্তরে নীরবে নিঃশব্দে পুঞ্জিভূত রয়েছে এক বিস্ময়কর ও কল্পনাতীত ও অপরিমেয় পারমাণবিক শক্তি, তখনই তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। পৃথিবী জানতে পারলো যে, ইউরেনিয়ম এমন এক মহাশক্তির আধার যে, পেপারওয়েট কি অন্য কোন সাধারণ উদ্দেশ্যে তার ব্যবহার সমূহ মূঢ়তা। মানুষও প্রকৃতপক্ষে এইরকমই; সৃষ্টিকর্তা তার মধ্যে লুক্কায়িত রেখেছেন এক অমিত তেজ, এক অনিঃশেষ ভবিষ্যৎ। সে না পেপারওয়েট, না কচুরিপানা পরিকীর্ণ এঁদো পুকুরের পাতিঁহাস। পৃথিবীর এই আপাতদৃশ্যমান মুক্তাঙ্গনে বিচরণশীল মনুষ্য নামক দ্বিপদ প্রাণীটির যে কী মূল্য ও মর্যাদা, তা বস্তুতই কল্পনাতীত। আল্লাহপাক তাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর একান্ত প্রতিনিধিরূপে। অথচ কী পরিহাস কী কৌতুক, অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারী ও অতিবুদ্ধিমানেরা কেবল আত্মহননেই লিপ্ত। মুক্ত ও নিঃশর্ত জীবনাচার তাদের এত প্রিয়, এবং রহস্যসমুদ্রের নিম্নভাগ থেকে এই অক্লান্ত ডুবুরি সম্প্রদায় এত প্রচুর 'গুগলি' ও 'শামুক' সঞ্চয় করেছে যে, সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রতি অন্ধ ও উদাসীন ও অমনস্ক এই জ্ঞান ও গবেষণা জর্জরিত বিশ্বাসহীন মানুষেরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হিসাবে নয়, বরং ডারউইন কথিত লাঙ্গুলবিশিষ্ট চতুষ্পদ শাখামৃগের অধঃস্তন বংশধর বলে ভাবতে পুলক বোধ করে। 'শিক্ষিত' 'সভ্য' ও 'আধুনিক' 'বিজ্ঞ' ও 'বিদগ্ধ' প্রগতিবাদীদের উপযুক্ত সিদ্ধান্ত এবং আত্মপরিচয়ই বটে। সত্যই অধঃপাতের কোন সীমা নেই! এমন আত্মভ্রষ্ট দুর্মতিগ্রস্ত মানসিক রোগীদের কাছে নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর বিশ্বস্ত আহবান যদি উপেক্ষিত কি অগ্রাহ্য না হয়, তাহলে আর কাদের আপ্যায়নের জন্য আল্লাহপাক জাহান্নামকে প্রস্তুত রেখেছেন?

www.pathagar.com

অবিশ্বাসীরা হয়ত বলবে পরকাল অনেক দূরবর্তী প্রসঙ্গ, তা নিয়ে পার্থিব এই মধুর জীবনটাকে বিচলিত করে লাভ নেই। বরং পৃথিবীবক্ষে জীবনের যে বাস্তব দাবী সেইদিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। অবিশ্বাসীদের এই বক্তব্য কথঞ্চিৎ প্রণিধানযোগ্য বলেই প্রশ্ন করি- আল্লাহপাক যা বলেছেন, আল্লাহর নবী (সাঃ) যে-সকল বিষয়ে সাবধান করেছেন, তার ম্যূ্য কি কেবল পারলৌকিক কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? জাগতিক প্রেক্ষাপটে তার কার্যকারিতা কি খুবই অকিঞ্চিৎকর ও গৌণ? যদি তাই হয়, তাহলে অন্তত অবিশ্বাসের একটা হেতু খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কার্যত এ-রকম তো নয়ই, বরং পৃথিবীতে মানুষ জেনে না-জেনে স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় এখনো যেখানে যেটুকু উৎকৃষ্ট বোধ কি জীবনাচার আঁকড়ে ধরে আছে, তা সবই ইসলামের অবদান; এবং যা কিছু অশুভ অহিতকর তা সবই ইসলামের সুস্পষ্ট বিধানমতে নিষিদ্ধ। এমন একটিও দৃষ্টান্ত এই পৃথিবী তুলে ধরতে সক্ষম নয়, যা যথার্থই উত্তম কিন্তু ইসলামে নেই, এবং যা যথার্থই ক্ষতিকর ও মানব-বৈরী কিন্তু ইসলামে আছে। ইসলাম একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং নবী (সাঃ) সেই সর্বোত্তম বিধানেরই এক নিঁখুত ও যথাযথ ও বিশ্বস্ত প্রতিবিম্ব। অর্থসম্পদের একনিষ্ঠ ক্রীতদাস ও ক্ষমতালিপ্সু ও স্বার্থান্ধ এই পৃথিবীর পক্ষে অনুধাবন করা কঠিন যে, নবী (সাঃ) কত বড় এবং তাঁর প্রদর্শিত পথ সর্বকালের সকল মানুষের জন্যই কত সুন্দর ও কল্যাণকর ও শান্তিময়। নিন্দুকেরা কখনো সত্য বলে না, যা বলে তা কোন-না-কোন হীন উদ্দেশ্য অথবা পশুপ্রবৃত্তিচালিত নিষিদ্ধকথা। নাহলে পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে অবিশ্বাসীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই বলতো, ইসলাম যা অনুমোদন করে তা আশীর্বাদ, যা করে না তা সবই নিখাদ অভিশাপ; বল্‌তো, সর্ববিষয়ে ইসলাম যে সীমারেখা চিহ্নিত করে তার বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো আক্ষরিক অর্থেই এক নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

একটি দু'টি উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি বিবেচনা করতে পারি। 'মানবাধিকার' আধুনিক পৃথিবীর একটি অন্যতম জরুরি উপাদান, 'গণতন্ত্রও' একইরকম জরুরি। এবং 'সর্বরোগের মহৌষধ' এই দুই কল্যাণবটিকার এত বিপুল ভক্ত ও দালাল সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে যে, এর বিভ্রান্তিকর 'মহত্ব' পরিহারের উপায় নেই। কিন্তু আজ এই দুটি বিষয় যেভাবে গৃহীত এবং তার যে-প্রায়োগিক রূপ, তার মধ্যে আসলে বিরাজ করছে ফাঁকি ও প্রতারণার এক বিশাল গহ্বর। মানবাধিকার কি গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে মানুষের অধিকারকে হরণ করাই বর্তমান পৃথিবীর যে-কোন রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ার চরিত্রবৈশিষ্ট্য। না-হলে ইরাকের শিশুবৃদ্ধদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ সম্ভব হতো না; তীব্রতম ও 'ফলপ্রসূ' মার্কিনী আক্রমণের সংবাদ পেয়ে প্রেসিডেন্ট বুশ অলিন্দে পায়চারি করতে করতে বলতে পারতো না, 'আমি পরিতৃপ্ত'। এবং আরো আগে সদ্য-আবিষ্কৃত আণবিক বোমার প্রকৃত শক্তি ও ক্ষমতা আসলেই কতখানি, তা নির্ভূলভাবে নিরূপণের জন্য ট্রুম্যান জাপানের সর্বাপেক্ষা জনবহুল দুটি নিরপরাধ নগরবাসীকে লক্ষ্যস্থল হিসাবে বেছে নিতে

www.pathagar.com

পারতো না। এবং সোভিয়েত সরকারই কি পারতো তার দেশবাসীকে অভুক্ত রেখে বোমা-বানানোর বর্বর প্রতিযোগিতায় নামতে? সত্যই সর্বমানবিক দায়িত্ববোধ ও প্রেমের এমন 'উৎকৃষ্ট' দৃষ্টান্ত আর হয় না! অথচ মহানবী (সাঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, শিশু বৃদ্ধ ও তপস্যারত কোন শত্রু, ফলদায়িনী কোন বৃক্ষ, শস্যক্ষেত্র, এ-সবকিছুর উপরে তরবারি উত্তোলন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তিনি কেবল ধর্মীয় কি আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন না, বহু যুদ্ধেও তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে, এবং তিনি স্পষ্ট ও যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর এই যুদ্ধনীতির বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রয়োগ। নীতি হিসাবে কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য, কোন্‌টা মানবসম্প্রদায়ের জন্য উপকারী ও কাম্য ও অনুসরণীয়? আসলেই একালে 'মানবাধিকার' একটি কৃত্রিম ও লোকঠকানো শ্লোগান মাত্র, যা খুব উচ্চৈস্বরে নিনাদিত হচ্ছে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা একটি অসার ও অন্তঃসারহীন হ্রেষারব। যথাযথ মানবাধিকার কী জিনিষ তার অকৃত্রিম ঘোষণা ও সর্বোত্তম ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত কেবল ইসলামের মধ্যেই সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে। কারণ কথার মাধুরি দিয়ে নয়, কাজ দিয়ে জীবন দিয়ে মানবপ্রেমকে প্রতিষ্ঠা করাই প্রকৃত মানবাধিকার; নবী (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা সেই দৃষ্টান্তই পুনঃপুনঃ স্থাপন করেছেন। মানুষের প্রতি মানুষের যে মানবিক দায়িত্ববোধ, তাকে এমনকি দুঃসহতম সংকটের মধ্যেও জাগরুক রাখতে হবে, এ-থেকে কোন অবস্থাতেই-যে কোন মানুষের নিষ্কৃতি নেই, এই সত্য এই মানবিক মহিমা ইসলামই তুলে ধরেছে। মানুষের প্রতি কর্তব্য ইসলামের এমন একটি জরুরি শর্ত, যা থেকে ভুলক্রমেও একবার মুখ ফিরিয়ে থাকার উপায় নেই; এবং এমন কোন পুণ্যকর্ম নেই, যা দিয়ে কোন মানুষ তার এই অপরিহার্য দায়িত্বভার এতটুকু লঘু করতে পারে। এইজন্যই খলীফা হযরত উমার (রাঃ) তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও মানুষের অভাব অনটন দুঃখ দৈন্য অনুসন্ধান করে বেড়ান। কারণ মহানবী (সাঃ) এর শিক্ষানুযায়ী 'খলীফা' মানে রাজা নয়, খলীফা মানে সকল মানুষের সুখ ও কল্যাণের জন্য সদাসতর্ক এক সার্বক্ষণিক প্রহরী। হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হিসাবে তাঁর দায়িত্বগ্রহণের প্রাক্কালে জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্ধারিত পথে আছি, আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন, বিচ্যুতি ঘটলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করবেন আমাকে' 'King can do no wrong` 'Nothing wrong in love and war' এই ধরনের বিশ্ববিশ্রুত অসত্যভাষণ ও মধুর প্রতারণা, এই ধরনের নাটুকে মিথ্যাচার ইসলামে সম্ভব নয়। আধুনিক পৃথিবীকে প্রশ্ন করতে লুব্ধ হই, কোন্‌টা উত্তম? বাকস্বাধীনতার বিষয়টিও উত্থাপন করতে পারি। বর্তমান বিশ্ব এ-নিয়ে মাঝে মাঝেই খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ এবং তাদের বিশ্বস্ত অনুচর অনেক দেশ এই বাকস্বাধীনতা রক্ষার্থে এমন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, যা যুগপৎ হাস্যকর ও আতঙ্কজনক। কৌতুকই বটে, পাশ্চাত্য বিশ্ব একজন সালমান রুশদির জন্য যে-পরিমাণে বিচলিত ও মুখর ও তৎপর

www.pathagar.com

হয়ে ওঠে, তার এক সহস্রাংশও কোটি কোটি মুসলমানের অন্তর্দহনে সৃষ্টি হয় না। আসলে বাকস্বাধীনতা একটি বড় জিনিষ; তার অর্থ লোকনিন্দাও নয়, উন্মাদের অর্থহীন প্রলাপও নয়। অন্য অনেক স্বাধীনতার মত বাকস্বাধীনতারও আছে একটি সুস্পষ্ট দায়িত্বচিহ্নিত সীমারেখা, ইসলাম যা লংঘনের অনুমতি দেয় না। গোপনে কি প্রকাশ্যে কোন মানুষকে, কোন জাতিকে, কোন ধর্মবিশ্বাসকে হেয় করার অনুমতি ইসলামে নেই। লোকনিন্দা ও পরচর্চা ইসলামে একটি গর্হিত অপরাধ। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামে বাকস্বাধীনতা নেই। আছে, বরং ভালোভাবেই আছে। মহানবী (সাঃ) বলেন ক্ষমতাসীন বাদশাহর সম্মুখে উচিত কথা উচ্চারণ করা সর্বোত্তম জেহাদ। এবং উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র এক প্রস্থ কাপড়ের জন্য খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)কেও লোকসমক্ষে জিজ্ঞাসিত হয়ে ব্যাখ্যাদান করতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই হলো বাকস্বাধীনতা; সত্য ও ন্যায় ও মানবসম্প্রীতির প্রেক্ষাপটে ইসলাম নির্ধারণ করে বাকস্বাধীনতার সীমারেখা। যা মানুষকে কলহপ্রবণ করে, পরস্পরের প্রতি বৈরী ও শ্রদ্ধাহীন করে তোলে, পরিবেশকে করে কর্দমাক্ত, বাকস্বাধীনতার নামে সেই অসুন্দরের চর্চা ও মিথ্যাভাষিতাকে ইসলাম প্রশ্রয় দেয় না। এই প্রশ্রয়, এই দায়িত্বহীন অসংযত বাগ্‌বিস্তার যে মনুষ্য সমাজের পক্ষে কত অপকারী ও সর্বনাশা, পৃথিবী আজ তা মর্মে মর্মে অনুভব করছে। এবং এই তথাকথিত বাকস্বাধীনতার যে প্রেম ও পরিবেশবিধ্বংসী ভূমিকা, সে তুলনায় এমনকি আণবিক বোমাও বহুগুণে উপাদেয়।

ইসলামে অহংকার একটি অতি ধিক্কৃত পাপ। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অহংকার অন্য কারো জন্যই সিদ্ধ নয়। নবী (সাঃ) বলেছেন — যার মনে রয়েছে কণামাত্র অহংকার সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। পৃথিবীর চোখে কে উত্তম, কে প্রিয়, কে অধিক আস্থাভাজন? কুণ্ঠিতনাসা অহমিকাসর্বস্ব কোন উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী, না সরল ও নিরহংকার ও মানবপ্রেমে দ্রবীভূত কোন হৃদয়বান মানুষ? পৃথিবীর জন্য কোন্‌টা অধিক স্বাস্থ্যকর, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, না ভঙ্গ করা? হিটলার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল, রাশিয়া করেছিল, রাজা বাদশাহ ক্ষমতাসীন কি ক্ষমতাকামী সবাই ভঙ্গ করে। আর ইস্ট-রিভারের পারে দাঁড়ানো বহুতল জাতিসংঘভবন তো প্রতিশ্রুতিভঙ্গেরই এক বিশ্বনন্দিত তীর্থস্থান। এটা আজ আর কোন পাপই নয়, বরং যথাসময়ে ও যথা প্রয়োজনে যে যত ত্বরিৎ প্রতিশ্রুতিভঙ্গে পারঙ্গম সে তত যোগ্য ও দক্ষ কুশলি। কিন্তু পৃথিবীর কোন মানুষ কি এটা চায়? চায় না। এমনকি সর্বদা প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী ঘোরতর প্রতারকও আশা করে তার প্রতিপক্ষ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুক। নবী (সাঃ) কী বলেন? ওয়াদা ভঙ্গকারী মুনাফিক। কোন অবস্থাতেই কোন মানুষের বিন্দুমাত্র ওয়াদাভঙ্গেরও কোন অধিকার নেই। বদর যুদ্ধে তিন গুণেরও অধিকসংখ্যক শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে মোহাম্মদ (সাঃ)কে। খুবই সৈন্যসংকট কিন্তু এই যুদ্ধে দু'জন সাহাবী অংশগ্রহণ করেন নি। যুদ্ধের অব্যবহিত আগে পিতাপুত্র এই দু'জন সাহাবী কোথাও থেকে মদীনায় ফিরছিলেন।

www.pathagar.com

পথিমধ্যে মক্কার একদল মুশরিক তাঁদেরকে গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী করে। সাহাবী দু'জন বললেন যে তাঁরা নিরপরাধ, যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। মুশরিকরা তাঁদেরকে ছেড়ে দিল একটি বিশেষ শর্তে যে, আসন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে তাঁরা বিরত থাকবেন। মদীনায় ফিরে এলেন তাঁরা। যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। পিতাপুত্র দু'জনেই নবী (সাঃ)এর কাছে সকল কথা খুলে বললেন। নবীজী বললেন, 'তোমরা ওয়াদা রক্ষা করো'। এমন সংকট, এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও এমন সিদ্ধান্ত কেন দিলেন? দিলেন কারণ, শুধু আল্লাহর সমীপে জবাবদিহির প্রশ্নই নয়, তিনি জানতেন, যে কোন ধরনের মিথ্যা, খেয়ানত ওয়াদাভঙ্গ, পরচর্চা-দম্ভ-ছলনা, এইসব নোংরা আবর্জনা পুরো মানবসমাজকেই একটি অবাসযোগ্য নর্দমায় পরিণত করে। এই ধরনের কুৎসিত উপসর্গের প্রভাবাধীন পৃথিবী- কখনো মানুষের পৃথিবী হতে পারে না। বলা বাহুল্য মহানবী (সাঃ) সত্য সুন্দর, সততা প্রেম ও বিশ্বস্ততায় পূর্ণ, মানবিক মহিমায় অত্যুজ্জ্বল, শ্লীল ও পবিত্র একটি সুখময় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন, এবং তা-যে অসম্ভব নয়, তা প্রমাণ করেছেন। আল্লাহপাকের কাছ থেকে সরাসরি প্রাপ্ত নির্ভুল বিধান ও নিয়ম ও সংবিধান অনুযায়ী তিনি সেই পৃথিবীর পূর্ণাঙ্গ একটি মডেল তৈরী করে বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন। এবং এটা-তো পরীক্ষিত সত্য যে, ইসলাম সেই ধর্ম যা পার্থিব ও পারলৌকিক দুটি জীবনকেই মানুষের কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত সুখময় রূপদান করতে পারে। কিন্তু মুরগির খামার থেকে পার্লামেন্টভবন কি শেয়ার মার্কেট থেকে ন্যাশনাল কংগ্রেস, ডাউনটাউন থেকে শৈলনিবাস কি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিডওয়ে ম্যাকডোনাল, এই হলো দূরদৃষ্টিহীন আত্মমগ্ন আধুনিক মানুষের কক্ষপথ। অথচ ইসলাম অন্য জিনিষ; ইহকাল পরকাল সর্বদেশ ও সর্বমানুষে সমানভাবে পরিব্যাপ্ত ইসলাম অনন্ত তাৎপর্যে দীপ্যমান এক বিশাল মিশন। এবং এই মিশন যেহেতু আল্লাহপ্রদত্ত একটি 'নেয়ামত', শ্রেষ্ঠতম ও 'পরিপূর্ণ অনুগ্রহ' এর মধ্যে কোন ত্রুটি কি অসম্পূর্ণতার কথা ভাবাই যায় না। সীমাহীন মূঢ়তাবশত সংশোধন কি বর্জন, সম্প্রসারণ কি পরিমার্জনের কথা কেউ বললে বলতে পারে, কিন্তু সেই মূঢ়তা নিতান্তই এক বিশুদ্ধ মূঢ়তা।

পৃথিবী যে আজ এক অন্তহীন গোলকধাঁধার মধ্যে নিক্ষিপ্ত, সব থেকেও সে-যে রিক্ত অসুখী বিক্ষিপ্তমনা, প্রায় 'ভূতে পাওয়া' রোগীর মত অসংলগ্ন তার আচরণ, তার একমাত্র কারণ-তো এই যে, ইসলামের সরল ও স্বাভাবিক ও প্রকৃতিসম্মত জীবনপ্রণালীকে জিদ কি অজ্ঞতাবশত সে অবজ্ঞা করে চলেছে। আশা করি ধরাপৃষ্ঠ থেকে এই দুঃসময় আল্লাহপাকের অনুগ্রহে কোনদিন তিরোহিত হবে। যদিও অবিশ্বাসীদের বোধোদয় ঘটতে সম্ভবত এখনো অনেক দেরী; যদিও নষ্ট হতে হতে পৃথিবী এমন এক জায়গায় পৌঁচেছে যেখান থেকে ফেরা কঠিন; কারণ হেরোইন কি ম্যানড্রেক্সসেবী নেশাগ্রস্তের কাছে লাবন্যময় স্বাস্থ্য কি নৈতিকতার কথা মূল্যহীন, সে চায় আরো নেশা, চায় উত্তেজক আরো কোন নেশার উপকরণ। তবু সত্য যে, অবিশ্বাসীদের

www.pathagar.com

জগৎ আজ একটু একটু বিচলিত হচ্ছে, এবং তাদের অবিশ্বাসরূপ অন্ধকার মহাসমুদ্রে সৃষ্টি হচ্ছে একটু একটু আলোর কম্পন। এটাই মনস্তত্ত্বসম্মত যে, আলো কী তা বুঝবার জন্য আবশ্যক নিরন্ধ্র নিশ্ছিদ্র অন্ধকার; সেই নিকষ কালো অন্ধকারেই আজ ঢাকা পড়েছে মানুষের মন, হয়ত অচিরেই পৃথিবীময় জেগে উঠবে আলোর পিপাসা। হয়ত সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন ভুল লক্ষ্যে শরবর্ষণ বন্ধ করে মানুষ ফিরে আসবে নবী(সাঃ)এর স্বহস্তে জ্বালানো আলোকবর্তিকার কাছে। ইসলামের আহবান থেমে যায় নি, মানুষ-যে সত্যের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে সেই সময়ও অতিবাহিত হয়ে যায় নি। আর যখনই আসুক, ইসলামের সিংহদ্বার উন্মুক্ত, ইসলামের ছায়ায় অবতরণমাত্র তার অতীতের পাপ ও গ্লানি নিঃশেষে ঝরে পড়ে, সে সসম্মানে শামিল হয়ে যায় সৎকর্মশীল ঈমানদারদের মিছিলে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)এর ক্ষেত্রে হয়েছিল, এমনকি নবী (সাঃ)এর প্রিয়তম পিতৃব্য হযরত হামজা (রাঃ)এর নির্মমতম ঘাতক ওয়াহশি (রাঃ) এর ক্ষেত্রেও হয়েছিল। অতএব ইসলামের দিক থেকে কোন বাধা নেই। মানুষ তার সংস্কার ও মূঢ়তা, আত্মবিনাশী ভোগ ও পার্থিব কুশ্রীতাকে পরিত্যাগ করে সত্য ও সুন্দর ও কল্যাণের ডাকে এখন সাড়া দিলেই হলো। আর কত? অবিশ্বাস কি অর্ধবিশ্বাস থেকে বিশুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ছাড়া ঘরে তোলার মত কিছুই তো পাওয়া গেল না! অর্থ ও সম্পদের পশ্চাদ্ধাবনে পরিশ্রান্ত মানুষ আজ ঠিকই বুঝতে পারছে, ডলার আসলে এক হ্যামিলনের বাঁশি যা স্বখাত সলিলে নিক্ষিপ্ত হবার একটি মায়াময় হাতছানি মাত্র। পকেটভর্তি ডলার শুধু পঞ্চতারকাখচিত হোটেলের শয়নকক্ষ রিজার্ভ করতে পারে, এ-দিয়ে বান্ধবীসহ মার্সিডিসে আরোহণ কি আটলান্টিক সিটিতে ক্যাসিনো জমিয়ে নিশিযাপন করা যায়, কিন্তু বুকের মধ্যে ক্রমাগত সঞ্চিত হয়েছে যে আগুন, যে ব্যর্থতা, যে নিদ্রাহীন উদ্বেগ, সমগ্র জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে দাবানলের মত যে উপদংশ, তার উপশম কি নিরাময়ের উপায় ও ব্যবস্থাপত্র ডলারের হাতে নেই, হার্ভার্ড কি নালন্দা কেমব্রীজ কি পিট্‌সবার্গের কোন পণ্ডিতেরও নেই। রুগ্ন পৃথিবীর জন্য সেই অভ্রান্ত ব্যবস্থাপত্র ও চিকিৎসার নাম ইসলাম। পৃথিবী আজ বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভালোভাবেই অবগত হয়েছে, মহানবী (সাঃ) এর এক- একটি কথার কী গুরুত্ব, এক-একটি বিধানের কী কল্যাণময় কার্যকারিতা! তাঁর পেশকৃত কথা ও কর্ম ও আদর্শের সম্মুখে আজ কত অকাট্যভাবেই-না প্রমাণিত হচ্ছে, পৃথিবী নামক এই শ্যামল গ্রহে অদ্যাবধি আবির্ভূত সকল মনীষীর সম্মিলিত আবিষ্কারও কত তুচ্ছ ও ভঙ্গুর, কত অনাবশ্যক ও অপরিণামদর্শী! মহানবী (সাঃ)এর আদর্শরিক্ত এই অপরিণামদর্শী পৃথিবীরই অপর নাম প্রগতিশীল আত্মমুগ্ধ আধুনিক বিশ্ব, এবং ইসলামী পরিভাষায় 'সুশোভিত জাহান্নাম'।

www.pathagar.com

প্রিয়তম নবী : প্রকৃষ্টতম পথ

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে সোয়া-চৌদ্দশ বছর আগে মক্কায় কাবাশরীফ সংলগ্ন একটি গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহানবী (সাঃ); তারপর কিঞ্চিদধিক ৬২ বছর পৃথিবীতে কাটিয়ে তিনি আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করেন আজ থেকে ১৩৭০ বছর পূর্বে ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে। বিশ্বাসীরা জানেন এবং অবিশ্বাসীরা মুখে যাই বলুক, তারাও জানে, মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন আল্লাহপাকের বিশেষভাবে মনোনীত ও প্রেরিত পুরুষ। অবশ্য এক অর্থে সবাই প্রেরিত, কারণ আমরা সকলেই আল্লাহর নিকট থেকে আসি এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যাই। কিন্তু মহানবী (সাঃ)এর আবির্ভাব ও প্রত্যাবর্তন সাধারণ আসা-যাওয়ার মত নয়, তা আল্লাহপাকের এক সুনির্ধারিত অভিপ্রায় ও সুস্পষ্ট অনুগ্রহেরই পরমতম বাস্তব রূপ। এবং পৃথিবীময় বর্তমান ও অনাগত সমগ্র মানববংশের সার্বিক কল্যাণার্থেই আল্লাহপাকের এই অভিপ্রায় ও অনুগ্রহ।

মহানবী (সাঃ) যেদিন জন্মগ্রহণ করেন, তার মাসাধিককাল আগে—কোন বর্ণনামতে ছয় মাস—আবরাহা এসেছিল কাবাশরীফ ধ্বংস করতে; অসংখ্য অলৌকিক আবাবিল পাখির কংকরাঘাতে আবরাহার সৈন্যসামন্ত ও হস্তীবাহিনী ভক্ষিত তৃণের মত ধ্বংস হয়ে গেল। তাঁর জন্মমুহূর্তে পারস্যের সহস্র বৎসরের নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত উপাস্য-অগ্নিকুণ্ড নিভে গেল আকস্মিকভাবে। আকস্মিক ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে ভেঙ্গে পড়লো পারস্যসম্রাটের শাহীমহল ও রাজপ্রাসাদের চৌদ্দটি চূড়া; হঠাৎ শুকিয়ে গেল পারস্যের অধিভুক্ত এক বিরাট হ্রদ, রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি বিশাল জলাশয়ের পানি হ্রাস পেলো অস্বাভাবিকরূপে, এবং এ-রকম আরো অনেক ঘটনা। কাকতালীয় বলে কেউ উপেক্ষা করতে পারে কিন্তু এ-সবই ইতিহাস। এবং তাৎক্ষণিকভাবে যদিও এর অর্থ বা হেতু বা তাৎপর্য ধরা পড়ে নি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে বুঝা গেল, এর কোনটাই কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়, সবই মহান আল্লাহপাকের পবিত্র অভিপ্রায়সম্ভূত এক-একটি শুভ সতর্কসংকেত, এক পরম পুরুষের শুভ আবির্ভাবের অগ্রিম বার্তা। কারো অজানা নয়, মহানবী (সাঃ) এর পিতা আবদুল্লাহ বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে কয়েকদিন মাত্র কাটিয়ে বাণিজ্যব্যপদেশে বেরিয়ে যান কিন্তু আর ফিরে আসেন নি; প্রত্যাবর্তনের পথেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মহানবী (সাঃ) তখন জননীগর্ভে। এবং জননী আমিনাও যখন মারা যান তিনি তখন নিতান্তই ষষ্ঠ বর্ষীয় এক বালক। প্রথমে বুঝা যায়নি কিন্তু এখন এটা সুস্পষ্ট যে, আবদুল্লাহ এবং জননী আমিনাকে আল্লাহপাক এই গ্রহে প্রেরণ করেছিলেন মোহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র অবতরণের প্রকৃতিসম্মত উপলক্ষ হিসাবে। এবং এই মহত্তম দায়িত্বটুকু সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনক-জননী উভয়কেই আল্লাহপাক অব্যাহতি দিলেন পার্থিব সকল তুচ্ছ কর্ম থেকে। বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব এই মহান

www.pathagar.com

পুরুষের জীবন শুরু হলো সম্পূর্ণ এতীম অবস্থায়; কিছুদিন পিতামহ আবদুল মুত্তালিব কিছুদিন পিতৃব্য আবু তালিবের আশ্রয়ে, পিতৃব্য কি পিতামহের অকৃত্রিম স্নেহস্নিগ্ধ বটে, কিন্তু ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য থেকেও বঞ্চিত অভাব ও দারিদ্র্য ও ক্লেশভারে কন্টকিত এক জীবন। বাল্য কৈশোর ও বিবাহপূর্ব যৌবন এইভাবেই অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু কী বিস্ময়কর, জীবনের এই প্রচণ্ড দাবদাহ, এই সীমাহীন রূঢ়তার মধ্যেও কোন অর্থেই কোন পাপ তাকে স্পর্শ করে নি। একেবারেই বালক-বয়সে পবিত্র কাবাশরীফের সংস্কারকর্মে তিনিও একবার অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইট ও পাথরবহনে তাঁর ক্লেশ লক্ষ করে পিতামহ আবদুল মুত্তালিব তাঁকে পরিধেয় বস্ত্র মাথায় বেঁধে নেবার পরামর্শ দিলেন। সবাই হতবাক, তিনি কাপড়ের গিঁটে হাত রাখামাত্র লজ্জায় জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। বয়স্কদের মধ্যেও নগ্নতা যখন একটি অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা, তখন নিতান্তই এক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের এই তীব্র লজ্জানুভূতি বিস্ময়করই বটে। আরবে তখন এক ধরনের বিনোদন ছিল, রাতভর গল্পের আসর। মোহাম্মদ (সাঃ) প্রথম কৈশোরে একবার এই গল্পের আসরে যাবেন বলে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কোন এক স্থানে কোন কারণবশত কিছুটা যাত্রাবিরতি করেন। কিন্তু বড় আশ্চর্য, এই কিশোর সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন; ঘুম যখন ভাঙ্গলো আসরও তখন ভেঙ্গে গেছে। তাঁর আর যাওয়াই হলো না, এবং পরবর্তীকালে এই ইচ্ছাও আর জাগে নি। আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে হেফাজত করেছেন। সকল অশ্লীলতা অনাবশ্যক ও তুচ্ছ বিনোদন থেকে মুক্ত করে পৃথিবীকে যিনি দেখাবেন এক চূড়ান্ত সত্যের সুস্পষ্ট পথরেখা, সেই মানুষটি কোন নিরর্থক গল্পের আসরে উপবিষ্ট আছেন, এইটুকু বেমানান ভূমিকাও তাকে স্পর্শ করতে পারলো না। সবাই অবহিত, এই মানুষটি জীবনে অসতর্কতাবশত কি পরিহাসচ্ছলেও একটি মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করেন নি, জীবনের সর্বাধিক সংকটময় মুহূর্তেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নি, বিস্মৃত হন নি কারো কোন গচ্ছিত আমানতের কথা। এমনকি একেবারেই যখন শিশু, বয়স দুই বছরও নয়, তখনো ধাত্রীমাতা হালিমার শুধু একটি স্তনের দুধই পান করেছেন, অপরটি রেখে দিয়েছেন হালিমার গর্ভজাত সন্তানের জন্য। কী ইনসাফ! অনেক দাসকে মুক্ত করে দিয়েছেন, মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু নিজের জন্য জীবনে একটি গোলামও খরিদ করেন নি। দু'একজন গোলাম তাঁর সঙ্গে থেকেছে কিন্তু তারা ছিল আযাদকৃত, সর্বাধিক স্নেহে ও মর্যাদায় ধন্য, পরিবারেরই অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য। চন্দ্রবিভক্তি বা দুশমনদের সজাগ প্রহরা সত্ত্বেও হিজরতের জন্য অনায়াস বহির্গমন, এসব না হয় নবুয়ত পরবর্তী ঘটনা, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত, তাঁর যে নির্মল ও নিষ্পাপ ও কলঙ্কশূন্য জীবন তা অবলোকন করে ঘোরতর অবিশ্বাসীর মধ্যেও এক ধরনের চাঞ্চল্য ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না-হয়ে পারে না। তারা ভাবতে বাধ্য হয় যে, একটি রক্তমাংসে গঠিত মানবচরিত্রে শুধু কাকতালীয়ভাবে এমন সব ঘটনা ও অনুঘটনার মহিমান্বিত পুষ্পমাল্য রচিত হওয়া অসম্ভব। এমনকি অতিশয়

www.pathagar.com

প্রস্তরকঠিন বেঈমানের অন্তরও এই ভেবে একটু একটু শিহরিত হয় যে, মোহাম্মদ (সাঃ) নামের এই মানুষটির মধ্যে ও নেপথ্যে নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই দ্বিধাপীড়িত ও জটিল ও বক্ররেখাগামী অবিশ্বাসীরা বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না যে, এই 'একটা কিছুরই' অপর নাম মহান আল্লাহপাকের সুনির্দিষ্ট মনোনয়ন। এই 'একটা কিছুর' সরল ও প্রকৃত অর্থ, সমগ্র বিশ্ব এবং জাতি বর্ণ দেশকাল নির্বিশেষে সমগ্র মানববংশের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত ঐশী বার্তাবহ এক মহামহিমান্বিত পুরুষের উদয় ও আবির্ভাব।

আধুনিক পৃথিবী যুক্তি ও বিজ্ঞানের পৃথিবী। তথ্য উপাত্তের সমন্বয় ও সঠিক হিসাব ও বিশ্লেষণে যা বার বার প্রমাণিত হয়, বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক বিশ্ব তাকে সত্যের মর্যাদাদানে কুণ্ঠবোধ করে না। এক্স-রে যখন জার্মান সাহেব Rontgen এর টেবিলে ফুটে উঠলো, তার উৎস ও কারণ সম্পর্কে তিনি ছিলেন অজ্ঞ। কিন্তু এই অজ্ঞতার কারণে তিনি বা অন্য কেউ রশ্মিটিকে অস্বীকার করেন নি, কারণ পরীক্ষায় এই অজ্ঞাত-উৎস রশ্মিটির আবির্ভাবে কোন ব্যত্যয় ঘটছে না। যতই অস্পষ্টতা থাক, একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াধীনে যদি ফলাফলে কোন ব্যতিক্রম কি হেরফের না ঘটে, বার বার ফিরে আসে একই জবাব, তাহলে তার সত্যতাকে অস্বীকার করা মূঢ়তা। আধুনিক বিজ্ঞান এই মূঢ়তাকে প্রশ্রয় দেয় না। কার্যকারণ সূত্রের অনুসন্ধানে বিজ্ঞান যে-পরিমাণে সৎ ও তৎপর, সত্যের স্বপক্ষে ভূমিকা গ্রহণেও সে একইরকম নির্ভীক ও নিরাপস। অথচ মহানবী (সাঃ)কে নিয়ে স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী আধুনিক-বিশ্বের যে স্ববিরোধী ভূমিকা, তা যুগপৎ বিস্ময়কর ও দুঃখজনক। দুঃখজনকই বটে, কারণ মহানবী (সাঃ) এর সমগ্র জীবন তন্নতন্ন করে খুঁজেও যখন একটিও কোন ত্রুটির সন্ধান পাওয়া গেল না, সহস্র রকমের পরীক্ষাতেও পুনঃপুনঃ ফুটে ওঠে একই রেজাল্ট, বারবারই নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয় তাঁর মালিন্যমুক্ত মহিমান্বিত রূপ, এতদসত্ত্বেও বিজ্ঞানমনস্ক অস্বীকারকারী ও অংশীবাদী ও কপটদের কাছে তিনি অচেনাই থেকে গেলেন। কিছুই করার নেই, বলারও নেই; এই দুর্ভাগা অভিশপ্তদের বহুযত্নে আহৃত জ্ঞান আসলে সত্যের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনেরই দক্ষতা, আলোর পরিবর্তে অন্ধকারকে সপ্রীতি আলিঙ্গনেরই নামান্তর। কোন সন্দেহ নেই, এরা তার্কিক ও পথভ্রষ্ট ও অপরাধী; আর আল্লাহপাকের সুস্পষ্ট ঘোষণা, 'অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত'।

নবী (সাঃ)কে অস্বীকারের হেতু কী? আল্লাহপাক নিজে তাঁর এই প্রেরিত মহাপুরুষের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন, তাঁরই মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য মেলে ধরেন চূড়ান্ত দ্বীন ও হেদায়াত ও সাফল্যের সুপ্রশস্ত রাজপথ— এ-সব কথা না-হয় সংশয়বাদীদের উপলব্ধিতে আসে না, কিন্তু মানুষের নিজেরও তো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার ধরন কি প্রক্রিয়া আছে। সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও তো মানুষ একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে

www.pathagar.com

পারে। একটি মানুষ যাই দাবী করুন, লোকে যাই বলুক বা লোকসমক্ষে যেভাবেই প্রতিভাত হোন, তাঁর আসল পরিচয় কী, তা নির্ধারণে মানুষের কিছু অকাট্য ব্যবহারিক Experiment আছে। 'সিআইএ' কি 'র' কি 'কেজিবি', 'মোশাদ' কি 'গেস্টাপো' প্রমুখ গুপ্তচর সংস্থার একটি উল্লেখযোগ্য ও অব্যর্থ ও অবশ্যমান্য শিক্ষা হলো, মানুষের দুর্বলতম জায়গাটিকে চিহ্নিত করা ও তদনুসারে ব্যবস্থাগ্রহণ। আর এই দুর্বলতা নির্ভূলভাবে সনাক্ত করার প্রধানতম উপায় হলো, তার অন্তরের গোপনতম স্বপ্ন ও অভিপ্রায়কে জেনে নেয়া। একটি মানুষ আসলে কী, সেই পরিচয় সত্যই অত্যন্ত নির্ভুলভাবে লুকোনো থাকে তার একান্ত নিভৃত আকাঙ্ক্ষাসমূহের মধ্যে। বলতে লুব্ধ হই, মহানবী (সাঃ) এর নিভৃততম বাসনার মধ্যে আল্লাহ ও আল্লাহর নির্দেশিত বাক্য ছাড়া একটি অন্য কোন ক্ষুদ্রতম পার্থিব জীবাণুও আবিষ্কার করা অসম্ভব। বিশ্ববিখ্যাত গবেষকেরা শ্রমক্ষয় করে দেখেছেন, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এই মানুষটির মধ্যে দ্বিতীয় কোন জিনিষই নেই; আল্লাহপাকের নিকট থেকে আগত যে মহাপবিত্র গ্রন্থ, তিনি তারই এক নিখুঁত মানবিক প্রতিচ্ছবি। দুঃখ কষ্ট সংগ্রাম, লাঞ্ছনা অপমান লোভ প্রলোভন আততায়ীর উদ্যত কৃপাণ— যাই থাক, যাই ঘটুক এই মানুষটি সর্বমুহূর্তে কেবল আল্লাহকেই একমাত্র জ্ঞান করেন এবং আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল। তিনি পার্থিব কোন সাফল্য চান না, সুখ চান না, সবকিছু নিঃশেষে উৎসর্গ করে তিনি শুধু চান এই ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহপাকের মনোনীত জীবনবিধানের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা ও বিজয়। হিজরতের রাতে ঘাতক পরিবেষ্টিত গৃহ থেকে তিনি যখন ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন, সেই কঠিনতম সংকটময় মুহূর্তেও বললেন না, 'হে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করো'। তিনি সূরা ইয়াসিনের প্রথম অংশ থেকে কিছু পাঠ করলেন এবং বললেন, 'রাব্বি আদখিলনি মুদখালা সিদকিঁউ ওয়া আখরিজনি মুখরাজা সিদকিঁউ ওয়াজায়াল্লি মিল্লাদুনকা সুলতানান্নাসিরা'। অর্থাৎ 'হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে যেখান থেকেই নিয়ে যান পবিত্রতার সঙ্গে বহির্গত করুন, যেখানেই নিয়ে যান পবিত্রতার সঙ্গে প্রবেশের ব্যবস্থা করুন এবং দান করুন আপনার সাহায্যপুষ্ট শক্তি ও ক্ষমতা'। এবং কী আশ্চর্য, ঘাতকদের গচ্ছিত আমানতের হিসাবসহ প্রিয়তম ভ্রাতা হজরত আলী (রাঃ)কে শুইয়ে রেখে গেলেন প্রাণঘাতী দুশমনদের লক্ষ্যবস্তু তাঁর আপন শয্যায়। কোন ভয় নেই, উদ্বেগ নেই, বিন্দুমাত্র বিচলিত হবার লক্ষণ নেই— শুধু আল্লাহর কাছে একটাই প্রার্থনা, যত কঠিনই হোক, আমার কর্মধারা থেকে যেন কণামাত্র বিচ্যুতি না- ঘটে, যেন পরিপূর্ণরূপে অক্ষত থাকে আমার পবিত্রতা। তারপর সওর পর্বতের গুহায় তিনি যখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)কে নিয়ে আত্মগোপন করেছেন, অনুসন্ধানী ঘাতকদের পা দেখা যাচ্ছে, মুহূর্তমধ্যে হয়ত গুহায় প্রবেশ করবে তারা। হজরত আবু বকর (রাঃ) ভয়ার্তকণ্ঠে ক্ষীণস্বরে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ আমরা মাত্র দু'জন, কী হবে?' এই সেই সিদ্দিকে আকবর যিনি বয়স্ক আযাদ পুরুষদের মধ্যে প্রথম মুসলমান, যিনি নবী (সাঃ)এর মেরাজশরীফের ঘটনা

www.pathagar.com

বিনাপ্রশ্নে অকাট্য সত্য হিসাবে বিশ্বাস করেছিলেন, তিনিও অতি স্বাভাবিক মানবোচিত উৎকণ্ঠায় ক্ষণিকের জন্য দিশাহারা। অবশ্য তাঁর উদ্বেগ নিজেকে নিয়ে নয়, রাসূল (সাঃ) কে নিয়ে। রাসুল (সাঃ) তাঁকে অভয় দিয়ে নির্বিকার নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'আমরা তিন জন, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন'। তাঁর জীবন ছিল সর্বদা শত্রুপরিবেষ্টিত, বহু হন্তার সার্বক্ষণিক লক্ষ্য ছিলেন তিনি, যে-কারণে সাহাবীরা পালাক্রমে তাঁর দেহরক্ষী হিসাবে পাহারায় থাকতেন। কিন্তু যখন ওহী নাজিল হলো, 'আল্লাহপাক আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষ থেকে' পাহারা উঠিয়ে দিলেন তিনি। এই অহি নাজিল হবার পূর্বেও তিনি একইরকম ছিলেন, শুধু মানবিক উদ্বেগ ও গভীর প্রেমবশত সাহাবীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। নবী (সাঃ) সুস্পষ্টরূপেই জানতেন, আল্লাহর অভিপ্রায়ই চূড়ান্ত। সমগ্র পৃথিবী একত্রিত হয়েও কণামাত্র ক্ষতিসাধন করতে অক্ষম যদি আল্লাহ না চান, আর আল্লাহ যদি চান সারা পৃথিবীর সম্মিলিত প্রতিরোধেও কিছু এসে যায় না, সব চেষ্টা ও সতর্কতা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। বস্তুত নবী (সাঃ) এই বার্তাই বহন করে এনেছিলেন এবং এই সত্যেরই পরমতম দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেছেন নিজেকে। অবিশ্বাসীরা, সংশয়বাদীরা কত ভাবেই-না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো এই মানুষটিকে, কিন্তু আল্লাহর কাছে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পিত এই মানুষটির মধ্যে কোন দ্বিধা কি ভয় কি অনাস্থার লেশমাত্রও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় নি। আসলে বহু মানুষের দুর্ভাগ্য যে, আল্লাহর কথা আল্লাহর রাসুলের কথা, উপেক্ষা করে কি উড়িয়ে দিয়ে স্বকপোলকল্পিত নানা সব মিথ্যার কুহকে প্রতারণাময় বন্দীজীবনই তাদের কাছে প্রীতিকর।

প্রকৃতপক্ষেই পৃথিবীর বড় দুর্ভাগ্য, না-হলে প্রায় দেড় সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, একটি মানুষকে চিনতে এত বিলম্ব হবার কথা নয়। মহানবী (সাঃ) এক অবধারিত সত্যের দিকে আহবান জানানো ছাড়া আর তো কিছুই চান নি, চাইলে তাঁর তেষট্টি বছরের জীবনে একটু-না-একটু রংয়ের বদল ঘটতো। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ মান-অভিমান ক্ষোভ কি অসূয়া কি বিদ্বেষ কোন কিছুরই কোন অস্তিত্ব ছিল না; শুধু পরম প্রভু আল্লাহপাক এবং তাঁর নির্দেশিত দ্বীনই একমাত্র লক্ষ্য। শুধু এই একটি বিষয়ে তিনি ছিলেন নিরাপস ও সংশপ্তক। কাফেররা তাঁর কাছে আপসের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, পিতৃব্য আবু তালিবও সস্নেহে সেই আপসের পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু সেই প্রায়-নিঃসঙ্গ ও দুঃসহতম নির্যাতনের মুখেও তিনি অটল ও অবিচল। তিনি দৃঢ়ভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে জানিয়ে দিলেন, আপস-রফার কোন প্রশ্নই ওঠে না, 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে'। মক্কাবাসীরা সব দিতে চেয়েছিল, কিন্তু হলে কী হবে, সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় তুলে দিলেও কোন অন্যথা হবে না; সৃষ্টিকর্তার যে-অমোঘ বাণী তিনি লাভ করেছেন, তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই তাঁর একমাত্র ব্রত। এবং এইজন্যই প্রিয়তম চাচা হজরত আমীর হামজা (রাঃ) যখন ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং কাফেররা তাঁর কলিজা উৎপাটন করে চিবিয়ে খায়, সেই নৃশংসতার বদলা-গ্রহণে

www.pathagar.com

ঘোষণা করলেন, 'হন্তা ওয়াহসিকে যেখানে পাও হত্যা করো'; কিন্তু কী আশ্চর্য, প্রাণভয়ে পলাতক ওয়াহশি ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নবী (সাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আবু জেহেলের পুত্র ইকরিমার ক্ষেত্রেও এই রকমই ঘটেছিল। সমগ্র জীবন ধরে ইকরিমা রাসুল (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে এক নিরবচ্ছিন্ন পাষণ্ড সংহারের ভূমিকাই পালন করে এসেছে; সেই ইকরিমার স্ত্রী যখন ইকরিমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলো, প্রসন্নবদনে রাসুল (সাঃ) অভয় ও নিরাপত্তার ঘোষণা দিলেন। পলায়নপর ইকরিমা নির্ভয়ে ফিরে এলো নবী (সাঃ)এর পবিত্র স্নেহময় সান্নিধ্যে, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। এবং রাসুল (সাঃ) তাকে এমনভাবে গ্রহণ করলেন, যেন এক নিষ্পাপ বালক, যে কখনো কোন বিরোধিতাই করে নি। এ-সকল দৃষ্টান্তের প্রকৃত তাৎপর্য কী? তাৎপর্য একটাই, ক্ষোভ কি প্রতিশোধস্পৃহা কোন বিষয়ই নয়, যে সত্যের তিনি আহবায়ক সেই সত্যকে মেনে নেয়ার পর যে-কোন ব্যক্তি একান্ত আপনজনের মতই বৃত ও গৃহীত হয়। অবিশ্বাসীরাই বলুক, সত্য যদি যথার্থ সত্য না হয়, যদি বিন্দুমাত্র অভিনয় কি কপটতাও মিশ্রিত থাকে, যদি জড়িয়ে থাকে সামান্যতম জাগতিক লোভ কি লিপ্সা, কারো পক্ষে কি সম্ভব আমৃত্যু বার বার এই একই দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা? একে শুধু ক্ষমতা কি মানবিক মহত্বের উদাহরণ বলে সীমাবদ্ধ করা অসমীচীন; আসলে তিনি এক বিরাট ও অকাট্য সত্যের বার্তাবহ বলেই এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, সেটাই তাঁর নির্ধারিত কর্তব্য। কারণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে কোন ব্যক্তির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর তার বিরুদ্ধে আর কিছু বলার কোন অবকাশই থাকে না। কারণ তিনি নবী, আল্লাহপাকের সুনির্ধারিত জীবনবিধানের দিকে নিরন্তর আহবানকারী এক পরম অধ্যবসায়ী নকীব। তাঁর ব্যক্তিগত কোন ক্ষতিও নেই পক্ষপাতও নেই। কে বিলম্বে এলো, কে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলো, কে আদৌ কর্ণপাত করলো না; এ-সবই আল্লাহপাকের একান্ত নিজস্ব রহস্যময় অভিপ্রায়ের অধীন। নবী (সাঃ) এর কাজ শুধু পরম নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাওয়া, যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা বহন করে যাওয়া। জয়-পরাজয় সাফল্য-ব্যর্থতা একমাত্র আল্লাহর হাতে; আল্লাহ নিজেও বলেন, 'ফাজাক্কির ইন্নামা আনতা মুজাক্কির'-আপনি একজন উপদেষ্টা মাত্র। অতএব আল্লাহর দ্বীনের বিজয় ও সাফল্যে তিনি আনন্দিত হতে পারেন, আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের বাইরে গিয়ে আপন ইচ্ছানুযায়ী কিছুই করতে পারেন না। এবং এইজন্যই দশলক্ষ বর্গমাইলের এক একচ্ছত্র সম্রাট যখন পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তাঁর, গৃহে শুধু অবশিষ্ট থাকে একটি দড়ির চারপায়া, চামড়ার একটি শুকনো পানির মশক এবং সামান্য দু'এক কেজি যব। পরম স্রষ্টার কাছে ফিরে যাবার অবধারিত সত্যের এক সার্বক্ষণিক জীবন্ত অনুভূতি ছাড়া কি এমন জীবনের অধিকারী হওয়া সম্ভব?

পৃথিবীর বড় বদনসীব, অধিকাংশ মানুষের সম্ভবত জন্মই হয়েছে জন্মান্ধের মত।

www.pathagar.com

তারা নবী (সাঃ)কে চিনলো না, চিনেও চিনলো না। ভোগে উপভোগে মত্ত উন্মত্ত বেশির ভাগ মানুষ সত্যকে চায় না, চায় নেশা ও উত্তেজনা ও আগুন, চায় প্রজাপতির মত ফুরফুরে দায়িত্বহীন তামাশাময় শূন্যে ভাসমান এক অতি চঞ্চল লক্ষ্যহীন জীবন। তারা চায় ক্ষমতা, চায় বৈভব, চায় বহুবর্ণময় ঐন্দ্রজালিক শক্তি ও শৌর্য ও পরাক্রম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা সুখও নয় সাফল্যও নয়, মানুষের জন্য অভিপ্রেতও নয়; আপাত সাফল্যের চকচকে মোড়কে এ-এক সর্বনাশা বিষ। ক্রিস্টোফার মার্লো তাঁর বহুবিখ্যাত নাটক 'ডক্টর ফস্টাস'-এ খুব তীব্রভাবে দেখিয়েছেন মানবভাগ্যের এই অলীক বিজয় ও তার অসংশোধনীয় অন্তর্দাহী করুণ পরিণতি। মেফিস্টোফিলিসের কাছে বিক্রীত আত্মা আধুনিক পৃথিবীরূপী এই ডক্টর ফস্টাসের করুণ আর্তনাদ কিছুটা শুনতে পেয়েছিলেন আইনস্টাইন, ব্রট্রান্ড রাসেল এবং রবীন্দ্রনাথও, যাঁরা মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে বার বার আবেদন করেছেন। স্বহস্তে রোপিত $E = mc^2$ তত্ত্বটির নির্ভরতাশ্রয়ী বিশ্ববিধ্বংসী মারণাস্ত্রের অঙ্কুরোদগম ও প্রসারের কথা ভেবে এবং হিরোশিমা নাগাসিকিতে তার বাস্তব প্রয়োগনৈপুণ্য অবলোকন করে, অপরাধবোধে কাতর-আইনস্টাইন বেহালা বগলে নিয়ে পাগলের মত পথে পথে ঘুরেছেন, যাপন করেছে নিদ্রাহীন রাত্রি। রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভে দুঃখে রচনা করেছেন 'সভ্যতার সংকট', রাসেল তাঁর ভয়াবহ বিশ্বসংকটজনিত উদ্বেগ গোপন রাখতে না-পেরে বরণ করে নিয়েছেন চাকুরিচ্যুতি কারাবাস ও দেশত্যাগ। কিন্তু কোনই ফল হয় নি, বরং আরো ঘনীভূত হয়েছে সংকট। কারণ এই মহামনীষীদের অঙ্কে ছিল ভুল, এবং ভুলটা মারাত্মক। পৃথিবী শুধু পৃথিবী নয়, এই দৃশ্যমান পৃথিবী আসলে মৃত্যু ও ধ্বংস-পরবর্তী অন্য এক মহাপৃথিবী ও মহাকালের একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। স্বতঃসিদ্ধ গাণিতিক নিয়ম ঃ অংশ কখনো পরিপূর্ণ নয়, সর্বদায়ই অপূর্ণ। অতএব পৃথিবীর এই খণ্ডচিত্রকে সামনে রেখে শুভত্বের যে ধারণা তা অসম্পূর্ণ। এবং এই অসম্পূর্ণ ধারণা থেকে উদগত যে আবেদন, তা আন্তরিক হলেও অকার্যকর হতে বাধ্য। পারলৌকিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, আল্লাহপাকের একক অখণ্ড সার্বভৌমত্বের প্রতি সংশয় কি অবিশ্বাস, মহানবী (সাঃ)এর প্রতি আনুগত্যহীনতার নির্বোধ ঔদ্ধত্য—এইসব দুরারোগ্য উপদংশ অক্ষত রেখে পৃথিবীকে নৈতিক স্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলা এবং একটি বাসযোগ্য সুষমাময় পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা নিতান্তই দিবাস্বপ্ন।

'হক্কুল এবাদ' অর্থাৎ মানুষের প্রতি কর্তব্য—ইসলামের একটি জরুরি শর্ত। কিন্তু যে-মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দিহান কি অবিশ্বাসী তার মধ্যে 'হক্কুল এবাদ' তৈরীই হয় না। গান গাওয়া যায়, 'মানুষ মানুষেরই জন্য' অথবা গণতন্ত্র কি আরো নানা ধরনের তন্ত্র ও তত্ত্বের মোড়কে মানবপ্রেমের ছেলেভুলানো ছড়া তৈরী করা যায়; কিন্তু যারা গায়, যারা মানবপ্রেমের মহিমা-বন্দনায় নিরলস, তারাও জানে এসবের কোন বাস্তব মূল্য কি কার্যকারিতা নেই, সব আসলে অসংখ্য শূন্যের যোগফল একটি সুবিশাল অশ্বডিম্ব। এইজন্যই আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সাঃ) প্রথমেই সামাজিক অমিতাচার কি কুপ্রথার

www.pathagar.com

কথা বলেন নি, বলেন-নি মানুষে মানুষে ভালোবাসা রচনার কথা; প্রথমেই বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল'। এই সত্যে যিনি আত্মসমর্পিত ও দৃঢ়বিশ্বাসী, পরীক্ষিত সত্য, অন্য সব রোগ তার জীবন থেকে স্বাভাবিক নিয়মেই অপসৃত হয়, ঝরে পড়ে। কারণ আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি প্রত্যাখ্যান কি অনুমোদনের কথা বিবেচনা করেই তাঁকে সর্বদা পথ চলতে হয়। এতে তাঁর অভিপ্রায় এবং কর্মধারা দুটোই এমন পবিত্র হয়ে ওঠে, ক্রমশ হয়ে ওঠে এমন ভারসাম্যপূর্ণ ও স্বচ্ছ ও কুয়াশামুক্ত যে, কোন ধরনের কপটতা, আত্মসুখে তাড়িত কোন অসদ্বিবেচনা আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কারণ তিনি জানেন, আল্লাহপাকের অবস্থান 'গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর', এবং জানেন তাঁর একমাত্র উপাস্য এই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পরম দয়ালু বটে কিন্তু তিনি 'ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী', যাঁর 'দৃষ্টি অবশ্যই অত্যন্ত সজাগ' ও 'প্রহার অত্যন্ত কঠিন'। এই অমোঘ সত্য যদি মানুষের অন্তর ও কার্যক্রমের একমাত্র চালিকাশক্তিরূপে গৃহীত হয়, পৃথিবী বলুক, পৃথিবীর কোন সমস্যা থাকে? মহানবী (সাঃ) এই কারণেই বলেছিলেন— এমন দিন খুবই আসন্ন যখন দূরতম যাত্রায় একজন নিঃসঙ্গ মহিলারও শুধু আল্লাহর ভয় ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভয় থাকবে না। গল্প নয় কল্পনাও নয়— আল্লাহপাকের পবিত্র সংবিধানের ভিত্তিতে এই মধুর ও মনোহর ও প্রেমকরোজ্জ্বল পৃথিবীর বাস্তব নমুনা তিনি উপস্থাপন করেছিলেন। আজও করা যায়, পৃথিবীর সর্বত্রই করা যায়, কিন্তু মানুষকে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর কাছে, আল্লাহর রাসুলের কাছে; এবং আসতে হবে পূর্ণতম বিশ্বাস ও আনুগত্য নিয়ে। কিন্তু এই ভাগ্যহীন অন্ধ প্রমত্ত আত্মবিস্মৃত পৃথিবীর কি তদ্রূপ বোধোদয় কখনো ঘটবে?

না ঘটুক, আর বোধোদয় ও হেদায়াতের মালিক যেহেতু আল্লাহ, এ-নিয়ে অস্থির কি বিচলিত হওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু একটি জিনিষ আবশ্যক তাহলো, আধুনিক পৃথিবীর যে জ্ঞান ও গৌরবের বেলুন তা ফুটো হয়ে যাওয়া, বিশ্বস্রষ্টা মহাপ্রভুর সঙ্গে সম্পর্করিক্ত তার মানবপ্রেম যে আসলে এক বিষবটিকা অথবা বিভ্রম, তা প্রমাণিত হওয়া। হিটলার যে ইহুদি-নিধনে মেতে উঠেছিলেন তারও পশ্চাতে ছিল 'মানবপ্রেম', স্ট্যালিন যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ও বধ্যভূমিতে প্রেরণ করেছিলেন, সেও-তো 'মানবপ্রেমবশতই'। হিরোশিমায় যখন দুইশত কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত আণবিক বোমাটি পড়লো, ট্রুমান তখন হাস্যরত অবস্থায় একটি কমেডি ছবি উপভোগ করতে করতে বললেন, 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঘটনাটি আজ সংঘটিত হলো'। এবং এই 'শ্রেষ্ঠ' ঘটনার পঁয়তাল্লিশ বছর পর ইরাকের উপর নির্বিচার মারণাস্ত্র বর্ষণ যখন শুরু হলো, ইতিহাসের আরেক মহানায়ক বুশ তখন শ্বেতপ্রাসাদের (White House) অলিন্দে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি সুখী'। এ-সবই 'মানবপ্রেম'। প্রেমই বটে, প্রেমের নামে এমন বিশ্ববিধ্বংসী ছলনা ও অপতৎপরতা সত্যই আধুনিক বিশ্বের এক-একটি উপভোগ্য কৌতুক। কিন্তু এমনটি কি হতে পারে বা পারতো যদি মহানবী (সাঃ) এর সতর্কবাণীটি

www.pathagar.com

সামনে থাকতো এই উদ্ধত বিশ্বনায়কদের? 'মজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করো, সে যদি কাফেরও হয়, আল্লাহ্ তার প্রার্থনাকে ফিরিয়ে দেন না'। অর্থাৎ কোন জালিমকে আল্লাহ্ সহ্য করেন না, অত্যাচারিতের আবেদনে আল্লাহপাক অতি সত্বর সাড়া দিয়ে থাকেন। অত্যাচারী যতই ভালোমানুষের মুখোশ ধারণ করুক বা মনে করুক নিজেকে অপরাজেয় কি উৎকৃষ্ট ঘটনার জন্মদাতা, যথাসময়ে আল্লাহর শাস্তি যখন নেমে আসে, একটি পিপীলিকার পতনেও যেটুকু শব্দ উত্থিত হয়, তাও হয় না।

আসলে মহানবী (সাঃ) তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও কর্মধারার মধ্য দিয়ে যে-সত্যটি মানুষের কাছে বার বার পেশ করলেন তাহলো, মানুষের জীবন প্রকৃতপক্ষে একটি বিজ্ঞান। এর মধ্যে কোন স্বেচ্ছাচার কি আবেগ কি খেয়ালিপনাকে প্রশ্রয় দেয়া মানেই দুর্ঘটনা। যুগপৎ পার্থিব ও পারলৌকিক প্রেক্ষাপটে আমাদের যাপিত জীবনের ব্যবহারিক বিধি ও রূপ কী, মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহপাকের পবিত্র কোরআনে বর্ণিত যে সুনির্ধারিত নিয়ম, তারই একটি নিখুঁত সাংবিধানিক প্রতিচ্ছবি মহানবী (সাঃ)এর জীবন। এই জীবন মহাগ্রন্থ কোরআন শরীফের হুবহু ব্যবহারিক অনুবাদ। এবং এইজন্যই হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) যখন জিজ্ঞাসিত হন, রাসূল (সাঃ) এর জীবন কীরূপ ছিল, তিনি অবলীলায় জবাব দেন, 'তোমরা কি কোরআন পড়ো নি'? এবং রাসুল (সাঃ) নিজেও বলেছেন— কোরআন এবং আমার জীবনপ্রণালী যদি তোমরা নির্দেশিকা হিসাবে আঁকড়ে থাকো, তোমাদের ভয় নেই।

আজ প্রায় সর্বত্রই সুবিচার ও সাম্যের যে মহাদুর্ভিক্ষ, সর্বমানবিক প্রেম ও দায়িত্ববোধের যে বিশাল শূন্যতা, মিথ্যা ও শঠতা ও নির্বিবেক কর্মচাঞ্চল্যের যে অবাধ প্রসার, এবং ফলত পৃথিবী নামক এই সবুজ গ্রহটি যে বস্তুতই এক দুঃস্বপ্নময় নরককুণ্ডে পর্যবসিত হলো, তার একটাই কারণ, মনুষ্যজীবনের জন্য নির্ধারিত বিধি ও বিজ্ঞানের প্রতি উপেক্ষা। পদার্থ কি রসায়ন, জ্যোতির্মণ্ডল ও মহাকাশ ও সমুদ্রচর্চা, উদ্ভিদ কি জীবাশ্ম ইত্যাদি নিয়ে মানুষের আজ গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার শেষ নেই, কিন্তু সর্বাধিক দুঃখের বিষয়, মানুষ তার আপন কর্তব্যকর্মের গতিপথ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। সে জানে না সততার কী মূল্য, জানে না অন্য মানুষের কী অধিকার, কাকে বলে ন্যায়বিচার, জানে না অর্থোপার্জন ও ব্যয় ও সঞ্চয়ের বিধি ও নিয়ম। রাষ্ট্রপরিচালনা, যুদ্ধ, মৈত্রীচুক্তি, যুদ্ধবন্দীর সঙ্গে আচরণ এসব তো দূরের কথা, এমনকি স্ত্রী পুত্র স্বামী সন্তান অতিথি আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে কী নিয়মে সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়, মেনে চলতে হয় কী আচরণবিধি, তাও জানে না। শতকোটি আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র নিয়ে তার চিন্তার অন্ত নেই অথচ তার আপন সন্তান যে কুখ্যাত দস্যুতে পরিণত হলো, তা লক্ষ করার মত সময়ের বড় অভাব। তিনি বিশ্বনারীমুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বদানে সদা তৎপর এক সতর্ক প্রহরী, কিন্তু আপন স্ত্রী যে অবজ্ঞায় অবহেলায় বিকারগ্রস্ত, সেদিকে ভ্রূক্ষেপহীন।

www.pathagar.com

এবং তিনি এতই 'বিবেচক' ও 'কর্মব্যস্ত' যে, সন্তান সন্ততিকে চাইল্ডকেয়ার ও বৃদ্ধ পিতামাতাকে ওল্ড-হোমে পাঠিয়ে বান্ধবীদের সঙ্গসুখ উপভোগে প্রমত্ত জীবন যাপনে তাঁর কোন অপরাধবোধ জাগ্রত হয় না। এই হলো আধুনিক মানুষের কর্মনিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ! এবং এইজন্যই বুভুক্ষু মানুষের সামনে গড়ে ওঠে কুকুর-বিড়ালের জন্য সুসজ্জিত ম্যাকডোনাল্ড রেস্টুরেন্ট, সারা জগতজুড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে কোকেন ম্যানড্রেক্স হেরোইন ও আফিম ও অস্ত্রব্যবসা। এবং মানুষ বুঝতেই পারে না, ব্যভিচার সমকামিতা লোকঠকানো কূটনীতি এসব এক-একটি অপরাধও নাকি উত্তম পূণ্যকর্ম! শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, রাস্তায় প্রকাশ্য দেহব্যবসার দায়ে 'পাবলিক নুইসেন্স' এ্যাক্টে ধরা হলে, আদালত উভয়কে নির্দোষ ঘোষণাসহ বেকসুর খালাস দিতে বাধ্য হয়, কারণ আইন সম্পর্কে একেবারেই 'অজ্ঞ' পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত সংশ্লিষ্ট রমনীটির যুক্তি বড় অকাট্য 'I was not selling sex, I was selling condom with proper and necessary demonstration'. কিন্তু কেন এমন হলো? বস্তুত এই দুর্দশা অন্য কিছু নয়, এই পৃথিবীরই দুই হাত দিয়ে উপার্জিত গোলাভরা ফসল। নবী (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত, পরীক্ষিত ও প্রমাণিত মানববিজ্ঞানকে জেনেশুনে অস্বীকার করার পরিণতি যা হবার তাই-ই হয়েছে। আকাশবিহারী নভোযান কি আণবিক শক্তিচালিত ডুবোজাহাজ, সর্বজয়ী কম্পুটার, পৃথিবী-বিস্তৃত মিডিয়া নেটওয়ার্ক, বিশ্ববাণিজ্য, এ-সব কোন কিছু দিয়েই মানববংশের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয় না। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি 'ঈমান ও সৎকর্ম-সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা মনুষ্যত্ব,' যা কেবল আল্লাহর প্রতি ভয় ও আনুগত্যের মধ্য দিয়েই বিকশিত হতে পারে। মনুষ্যত্বের এই স্বাভাবিক বিকাশই আজ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলত জন্ম নিয়েছে ও ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে এক বিশ্বপ্লাবী উত্তেজনা, পারস্পরিক ভয় ও অবিশ্বাস, ঈর্ষা ও ছলনা ও শত্রুনিধনের সর্বাত্মক জলস্থল-অন্তরীক্ষব্যাপী পৈশাচিক রণসজ্জা।

সত্যই বর্তমান পৃথিবীর যে রূপ তা নরকের চেয়েও ভয়ংকর। নরকে শুধু বিরাজ করছে শাস্তি ও দহন কিন্তু সেখানে অন্তত প্রতারণা নেই, পশুত্ব নেই; শাঠ্য ষড়যন্ত্র বিশ্বাসভঙ্গ অশ্লীলতা, নরক অন্তত এসব থেকে মুক্ত। বহুকাল আগে ভুবনমোহিনী রূপের অধিকারী এক রাণী ছিলেন, যাঁর কটাক্ষমাত্র প্রবল প্রতাপান্বিত যে-কোন সম্রাটও পরিণত হতো গৃহপালিত মার্জারে। রিরংসা ও যৌনতাগ্রস্ত, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যলিপ্সু এই রাণী ক্লিওপেট্রা তাঁর দুই পয়োধরের মধ্যস্থলে সজ্ঞানে স্বহস্তে বিষাক্ত ভাইপারের ছোবল গ্রহণ করে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। পৃথিবীরূপী এই ক্লিওপেট্রারও সকল ভোগ ও বৈভবের আড়ালে আড়ালে সঞ্চিত হচ্ছে সেই ক্ষোভ ও অনুতাপ ও অভিমান। সেই দিন অত্যাসন্ন, যখন হয় তাকে তীব্রতম বিষধর কোন কেউটে দ্বারা দংশিত হয়ে আত্মহত্যা করতে হবে, নতুবা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও বিনয় ও আনুগত্য নিয়ে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর কাছে, আল্লাহর প্রেরিত রাসুল (সাঃ)এর কাছে, ইসলামের মমতাময় ছায়াতলে। প্রার্থনা করি, আল্লাহপাক তাঁর অসীম করুণায় দ্বিতীয়টি দান করুন।

www.pathagar.com

রাসুল (সাঃ)এর মোযেজা

এক.

মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেছেন, তিনি শাশ্বত আলোকবর্তিকা, তিনি সর্বোত্তম স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নিখিল বিশ্বের আশীর্বাদ। কিন্তু এই আলোকবর্তিকা প্রদীপের মত শুধু আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিয়েই নিশ্চুপ থাকেন না; এবং তিনি-যে আশীর্বাদ, তার অর্থও এরকম নয় যে, তিনি শুধু মানববংশের জন্য সর্বনিরপেক্ষ আশীর্বাদই বর্সন করেন, সেই আশীষধারায় কে স্নাত হলো না-হলো, সে-বিষয়টি গৌণ ও গুরুত্বহীন।

না, আদৌ এরকম নয়। রাসুল (সাঃ) শাশ্বত নূর ও শাশ্বত আশীর্বাদ বটে, কিন্তু সকল অশুভ শক্তি ও অন্ধকারের মোকাবিলায় তাঁর আলো ও আশীর্বাদ যেন বিজয় লাভ করে, সেই কঠিন সংগ্রামের তিনি একজন যুদ্ধরত সার্বক্ষণিক সিপাহসালারও বটে। যে-কারণে তাঁর একটি অন্যতম মোবারক নাম 'সাইফুল্লাহ', আল্লাহর তরবারি। অর্থাৎ আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ছিলেন অসত্যের সকল অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে সর্বতোমুখী কল্যাণস্নিগ্ধ আলো ও ভালোবাসার পৃথিবী বিনির্মাণের এক অবিসংবাদিত মহানায়ক।

অতএব যেহেতু শির্কের অন্ধকার ভেঙে তাওহীদের আলো ছড়িয়ে দেয়া এবং সকল অন্ধকার ও জুলুমকে উৎখাত করে একটি ন্যায়ানুগ মনুষ্য বাসযোগ্য আল্লাহর পৃথিবী গড়ে তোলাই ছিল রাসুল (সাঃ)এর প্রধানতম কাজ, এই কাজের জন্য সহায়ক কিছু অলৌকিক ক্ষমতাও আল্লাহপাক তাঁকে দান করেছিলেন। আল্লাহপাক প্রদত্ত এই অলৌকিক ও ব্যাখ্যাতীত শক্তি ও ক্ষমতা, যা রাসুল (সাঃ)এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত ও প্রদর্শিত হয়েছে, সেই-সবই হলো রাসুল (সাঃ)এর মোযেজা।

মোযেজা সম্পর্কে বহু কথা বলার আছে; তবে সংক্ষেপে শুধু দু'টি বিষয় মনে রাখলেই মোযেজা সম্পর্কে আমরা আমাদের ধারণাকে যথোচিত নির্ভুল ও স্বচ্ছ করে নিতে পারি। এবং এই প্রেক্ষিত রাসুল (সাঃ)এর মোযেজার প্রকৃত স্বরূপকেও আমরা চিনে নিতে পারি।

এক. মোযেজা কারো ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীনও নয়; মোযেজা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহপাকের একটা অনুগ্রহ, একটা নেয়ামত। অর্থাৎ আল্লাহপাকের অভিপ্রায়ক্রমেই মোযেজার প্রকাশ ঘটে।

দুই. সকল নবী-রাসুল এবং আল্লাহর বহু প্রীতিভাজন অনুগত বান্দাহর মধ্য দিয়ে যে-অলৌকিকত্বের প্রকাশ, তার কারণ তাঁরা আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে এমন উচ্চস্তরে উপনীত হন, যে-পর্যায়ে আল্লাহপাক তাঁদের কোন দোয়া ও মাকসুদ আর অপূর্ণ রাখেন না। এবং এই কারণেই তাঁদের মোযেজা ও কারামত

www.pathagar.com

লোকচক্ষে দৃশ্যত তাঁদের নিজস্ব ক্ষমতার অভিব্যক্তি বলেই প্রতিভাত হয়। এইজন্যই আল্লাহপাক বলেন, তিনি তাঁদের হাত হয়ে যান, মুখ ও চক্ষুকর্ণ হয়ে যান।

এতদ্‌সঙ্গে এই কথাটিও আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, মোযেজা ও কারামত নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু মুখ্য ও প্রধান বিষয় হলো, বিশেষ করে নবী-রাসুলদের ক্ষেত্রে, তাওহীদ ও আল্লাহপাকের হেদায়াত প্রতিষ্ঠায় সকল মিথ্যা ও কুহকের বিরুদ্ধে নিরন্তর আপসহীন সংগ্রাম। এইজন্যই নবী-রাসুলদের কোন মোযেজার লক্ষ্যই মানুষকে অসম্ভব অলৌকিকত্ব দ্বরা ভীত কি চমকিত কি হতবিহল করা নয়, মোযেজাও তাঁদের সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থাৎ মোযেজাকে তাওহিদী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ভুল; এবং মোযেজাকে প্রাধান্য দিয়ে মোযেজার মাপকাঠিতে কোন নবী-রাসুলকে বিচার করা আরো বড় ভুল।

হযরত ইবরাহিম (আঃ)-কে আগুন এতটুকু স্পর্শ করেনি; আল্লাহপাকের ইচ্ছায় তিনি অগ্নিকুণ্ড থেকে অক্ষত অবস্থায় হাসিমুখে বেরিয়ে এসেছেন; এটা একটা বিস্ময়কর মোযেজা। কিন্তু এই ঘটনা দ্বারা তাঁর মহত্ত্ব কি মর্যাদা নিরূপিত হয় না। এ-থেকে আমরা কেবল এই বিষয়টি অনুধাবন করি যে, তিনি ছিলেন আল্লাহপাকের একজন অতিশয় প্রীতিভাজন বান্দাহ এবং রাসুল। হযরত ইবরাহিম (আঃ)এর প্রকৃত পরিচয় নিহিত আছে আল্লাহপাকের সকল আদেশ ও অভিপ্রায়কে একমাত্র জ্ঞানে তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কঠিন সংগ্রাম ও কোরবানীর মধ্যে।

হজরত মুসার (আঃ) একটি লাঠি ছিল, যা মুহূর্তমধ্যে অজগরে পরিণত হতো, আবার হাতে ধরামাত্র নিষ্প্রাণ লাঠি। এবং এই লাঠির আঘাতেই নীলনদ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে তাঁর জন্য পথ খুলে দিয়েছিল। বিস্ময়কর বটে। কিন্তু এ-সবই আল্লাহপাকের অভিপ্রায়প্রসূত এক-একটি অদৃষ্টপূর্ব ও ব্যাখ্যাতীত ঘটনামাত্র। মুসা (আঃ)এর প্রকৃত পরিচয় হলো, তিনি প্রবল পরাক্রান্তরা ফেরাউনসহ মিশরের বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের কাছে সকল ঝুঁকি নিয়ে তাওহীদের আলোকবার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। শুধু পৌঁছে দেয়া নয়, শিরক ও কুফরির মোকাবিলায় তাওহীদকে বিজয়ী করে তুলতে মুসা (আঃ)এর যে আমৃত্যু সংগ্রাম, সেটাই তাঁর প্রকৃষ্ট পরিচয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যেহেতু অলৌকিকত্বের প্রতি আমাদের কৌতূহল ও দুর্বলতা একটু বেশি, আমরা নবী-রাসূলদের মূল পয়গাম ও তার বাস্তবায়নের আপসহীন সংগ্রামী কার্যক্রমের চেয়ে তাঁদের মোযেজার দিকটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে চাই। এবং এই আগ্রহ প্রথমদিকে বিশেষ আপত্তিকর না-হলেও, অল্প সময়ের ব্যবধানেই অনেক ক্ষেত্রে গর্হিত শিরকের দিকে ধাবিত করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খ্রীস্টানরা যীশুখ্রীস্টকে (হজরত ঈসা আঃ) একেবারে আক্ষরিক অর্থেই 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে বিশ্বাস করে। এই ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী মুশরিকী-

www.pathagar.com

আকীদার কারণ শুধু এই নয় যে, জননী মারিয়ামের পবিত্র গর্ভ থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন; এতদ্‌সঙ্গে সদ্যোজাত শিশুর কথা-বলা, অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীদের নিরাময় করে তোলা, মৃত মানুষকে জীবিত করা ইত্যাদি অনেক মোযেজার কারণেও যীশুখ্রীস্টকে 'ঈশ্বরপুত্র' বলে পুরো খ্রীস্টান জগৎ বিশ্বাস করে নিয়েছে। আবার অন্য একটি দিকও আছে। অনেকে মোযেজাকে পুরোপুরি অস্বীকারও করে। যেমন অধিকাংশ ইহুদীর বিশ্বাস, যীশুখ্রীস্টের জন্ম কোন অলৌকিক ঘটনা নয়, আসলে তিনি জারজ (নাউজুবিল্লাহ)। এবং একইভাবে অনেক মোযোজাদৃষ্টে আবু জেহেলরাও মহানবী (সাঃ)কে যাদুকর বলে ধারণা করতো (নাউজুবিল্লাহ)। অর্থাৎ মোযেজার কারণে বহু মানুষের মধ্যে জঘন্যরকম অমার্জনীয় বাড়াবাড়ির যেমন উদ্ভব ঘটে, অনেকের মধ্যে জঘন্যরকম কুফ্‌রিও জেগে ওঠে।

যা-হোক, নবী-রাসুলদের দ্বারা সংঘটিত এমন অনেক ঘটনার কথা আমরা জানি, যা অদৃষ্টপূর্ব অশ্রুতপূর্ব অবাস্তব ও অসম্ভব, সাধারণভাবে এইগুলিই মোযেজা। যাদুও অনেকটা আপাতভাবে এইরকমই; কিন্তু যাদু ও মোযেজার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, একটি অতীব ক্ষণস্থায়ী মিথ্যা ও অলীক-দৃষ্টি বিক্রম, এবং অপরটি হলো বাস্তব ও নিখাদ সত্য। ফেরাউনের যাদুকরেরা যখন ভয়ঙ্কর এক একটি সাপকে সামনে নিয়ে আসে, সেটা দর্শকদের দেখার ভুল; আসলে সাপ নয়, দৃষ্টির ক্ষণস্থায়ী সম্মোহনজনিত বিভ্রমমাত্র। কিন্তু মূসা (আঃ)এর লাঠি যখন অজগরে রূপান্তরিত হয়, সেই অজগর একটি বিশুদ্ধ অজগর। অর্থাৎ যাদু হলো নিতান্তই চালাকি ও অসার ও অসত্য; অপরদিকে মোযেজা হলো, অসম্ভব বটে, কিন্তু সর্বতোভাবে সত্য এবং আল্লাহপাকের ইচ্ছা ও কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

এখন আমরা নবী মোহাম্মদ (সাঃ)এর মোযেজার কথা আলোচনা করতে পারি। তাঁর মোযেজার দু'টি পরিচয়। একটি মানুষের বাস্তব জ্ঞান ও ধারণা ও অভিজ্ঞতার অনেক উর্ধে অলৌকিক অনেক ঘটনার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ; অপরটি রাসুল (সাঃ)এর জীবন ও ভূমিকার অভাবনীয় অভিব্যক্তি। কাফেরদের উপর্যুপরি দাবীর মুখে তাঁর অঙ্গুলি হেলনে চাঁদ যখন দ্বিখণ্ডিত হয়, এটা ছিল একটা বড় ধরনের বাহ্যিক মোযেজা। এই মোযেজাদৃষ্টে কাফেররা ঈমান আনে-নি বটে, কিন্তু যাদুকর বলুক আর যাই বলুক, তারা ঠিকই বুঝেছিল যে, মোহাম্মদ (সাঃ) নবী হোন বা না-হোন, কোন সন্দেহ নেই, তিনি অসাধারণ। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা রাসুল (সাঃ)এর জীবনে বর্তমান, যা নির্ভরযোগ্য সকল হাদীসগ্রন্থেই সহীহ সনদসহ বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এখানে সহীহ বোখারীর সূত্রে প্রাপ্ত মাত্র কতিপয় মোযেজার কথা উল্লেখ করবো।

মসজিদে নববীতে মিম্বর নির্মিত হওয়ার পূর্বে একটি খেজুরের কাণ্ডে হেলান দিয়ে রাসুল (সাঃ) খুত্‌বা দিতেন। কিন্তু মিম্বর তৈরী হওয়ার পর তাঁর বিচ্ছেদ-বেদনায়

www.pathagar.com

খেজুরের কাণ্ডটি সশব্দে ক্রন্দন করেছিল। জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হজরত জাবীর বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হজরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) প্রমুখ এগারো জন বিশিষ্ট সাহাবী এই অভাবনীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ বিন মাসুদ (রাঃ) বলেছেন যে, তিনি তাঁর প্রথম-কৈশোরে একদা বক্‌রি চরাচ্ছিলেন। রাসুল (সাঃ) এবং আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সেই পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁকে বললেন, 'তোমার কোন ছাগলের নিকট থেকে দুধ পাওয়া যাবে কি'? তিনি বললেন, তাঁর জানামতে এ-রকম দুধেল কোন ছাগল নাই। তারপর মহানবী (সাঃ) একটি ছাগলের বাচ্চাকে আনতে বললে তিনি নিয়ে গেলেন। রাসুল (সাঃ) ওই বাচ্চা ছাগল থেকে পর্যাপ্ত দুধ দোহন করে নিজে ও আবু বকর সিদ্দিক পান করলেন এবং তাঁকেও দিলেন। আবদুল্লাহ বিন মাসুদ (রাঃ) এই কথাও বলেন, 'তারপর রাসুল (সাঃ) বললেন, হে স্তন, তুমি আগের মত হয়ে যাও। এবং ছাগ-শাবকের স্তন তাই হয়ে গেল। আমি এই মোযেজা দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছি।'

খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে পরিখা খননের সময় একটি বিশাল পাথর বাধা হয়ে দেখা দিল। অনেক সাহাবী একত্রে চেষ্টা করেও কিছু করতে পারলেন না। তারপর রাসুল (সাঃ) আঘাত করলেন, বিশাল এই পাথর তিনটি আঘাতে তিন খণ্ড হয়ে গেল।

তাঁর আহবানে একবার একটি গাছ জীবন্ত প্রাণীর মত হেঁটে এসে তাঁকে সালাম জানিয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে গেল; একবার একটি খেজুরের কাঁদিও গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাসুল (সাঃ)এর নিকটে এসে পুনরায় গাছের কাঁদি গাছে প্রত্যাবর্তন করেছিল।

কী আশ্চর্য এক একটি-ঘটনা, যা দেখা নয়, ভাবলেও শিহরিত হতে হয়।

একবার অজুর পানির অভাব দেখা দেয়ায় রাসুল (সাঃ)এর মোবারক পাঁচটি অঙ্গুলি থেকে ঝর্ণার মত পানির ফোয়ারা নেমে এসেছিল। খায়বার অভিযানের প্রাক্কালে রাসুল (সাঃ) হজরত আলীকে (রাঃ) সেনাপতি হিসাবে ঘোষণা করলেন। কিন্তু জানা গেল, আলী (রাঃ) চোখের পীড়ায় মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। রাসুল (সাঃ) স্বীয় মুখের একটু থুতু লাগিয়ে দিয়ে সুস্থতার জন্য দোয়া করলেন; মুহূর্তমধ্যে আলী (রাঃ) এমনভাবে নিরাময় লাভ করলেন, যেন তাঁর চোখে যেন তাঁর চোখে আদৌ কোন রোগই ছিল না।

হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, তাঁর একটি খেজুরের থলি ছিল। খেজুরগুলি ছিল রাসুল (সাঃ)এর দোয়ার কারণে বরকতপ্রাপ্ত। সেই থলি থেকে তিনি-যে কত খেজুর নিজে খেয়েছেন ও বিতরণ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আবু হুরাইরা (রাঃ) দুঃখের সঙ্গে বলেন, এই বরকতময় থলিটা তিনি হজরত উসমান (রাঃ)এর শাহাদাতের সময়

www.pathagar.com

গোলমালের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছেন। হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ)এর অপর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসুল (সাঃ) একদিন মাত্র এক পেয়ালা দুধ দ্বারা তাঁকে সহ গৃহে আগত বহুসংখ্যক আসহাবে সুফ্‌ফাকে উদরপূর্তি করে দুধ পান করিয়েছিলেন।

মহানবী (সাঃ) যে-সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেগুলিও এক একটি মোযেজা। বদর যুদ্ধের পূর্বদিন তিনি সুনির্দিষ্টভাবে জায়গা চিহ্নিত করে বলে দিয়েছিলেন আবু জেহেল, উত্‌বা ইত্যাদি কাফেররা কে কোথায় নিহত হবে। যুদ্ধশেষে দেখা গেল, যা-বলেছিলেন, একটুও এদিক-ওদিক হয় নি। রাসুল (সাঃ) বলেছিলেন, অচিরেই পারস্যের ধনভাণ্ডার মুসলমানদের অধিকারে আসবে; বলেছিলেন, ইরানীদের বিরুদ্ধে রোমীয়রা শীঘ্রই আবার নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করবে, যা তখনকার প্রেক্ষাপটে ছিল একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এ-সকল ভবিষ্যদ্বাণী সবই হুবহু বাস্তব রূপ লাভ করেছিল। হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলীকে (রাঃ) তিনি একদা শহীদ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কী নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী! তাঁরা উভয়েই শাহাদাত লাভ করেছিলেন। মূতার যুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরনের সময় তিনি জায়িদ বিন হারিসা জাফর বিন আবু তালিব ও আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার শাহাদাত লাভের অগ্রিম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কার্যত তাই-ই ঘটেছিল। রাসুল (সাঃ) একদা হজরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হজরত ইমাম হোসেন (রাঃ)এর ভূমিকা ও মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে যা বলেছিলেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, সেই কথার এতটুকু অন্যথা ঘটেনি। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল সকীফ গোত্রে এমন দু'জন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যাদের একজন হবে 'কায্‌যাব' অর্থাৎ প্রচণ্ড মিথ্যাবাদী এবং অপরজন 'মুবীর' বা বিনাশকারী। পরবর্তী সময়ে দেখা গেল, মুখতার সাকাফী এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এই ভবিষ্যদ্বাণীর হুবহু বাস্তব রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। হজরত আলী (রাঃ) এবং হযরত তালহা (রাঃ) ছিলেন খুবই অন্তরঙ্গ। তাঁদেরকে ডেকে রাসুল (সাঃ) একদা বললেন, একদিন একটি অন্যায় যুদ্ধের সমর্থনে তালহা অন্যায়ভাবে আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। জঙ্গে জামাল অর্থাৎ উষ্ট্রের যুদ্ধে এই ঘটনাই ঘটেছিল। আলী (রাঃ) যখন যুদ্ধের ময়দানে হজরত তালহা (রাঃ)কে রাসুল (সাঃ)এর কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলেন, হজরত তালহার এখন সব কথাই মনে পড়লো এবং তিনি সানুতাপে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন।

একবার একটি অসম্ভব ঘটনা ঘটলো। উমাইর বলে এক মুশরিক ছিল ইসলাম ও আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) প্রচণ্ড দুশমন। সে সাফওয়ান নামে অপর এক মুশরিকের সঙ্গে খুবই গোপন পরামর্শক্রমে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে রাসুল (সাঃ)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে মদীনায় গিয়ে পৌছালো। তাকে দেখামাত্র উমার (রাঃ) তাকে গ্রেপ্তার করে রাসুল (সাঃ)এর সম্মুখে হাজির করলেন। রাসুল (সাঃ) প্রশ্ন করলেন, 'উমায়র, তুমি কী উদ্দেশ্য নিয়ে মদীনায় এসেছ'? সে বললো যে, সে তার ছেলেকে মুক্ত করবার জন্য

www.pathagar.com

এসেছে। তখন রাসুল (সাঃ) বললেন, 'তুমি কি সাফওয়ানের সঙ্গে কাবাগৃহে বসে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করো নি'? উমায়র হতবাক; সে তখন একরকম নিজের অজান্তে ই বলে উঠলো: কোন সন্দেহ নেই, আপনি আল্লাহর নবী। কারণ এই ষড়যন্ত্রের কথা আমি এবং সাফওয়ান ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানে না।

একটি-দু'টি নয়, এইরকম অসংখ্য মোযেজার ঘটনা রয়েছে, যে-সকল ঘটনা সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে আমরা সম্যক অবগত হই।

তিনি হিযাজে অলৌকিক অগ্নি-প্রকাশের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, রোম ও পারস্যবিজয় এবং কিসরার ধনভাণ্ডার হস্তগত হবার কথা। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সম্মিলিত বিশ্বশক্তি একদিন মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে রণসাজে সজ্জিত হবে; মুসলিম উম্মাহর বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়তার কথাও বলেছিলেন; এমনকি ইয়োরোপীয়দের সংখ্যাধিক্য এবং ইহুদিদের সঙ্গে একদিন যে মুসলিম উম্মাহর যুদ্ধ হবে, রাসুল (সাঃ) সেই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ৩০ জন ঘোরতর মিথ্যাবাদী নবীর আবির্ভাব ঘটবে। ভারত-যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বানীসহ রাসুল (সাঃ) বলেছিলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি দল আছে, আল্লাহতায়ালা যাদেরকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন; তার একটি দল হলো, যারা হিন্দুস্তানের যুদ্ধে যোগদান করবে।' আর কিসরা ও কায়সর (পারস্য ও রোম সম্রাটের উপাধি) সম্পর্কে বলেছিলেন, 'যখন কিসরা ধ্বংস হবে, তারপর আর কোন কিসরা হবে না; আর যখন কায়সর ধ্বংস হবে, পুনরায় কোন কায়সর হবে না।' আবার উল্লেখ করি, নিকট ও দূর-ভাবীকালের এইরকম অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনার কথা রাসুল (সাঃ)এর মোবারক জবান থেকে উচ্চারিত হয়েছে, যা-সবই সময়ে-যথাসময়ে হুবহু সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে।

তবে একটি কথা আবার আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন তা হলো, রাসূল (সাঃ) কৃত ও বিবৃত নানা ধরনের মোযেজার আধিক্য ও গুরুত্ব ও গভীরতা দেখে আমরা যেন না-ভাবি, তিনি গায়েবী-ইল্‌মের অধিকারী ছিলেন। না, তিনি কোন অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। আল্লাহতায়ালা তাঁকে গায়েবের বহু খবর জানিয়েছেন; এবং রাসুল (সাঃ) আল্লাহ-প্রদত্ত সেই অদৃশ্য খবর থেকেই যা-জানাবার পৃথিবীকে জানিয়েছেন।

বিষয়টি উল্লেখ করতে হলো এইজন্য যে, রাসুল (সাঃ)এর বহুবর্ণ মোযেজার অভাবিত চমৎকারিত্ব দর্শনে, তাঁকে নিয়ে দুর্বলচিত্ত মানষেরা বাড়াবাড়ি করে বসতে পারে এবং অমার্জনীয় শিরকে আক্রান্ত হতে পারে। কারণ, এইভাবেই খ্রীস্টানদের আকীদায় যীশুখ্রীস্ট (হযরত ঈসা আঃ) 'ঈশ্বরের পুত্র' রূপে গৃহীত হয়েছে; এবং আমাদের অতি-পরিচিত বিদআতী-জিন্দিক লালন ফকিরও বলে বসেছে, 'আপনি খোদা আপনি নবি, আপনি হন আদম ছুফি' বলেছে, 'আল্লাহ নবি দু'টি অবতার, গাছ বীজ দেখি যে প্রকার' অথবা 'যে মুরশিদ সেইতো রাসুল, ইহাতে নাই কোন ভুল, খোদাও

www.pathagar.com

সে হয়।'

কী সর্বনাশ! তাওহিদী আকীদার বিপরীতে কী-প্রচণ্ড শির্‌কের উন্মত্ততা! কেউ যদি জেনে-শুনে এ-রকম কু-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে পাকা ইবলিস, আর না-জেনে না-বুঝে করলে, সে ইবলিসের প্রীতিভাজন সহচর। (কৌতুহলী পাঠক বর্তমান লেখকের 'ইসলাম ও আত্মঘাতী মুসলমান' বইয়ের 'লালন ও কতিপয় গুরুতর প্রসঙ্গ' শীর্ষক আলোচনাটি দেখতে পারেন, যেখানে এই ন্যাড়ার ফকির বেশরা জিন্দিক-এর বিশদ পরিচয় আছে)।

অতএব রাসুল (সাঃ)এর মোযেজাদৃষ্টে কারো তাওহিদী-চেতনায় যেন কোন অবস্থাতেই কোনরূপ বিক্ষেপ না-ঘটে, সেদিকে পূর্ণমনস্ক থাকা প্রয়োজন। যদি ঘটে, তাহলে সমূহ সর্বনাশ।কোন সন্দেহ নেই, জাহান্নাম তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে।

দুই.

রাসুল (সাঃ) কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে এ-বিষয়ে আরো একটু বিশদভাবে জানা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। অনেকদিন পর্যন্ত , এমনকি মযবুত ঈমানদারদেরও ধারণা ছিল, চন্দ্রবিভক্তি সত্য বটে, কিন্তু একেবারে নিরেট প্রমাণনির্ভর বাস্তব নয়।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আল্লাহপাক স্বীয় অনুগ্রহে এই ভুল ভেঙে দিয়েছেন। নবী-রাসুলদের মোযেজা যে কোনরূপ কোন বিভ্রম নয়, তা-যে শতকরা শতভাগ বাস্তব ও সংশয়হীন, চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে গৃহীত আলোকচিত্র এবং নানা তথ্য-উপাত্ত থেকে এটা এখন সুপ্রমাণিত। দেখা যাচ্ছে, খালের মত একটি পরিষ্কার ফাটলরেখা চাঁদকে বেষ্টন করে আছে; আবিষ্কারক বিজ্ঞানীর নামে যার নামকরণ করা হয়েছে 'হেরিক্‌স ক্যানাল।' এবং এই ক্যানাল-যে দেড়-দুই হাজার বছরের অধিক পুরনো নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সে বিষয়েও সুনিশ্চিত।

আল্লাহপাকের কী কুদরত, আধুনিক বিজ্ঞানীরা আধুনিক বিশ্বকে নিশ্চিত-চন্দ্রবিভক্তির কথা নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। এবং এই বিষয়টির কারণেই আল্লাহপাকের ইচ্ছায় অন্যতম চন্দ্রবিজয়ী এপোলো-১৫ নভোযানের ফ্লাইট সদস্য জেমস আরউইন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সবাই করে নি, সবাই কখনো করেও না। কারণ সত্যকে জানার পরেও মুখ ফিরিয়ে থাকা অনেক মানুষের স্বভাব ও অবধারিত নিয়তি।

মহানবী (সাঃ)এর সর্বাপেক্ষা দু'টি বড় মোযেজা হলো মিরাজ এবং আল কোরআন। মিরাজ এমন একটি ঘটনা, যা যুগপৎ ধারণাতীত ও বর্ণনাতীত; এবং যার

www.pathagar.com

সমধর্মী কোন তুল্য উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। আল্লাহপাক তাঁর হাবীবকে মক্কা থেকে প্রথমে বাইতুল মাক্‌দাস এবং তারপর সশরীরে এক অভাবিত নভোভ্রমণ অন্তে নিজের কাছে ডেকে নিলেন ও বাক্যবিনিময় করলেন। ধারণাতীত সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে সংঘটিত এই ঘটনা শুধু অলৌকিক মোযেজা নয়, রাসুল (সাঃ)-এর মহিমান্বিত নবুয়তি-জিন্দিগীর সকল মোযেজার সর্বোচ্চ শীর্ষদেশ। এবং এই মোযেজার স্বরূপ ও প্রকৃতি এমন যে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, নবী-রাসুলদেরও চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বাইরে। অবশ্য এই ঘটনাটিও রাসুল (সাঃ)-এর নিজস্ব ক্ষমতা বা কৃতিত্ব নয়, একান্তই আল্লাহপাকের অভিপ্রায় ও অনুগ্রহ।

দ্বিতীয় যে-মোযেজাটি রাসুল (সাঃ)-এর জীবন ও নবুয়তকে অবিসংবাদিত মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে তা হলো আল কোরআন। আল কোরআন অবশ্য একান্তভাবেই মহান আল্লাহপাক কর্তৃক প্রণীত। কিন্তু যেহেতু মানুষের কাছে এই মহিমান্বিত পবিত্র গ্রন্থটির একমাত্র পরিবেশক ও উপস্থাপক হলেন নবী মোহাম্মদ (সাঃ), এই গ্রন্থের যে-সীমাহীন শাশ্বত অলৌকিকতা, তার সঙ্গে নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সংশ্লিষ্টতাও অবশ্য স্বীকার্য। আল কোরআনের যে-মোযেজা তা বহুমুখী। আমরা এখানে দু'তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করবো। এক. সমগ্র মানব ও জ্বীন সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সহস্র সহস্র বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও পরিশ্রম দিয়েও আল কোরআনের একটি ক্ষুদ্র পংক্তির মত কোন পংক্তি রচনা করাও অসম্ভব অসাধ্য। দুই. আল কোরআনের কোন একটি কথা ও বাক্যের মধ্যেও যে লেশমাত্র ভুল বা অসংগতি নেই, এ-কথা কোরআনের যে-কোন প্রতিবাদী প্রতিশ্রুত দুশমনও স্বীকার করতে বাধ্য। এবং তিন. আল কোরআন যে-কোন রকম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিকৃতি থেকেও রোজ কেয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত; এবং সর্বকালেই এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্থ, রোজ কেয়ামত পর্যন্ত কোরআনে-হাফেজদের এই পরম্পরা সর্বজনপদে একইভাবে ইনশাআল্লাহ অবিচ্ছিন্ন থাকবে। অন্য অনেক নবী-রাসুলদের যে-মোযেজা, তা-ছিল তাঁদের পার্থিব জীবৎকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু নবী মোহাম্মদ (সাঃ) আনীত আল কোরআন ও আল কোরআনের অলৌকিকতা চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী।

অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন এবং বলেনও, রাসুল (সাঃ)-এর জীবনের যা-কিছু অলৌকিকত্ব, তা-তো সবই আল্লাহর কুদরত ও অভিপ্রায়েরই বহিঃপ্রকাশ; অতএব এক রাসুল (সাঃ)-এর মোযেজা বলে এককভাবে চিহ্নিত করা বোধ হয় একটু ভুল।

কথাটা সত্য কিন্তু সিদ্ধান্তটি সত্য নয়। আল্লাহপাক যে তাঁর প্রিয়তম হাবীবকে প্রিয়তমরূপে গ্রহণকরত তাঁর মধ্যে মনুষ্যকল্পনার অগম্য অভাবনীয় বহু ধরনের শক্তি ও ক্ষমতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন, আল্লাহপাকের এই ভালোবাসাই তো রাসুল (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠতম মোযেজা।

www.pathagar.com

যাই হোক, অত্যন্ত সংক্ষেপে হলেও, রাসুল (সাঃ)-এর যে-মোযেজা তার কিছু পরিচয় ও প্রকৃতি আমরা তুলে ধরেছি। নিশ্চয়ই এটা যথেষ্ট নয়। কারণ রাসুল (সাঃ)-এর মোযেজা নিয়ে, সকল বাহুল্য ও অতিকথা পরিহার করেও, একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হতে পারে। অতএব খুব বেশি হলে, বর্তমান আলোচনাটিকে মূল বিষয়ের একটি মুখবন্ধ হিসাবে ধরে নেয়া যায়। তবে পরিশেষে একটি কথা বলা বিশেষ জরুরি, তা হলো, আমরা কেবল রাসুল (সাঃ)-এর জীবনের যা-কিছু দৃশ্যত অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক, তাকেই মোযেজা বলে মনে করি। কিন্তু আসলে তাঁর পুরো জীবনটাই-যে আপাদমস্তক মোযেজা, এই কথাটি ভালোভাবে অনুধাবন করা হয় না। রাসুল (সাঃ)-এর মোবারক অংগুলি-সংকেতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, এটা মোযেজা; কিন্তু তিনি-যে তাঁর সমগ্র জীবনে একটিও মিথ্যা কথা বলেন নি, জীবনে ভুলক্রমে কি পরিহাসচ্ছলেও একটি কখনো অশ্লীল বাক্য কি শব্দ উচ্চারণ করেন নি, এটা কি কম আশ্চর্যজনক? তাঁর শরীর-মোবারকে কখনো মশামাছি বসতো না, এটা মোযেজা; ইহুদি এক পাষণ্ড-মহিলা প্রদত্ত তীব্রতম বিষ তাঁর দেহে কোনরূপে কোন ক্রিয়া করে নি, এটাও মোযেজা। কিন্তু হিজরতের সেই ভয়াবহ সংকটময় নিশুতি রাতে যখন তাঁর প্রাণঘাতী দুশমনদের রক্ষিত আমানত তিনি যথাযথ হিসাবসহ হজরত আলীর (রাঃ) কাছে ফেরতদানের নির্দেশ দিয়ে রেখে যান, মনে হয় বিশ্বস্ততার এই নজীরও এক অপরাজেয় মোযেজা।

রাসুল (সাঃ) মাঝে মাঝেই সওমে বিসাল অর্থাৎ একাদিক্রমে কয়েকদিন রোজা রাখতেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁর উপর কোন প্রভাব ফেলতো না; নিঃসন্দেহে এটা একটা উল্লেখযোগ্য মোযেজা। কিন্তু সুরা বনি ইসরাইলে তাহাজ্জুদের সালাত নফল বলে আল্লাহপাক উল্লেখ করা সত্ত্বেও রাসুল (সাঃ) তাঁর সমগ্র নবুয়তি জীবনে একটি রাতেও এই নামাজ তিনি বাদ দেন নি। (আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজ্বের ভাষণ যেদিন দিলেন, অনেক জীবনীকার লিখছেন, সেই একটি দিন ঈশার নামাজান্তে ভারমুক্ত এক অনাবিল প্রশান্তি নিয়ে রাসুল (সাঃ) ঘুমিয়ে গেলেন, উঠলেন ফজরের ওয়াক্তে। এই একটি রাতে তিনি তাহাজ্জুদ পড়েন-নি। ভাবা যায়!) অস্বীকার করার উপায় নেই, বড় কঠিন এই মোযেজা। আর এটাই-কি কল্পনা করা যায়, একটি মানুষের তেষট্টি বছরের বহু সংকট ও সমস্যাসংকুল মানবিক জীবনে এমন একটি ক্ষুদ্র কোন দৃষ্টান্তও নেই যে, তিনি কখনো ওয়াদা খেলাফ করেছেন। (বদর যুদ্ধের সেই ঘনঘোর সংকটের মধ্যেও দু'জন সাহাবী যখন বললেন, কাফেরদের হাতে ধৃত অবস্থায় তাঁরা বাধ্য হয়ে কথা দিয়েছেন, তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন। এখন তাঁরা কী করবেন? সেই তীব্র সৈন্য-সংকটের মধ্যেও রাসুল (সাঃ) বললেন, 'তোমরা ওয়াদা রক্ষা করো)। সবিস্ময়ে পৃথিবী এটাও লক্ষ্য করে, আবহমান মানববংশে এই একটিইমাত্র মানুষ, যাঁর কাছে কেউ কখনো-কিছু প্রার্থনা করে বিমুখ হয় নি। এমন কি যখন তাঁর কাছে দেবার মত কিছুই থাকতো না, তখনো ধার করে তিনি প্রার্থীর অভাব পূরণ করেছেন। এ-নিয়ে

www.pathagar.com

হজরত উমার ফারুক (রাঃ) একদিন তাঁকে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, যতক্ষণ আপনার কাছে আছে আপনি দান করবেন, কিন্তু যখন নেই তখনো কেন ঋণ করে প্রার্থীর অভাব পূরণ করতে হবে।' রাসুল (সাঃ) কথাটা পছন্দ করেন নি, এবং একটু মনঃক্ষুন্নও হয়েছিলেন।

এইরকম কত-দিকের কত যে ঘটনা তার কোন শেষ নেই।

সমগ্র আরব তাঁকে যখন দুশমন ভেবে প্রাণহরণের সংকল্প নিয়ে উন্মত্তপ্রায়, তিনি কি কখনো মুহূর্তের জন্যও ভীত কি বিচলিত হয়েছেন? হন নি। ২৭টি যুদ্ধে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু বহুগুণ শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও তাঁকে কি কখনো মুহূর্তের জন্যও সন্ত্রস্ত কি নিরুদ্যম দেখা গেছে? বরং তিনি বলতেন, যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর ফয়সালা না-হওয়া পর্যন্ত পোশাক পরিবর্তন করা নবী-রাসুলদের জন্য নিষিদ্ধ।

রাসুল (সাঃ)-এর জীবনের এইসব এক-একটি দিক, আমরা যাকে অলৌকিকতা বলি,তার চেয়ে সহস্রগুণ অধিক অলৌকিক; এবং যাকে মোযেজা বলে জানি, তদপেক্ষা অনেক বড় মোযেজার পরিচয়বহ।

এই উদাহরণ আরো অনেক পেশ করা যায়, এবং এই আলোচনা আরো বেশি দীর্ঘও করা যায়, কিন্তু পরিশেষে আর দু'একটি বিষয় উল্লেখ করেই মোযেজা সম্পর্কিত এই আলোচনা আমরা শেষ করতে চাই।

বদর যুদ্ধে আল্লাহপাক ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করেছিলেন; এবং সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও রাসুল (সাঃ) যুদ্ধজয়ের অগ্রিম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এটা একটা বিরাট মোযেজা; কিন্তু ওহুদের যুদ্ধে প্রিয়তম পিতৃব্য হজরত হামযাসহ (রাঃ) ৭০ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন, হজরত আলী, তালহা প্রমুখ সাহাবীদের শরীর কাফেরদের আক্রমণে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, রাসুল (সাঃ) নিজে রক্তাপ্লুত, মৃতপ্রায়। এই অবস্থায়ও রাসুল (সাঃ)-এর মুখে অন্য কোন কথা নেই; শুধু এইটুকু বলেছিলেন, 'নিজেদের মুক্তি ও কল্যাণের দিশারী রাসুলকে যারা রক্তাপ্লুত করে, তারা কী-ভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারে!' আর আল্লাহর কাছে কাতরকণ্ঠে শুধু এই দোয়া করছেন, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার কওমকে ক্ষমা করো, তারা জানে না।'

কল্পনা করা যায়! আমাদের তো মনে হয়, দুশমনের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত একটি মানুষের এই প্রার্থনা চন্দ্র-বিদারণ অপেক্ষাও অনেক বেশি বিস্ময়কর।

রাসুল (সাঃ) মদীনাকেন্দ্রিক একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার পর দেখা গেল অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই রাষ্ট্রের কোথাও আর কোন অভাব নেই। এবং রাসুল (সাঃ)-

www.pathagar.com

এর জীবনের শেষ দিকে তিনি আট লক্ষাধিক বর্গমাইলের একচ্ছত্র শাসক ও অধীশ্বর। কিন্তু নিরঙ্কুশ ক্ষমতার এমন শীর্ষে আরোহণ ও অবস্থান করা সত্ত্বেও, চতুর্দিকে যদিও প্রাচুর্যের সমারোহ, কিন্তু কী-এক অনুপম অবিশ্বাস্য দৃশ্য, রাসুল (সাঃ) নিজ হাতে দুগ্ধ দোহন করছেন, নিজ হাতে নিজের জুতা মেরামত করছেন, খুবই ছোট একেবারেই একটি সংকীর্ণ অপরিসর ঘরে অকল্পনীয় দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়ে তিনি সংসার নির্বাহ করছেন। দড়ির একটি চার-পায়া, একটি পানির মশক ছাড়া আসবাব বলতে কিছুই নেই; স্ত্রী-পরিজন নিয়ে প্রায়ই অনাহার অর্ধাহারে যাঁর দিন অতিবাহিত হচ্ছে। অথচ এই মানুষটি শুধু আল্লাহর নবী নন, বিশাল আরব-ভূখণ্ডের অবিসংবাদিত সম্রাটও বটে।

এমন অনুপম হতবাক-করা দৃশ্য, এমন-কৃচ্ছ্রতার অবিশ্বাস্য বাস্তবরূপ পৃথিবী কখনো দেখে নি, কখনো দেখবেও না। বৃক্ষের হেঁটে আসা, সওর পর্বতের গুহামুখে মাকড়সার জাল-বুনন, হিজরতের পথে অর্থলোভে পশ্চাদ্ধাবনরত ঘোড়াসহ সুরাকার উপর্যুপরি বিপর্যয়, এ-সবও এক একটি মোযেজার অভাবনীয় উদাহরণ। কিন্তু রাসুল (সাঃ)-এর নিত্যদিনের যে-জীবনচিত্র, সেই চিত্র কি যে-কোন প্রদর্শিত মোযেজার চেয়ে কম বিস্ময়কর!

রাসুল (সাঃ) দৃশ্যত যদিও নিদ্রা যেতেন কিন্তু তাঁর অন্তর কখনো ঘুমোতো না, যে-কারণে নিদ্রাহেতু তাঁর অজু নষ্ট হতো না। শরীরে অক্সিজেনের অভাবহেতু মানুষের যে কখনো কখনো হাই ওঠে, রাসুল (সাঃ)-এর কখনো এই ধরনের অবসাদজনিত হাই ওঠে নি। এ সবই মোযেজা। তাঁর কাছে আগত দর্শনার্থীরা বহু দূর থেকেই এক ধরনের ভীতিমিশ্রিত প্রভাব অনুভব করতো, এটাও মোযেজা। কিন্তু যখন দেখি, অসংখ্য যুদ্ধের তিনি মহানায়ক, এবং সব যুদ্ধেই তিনি নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছেন; অথচ এমন একটি দৃষ্টান্ত নেই যে, তিনি যুদ্ধজয়ের কারণে কখনো মুহূর্তমাত্রও উল্লসিত হয়েছেন। বরং মনে হয়েছে, পরাজিত প্রতিপক্ষও তাঁর আপনজন, যাদের পার্থিব ও পারলৌকিক সর্বনাশ তাঁকে দুঃখী ও ব্যথিত করে তোলে। দুশমনের প্রতিও এই যে এমন অন্তরমথিত প্রেম, একে কী-পরিচয়ে অভিহিত করা যায়? মক্কার যে কাফের ও মুশরিকরা বছরের পর বছর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে, মক্কাবিজয়ের পর পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, রাসুল (সাঃ) তাদের সবাইকে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা করলেন। ক্ষমার এই এমন অদৃষ্টপূর্ব অশ্রুতপূর্ব ঘটনাটিকে কী বলা যায়? ক্ষমা ও ঔদার্যের মধ্যে বাঙময় হয়ে ওঠা মানবিক মহত্ত্বের এই অসম্ভব অত্যুচ্চ উদাহরণ কি রাসুল-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মোযেজা নয়?

প্রকৃতপক্ষে রাসুল (সাঃ)-এর ৬৩ বছরের পুরো জিন্দিগীটাই একটি বহুবর্ণ মোযেজার এক অবিসংবাদিত সমাহার। আল্লাহপাক তাঁর তাওহিদী-দ্বীনের জন্য সর্বাত্মক কোরবানী ও সংগ্রামের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী এই রসুল (সাঃ) কে দান করেছিলেন সব দিক থেকে মানববুদ্ধির গম্য-অগম্য সর্বোচ্চ শক্তি ও সর্বাধিক অনুগ্রহ।

www.pathagar.com

তাঁর কোন দোয়াই আল্লাহপাক কখনো অপূর্ণ রাখেন নি।

অতএব পৃথিবীচক্ষে যা-মোযেজা, রাসুল (সাঃ)-এর কাছে তা-সবই ছিল স্বাভাবিক। আল্লাহপাক সূরা জাছিয়াতে বলেছেন, ধরাপৃষ্ঠ থেকে নভোমণ্ডল পর্যন্ত যেখানে যা কিছু আছে, সব তোমাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে।

এই কথা যদি সত্য হয়, এবং অবশ্যই সত্য, তাহলে আল্লাহপাকের সর্বাধিক প্রিয় মানুষটির সম্ভব-অসম্ভব সকল ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য আকাশে পৃথিবীতে সবাই যে প্রস্তুত, সবাই যে সদাব্যগ্র, এ নিয়ে আর সন্দেহ কী!

বড়পীর সাহেব হজরত আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর জীবনীগ্রন্থে একটি বেশ রোমাঞ্চকর ঘটনার উল্লেখ আছে। একদা একজন গোঁড়া খ্রীস্টান 'ঈশ্বরপুত্র' যীশুখ্রীস্টের বড়ত্ব প্রমাণ করবার জন্য বললো, 'যীশু অনেক মৃতকে জীবিত করেছেন, কিন্তু আপনাদের রাসুল তো কখনো কোন মৃত মানুষকে জীবন দান করতে পারেন নি।' বড়পীর সাহেব মুখে তাৎক্ষণিকভাবে কোন জবাব না দিয়ে খ্রীস্টানকে সঙ্গে নিয়ে গোরস্থানে গেলেন। তারপর একজন কবরবাসীকে আহবান জানালেন উঠে আসবার জন্য। আল্লাহপাকের ইচ্ছায় সেই কবরবাসী উঠে এসে সালাম জানিয়ে কিছু সময় বাক্যালাপ করে আবার কবরে ফিরে গেল। খ্রীস্টান ব্যক্তিটি স্তম্ভিত, হতবাক। বড়পীর সাহেব খ্রীস্টানকে বললেন, 'যে-নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর মোবারক পায়ের নগণ্যতম একটি ধূলিকণার যোগ্যও আমি নই, সেই আমিই যখন ইনশাআল্লাহ মৃতকে জীবিত করতে পারি, আমার রাসুল (সাঃ) কীই-না পারতেন!'

রাসুল (সাঃ) কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে এ-বিষয়ে আরো একটু বিশদভাবে জানা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। অনেকদিন পর্যন্ত , এমনকি মযবুত ঈমানদারদেরও ধারণা ছিল, চন্দ্রবিভক্তি সত্য বটে, কিন্তু একেবারে নিরেট প্রমাণনির্ভর বাস্তব নয়।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আল্লাহপাক স্বীয় অনুগ্রহে এই ভুল ভেঙে দিয়েছেন। নবী-রাসুলদের মোযেজা যে কোনরূপ কোন বিভ্রম নয়, তা-যে শতকরা শতভাগ বাস্তব ও সংশয়হীন, চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে গৃহীত আলোকচিত্র এবং নানা তথ্য-উপাত্ত থেকে এটা এখন সুপ্রমাণিত। দেখা যাচ্ছে, খালের মত একটি পরিষ্কার ফাটলরেখা চাঁদকে বেষ্টন করে আছে; আবিষ্কারক বিজ্ঞানীর নামে যার নামকরণ করা হয়েছে 'হেরিক্স ক্যানাল।' এবং এই ক্যানাল-যে দেড়-দুই হাজার বছরের অধিক পুরনো নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সে বিষয়েও সুনিশ্চিত।

আল্লাহপাকের কী কুদরত, আধুনিক বিজ্ঞানীরা আধুনিক বিশ্বকে নিশ্চিত-চন্দ্রবিভক্তির কথা নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। এবং এই বিষয়টির কারণেই

www.pathagar.com

আল্লাহপাকের ইচ্ছায় অন্যতম চন্দ্রবিজয়ী এপোলো-১৫ নভোযানের ফ্লাইট সদস্য জেমস আরউইন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সবাই করে নি, সবাই কখনো করেও না। কারণ সত্যকে জানার পরেও মুখ ফিরিয়ে থাকা অনেক মানুষের স্বভাব ও অবধারিত নিয়তি।

মহানবী (সাঃ)এর সর্বাপেক্ষা দু'টি বড় মোযেজা হলো মিরাজ এবং আল কোরআন। মিরাজ এমন একটি ঘটনা, যা যুগপৎ ধারণাতীত ও বর্ণনাতীত; এবং যার সমধর্মী কোন তুল্য উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। আল্লাহপাক তাঁর হাবীবকে মক্কা থেকে প্রথমে বাইতুল মাক্‌দাস এবং তারপর সশরীরে এক অভাবিত নভোভ্রমণ অন্তে নিজের কাছে ডেকে নিলেন ও বাক্যবিনিময় করলেন। ধারণাতীত সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে সংঘটিত এই ঘটনা শুধু অলৌকিক মোযেজা নয়, রাসুল (সাঃ)-এর মহিমান্বিত নবুয়তি-জিন্দিগীর সকল মোযেজার সর্বোচ্চ শীর্ষদেশ। এবং এই মোযেজার স্বরূপ ও প্রকৃতি এমন যে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, নবী-রাসুলদেরও চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বাইরে। অবশ্য এই ঘটনাটিও রাসুল (সাঃ)-এর নিজস্ব ক্ষমতা বা কৃতিত্ব নয়, একান্তই আল্লাহপাকের অভিপ্রায় ও অনুগ্রহ।

দ্বিতীয় যে-মোযেজাটি রাসুল (সাঃ)-এর জীবন ও নবুয়তকে অবিসংবাদিত মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে তা হলো আল কোরআন। আল কোরআন অবশ্য একান্তভাবেই মহান আল্লাহপাক কর্তৃক প্রণীত। কিন্তু যেহেতু মানুষের কাছে এই মহিমান্বিত পবিত্র গ্রন্থটির একমাত্র পরিবেশক ও উপস্থাপক হলেন নবী মোহাম্মদ (সাঃ), এই গ্রন্থের যে-সীমাহীন শাশ্বত অলৌকিকতা, তার সঙ্গে নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সংশ্লিষ্টতাও অবশ্য স্বীকার্য। আল কোরআনের যে-মোযেজা তা বহুমুখী। আমরা এখানে দু'তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করবো। এক. সমগ্র মানব ও জ্বীন সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সহস্র সহস্র বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও পরিশ্রম দিয়েও আল কোরআনের একটি ক্ষুদ্র পংক্তির মত কোন পংক্তি রচনা করাও অসম্ভব অসাধ্য। দুই. আল কোরআনের কোন একটি কথা ও বাক্যের মধ্যেও যে লেশমাত্র ভুল বা অসংগতি নেই, এ-কথা কোরআনের যে-কোন প্রতিবাদী প্রতিশ্রুত দুশমনও স্বীকার করতে বাধ্য। এবং তিন. আল কোরআন যে-কোন রকম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিকৃতি থেকেও রোজ কেয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত; এবং সর্বকালেই এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্থ, রোজ কেয়ামত পর্যন্ত কোরআনে-হাফেজদের এই পরম্পরা সর্বজনপদে একইভাবে ইনশাআল্লাহ অবিচ্ছিন্ন থাকবে। অন্য অনেক নবী-রাসুলদের যে-মোযেজা, তা-ছিল তাঁদের পার্থিব জীবৎকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু নবী মোহাম্মদ (সাঃ) আনীত আল কোরআন ও আল কোরআনের অলৌকিকতা চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী।

অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন এবং বলেনও, রাসুল (সাঃ)-এর জীবনের যা-

www.pathagar.com

কিছু অলৌকিকত্ব, তা-তো সবই আল্লাহর কুদরত ও অভিপ্রায়েরই বহিঃপ্রকাশ; অতএব এক রাসুল (সাঃ)-এর মোযেজা বলে এককভাবে চিহ্নিত করা বোধ হয় একটু ভুল।

কথাটা সত্য কিন্তু সিদ্ধান্তটি সত্য নয়। আল্লাহপাক যে তাঁর প্রিয়তম হাবীবকে প্রিয়তমরূপে গ্রহণকরত তাঁর মধ্যে মনুষ্যকল্পনার অগম্য অভাবনীয় বহু ধরনের শক্তি ও ক্ষমতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন, আল্লাহপাকের এই ভালোবাসাই তো রাসুল (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠতম মোযেজা।

যাই হোক, অত্যন্ত সংক্ষেপে হলেও, রাসুল (সাঃ)-এর যে-মোযেজা তার কিছু পরিচয় ও প্রকৃতি আমরা তুলে ধরেছি। নিশ্চয়ই এটা যথেষ্ট নয়। কারণ রাসুল (সাঃ)-এর মোযেজা নিয়ে, সকল বাহুল্য ও অতিকথা পরিহার করেও, একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হতে পারে। অতএব খুব বেশি হলে, বর্তমান আলোচনাটিকে মূল বিষয়ের একটি মুখবন্ধ হিসাবে ধরে নেয়া যায়। তবে পরিশেষে একটি কথা বলা বিশেষ জরুরি, তা হলো, আমরা কেবল রাসুল (সাঃ)-এর জীবনের যা-কিছু দৃশ্যত অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক, তাকেই মোযেজা বলে মনে করি। কিন্তু আসলে তাঁর পুরো জীবনটাই-যে আপাদমস্তক মোযেজা, এই কথাটি ভালোভাবে অনুধাবন করা হয় না। রাসুল (সাঃ)-এর মোবারক অংগুলি-সংকেতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, এটা মোযেজা; কিন্তু তিনি-যে তাঁর সমগ্র জীবনে একটিও মিথ্যা কথা বলেন নি, জীবনে ভুলক্রমে কি পরিহাসচ্ছলেও একটি কখনো অশ্লীল বাক্য কি শব্দ উচ্চারণ করেন নি, এটা কি কম আশ্চর্যজনক? তাঁর শরীর-মোবারকে কখনো মশামাছি বসতো না, এটা মোযেজা; ইহুদি এক পাষণ্ড-মহিলা প্রদত্ত তীব্রতম বিষ তাঁর দেহে কোনরূপে কোন ক্রিয়া করে নি, এটাও মোযেজা। কিন্তু হিজরতের সেই ভয়াবহ সংকটময় নিশুতি রাতে যখন তাঁর প্রাণঘাতী দুশমনদের রক্ষিত আমানত তিনি যথাযথ হিসাবসহ হজরত আলীর (রাঃ) কাছে ফেরতদানের নির্দেশ দিয়ে রেখে যান, মনে হয় বিশ্বস্ততার এই নজীরও এক অপরাজেয় মোযেজা।

রাসুল (সাঃ) মাঝে মাঝেই সওমে বিসাল অর্থাৎ একাদিক্রমে কয়েকদিন রোজা রাখতেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁর উপর কোন প্রভাব ফেলতো না; নিঃসন্দেহে এটা একটা উল্লেখযোগ্য মোযেজা। কিন্তু সুরা বনি ইসরাইলে তাহাজ্জুদের সালাত নফল বলে আল্লাহপাক উল্লেখ করা সত্ত্বেও রাসুল (সাঃ) তাঁর সমগ্র নবুয়তি জীবনে একটি রাতেও এই নামাজ তিনি বাদ দেন নি। (আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজ্বের ভাষণ যেদিন দিলেন, অনেক জীবনীকার লিখছেন, সেই একটি দিন ঈশার নামাজান্তে ভারমুক্ত এক অনাবিল প্রশান্তি নিয়ে রাসুল (সাঃ) ঘুমিয়ে গেলেন, উঠলেন ফজরের ওয়াক্তে। এই একটি রাতে তিনি তাহাজ্জুদ পড়েন-নি। ভাবা যায়!) অস্বীকার করার উপায় নেই, বড় কঠিন এই মোযেজা। আর এটাই-কি কল্পনা করা যায়, একটি মানুষের তেষট্টি বছরের বহু সংকট ও সমস্যাসংকুল মানবিক জীবনে এমন একটি ক্ষুদ্র কোন দৃষ্টান্তও নেই যে,

www.pathagar.com

তিনি কখনো ওয়াদা খেলাফ করেছেন। (বদর যুদ্ধের সেই ঘনঘোর সংকটের মধ্যেও দু'জন সাহাবী যখন বললেন, কাফেরদের হাতে ধৃত অবস্থায় তাঁরা বাধ্য হয়ে কথা দিয়েছেন, তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন। এখন তাঁরা কী করবেন? সেই তীব্র সৈন্য-সংকটের মধ্যেও রাসুল (সাঃ) বললেন, 'তোমরা ওয়াদা রক্ষা করো)। সবিস্ময়ে পৃথিবী এটাও লক্ষ্য করে, আবহমান মানববংশে এই একটিইমাত্র মানুষ, যাঁর কাছে কেউ কখনো-কিছু প্রার্থনা করে বিমুখ হয় নি। এমন কি যখন তাঁর কাছে দেবার মত কিছুই থাকতো না, তখনো ধার করে তিনি প্রার্থীর অভাব পূরণ করেছেন। এ-নিয়ে হজরত উমার ফারুক (রাঃ) একদিন তাঁকে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, যতক্ষণ আপনার কাছে আছে আপনি দান করবেন, কিন্তু যখন নেই তখনো কেন ঋণ করে প্রার্থীর অভাব পূরণ করতে হবে।' রাসুল (সাঃ) কথাটা পছন্দ করেন নি, এবং একটু মনঃক্ষুন্নও হয়েছিলেন।

এইরকম কত-দিকের কত যে ঘটনা তার কোন শেষ নেই।

সমগ্র আরব তাঁকে যখন দুশমন ভেবে প্রাণহরণের সংকল্প নিয়ে উন্মত্তপ্রায়, তিনি কি কখনো মুহূর্তের জন্যও ভীত কি বিচলিত হয়েছেন? হন নি। ২৭টি যুদ্ধে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু বহুগুণ শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও তাঁকে কি কখনো মুহূর্তের জন্যও সন্ত্রস্ত কি নিরুদ্যম দেখা গেছে? বরং তিনি বলতেন, যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর ফয়সালা না-হওয়া পর্যন্ত পোশাক পরিবর্তন করা নবী-রাসুলদের জন্য নিষিদ্ধ।

রাসুল (সাঃ)-এর জীবনের এইসব এক-একটি দিক, আমরা যাকে অলৌকিকতা বলি,তার চেয়ে সহস্রগুণ অধিক অলৌকিক; এবং যাকে মোযেজা বলে জানি, তদপেক্ষা অনেক বড় মোযেজার পরিচয়বহ।

এই উদাহরণ আরো অনেক পেশ করা যায়, এবং এই আলোচনা আরো বেশি দীর্ঘও করা যায়, কিন্তু পরিশেষে আর দু'একটি বিষয় উল্লেখ করেই মোযেজা সম্পর্কিত এই আলোচনা আমরা শেষ করতে চাই।

বদর যুদ্ধে আল্লাহপাক ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করেছিলেন; এবং সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও রাসুল (সাঃ) যুদ্ধজয়ের অগ্রিম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এটা একটা বিরাট মোযেজা; কিন্তু ওহুদের যুদ্ধে প্রিয়তম পিতৃব্য হজরত হামযাসহ (রাঃ) ৭০ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন, হজরত আলী, তালহা প্রমুখ সাহাবীদের শরীর কাফেরদের আক্রমণে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, রাসুল (সাঃ) নিজে রক্তাপ্লুত, মৃতপ্রায়। এই অবস্থায়ও রাসুল (সাঃ)-এর মুখে অন্য কোন কথা নেই; শুধু এইটুকু বলেছিলেন, 'নিজেদের মুক্তি ও কল্যাণের দিশারী রাসুলকে যারা রক্তাপ্লুত করে, তারা কী-ভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারে!' আর আল্লাহর কাছে কাতরকণ্ঠে শুধু এই

www.pathagar.com

দোয়া করছেন, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার কওমকে ক্ষমা করো, তারা জানে না।'

কল্পনা করা যায়! আমাদের তো মনে হয়, দুশমনের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত একটি মানুষের এই প্রার্থনা চন্দ্র-বিদারণ অপেক্ষাও অনেক বেশি বিস্ময়কর।

রাসুল (সাঃ) মদীনাকেন্দ্রিক একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার পর দেখা গেল অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই রাষ্ট্রের কোথাও আর কোন অভাব নেই। এবং রাসুল (সাঃ)-এর জীবনের শেষ দিকে তিনি আট লক্ষাধিক বর্গমাইলের একচ্ছত্র শাসক ও অধীশ্বর। কিন্তু নিরঙ্কুশ ক্ষমতার এমন শীর্ষে আরোহণ ও অবস্থান করা সত্ত্বেও, চতুর্দিকে যদিও প্রাচুর্যের সমারোহ, কিন্তু কী-এক অনুপম অবিশ্বাস্য দৃশ্য, রাসুল (সাঃ) নিজ হাতে দুগ্ধ দোহন করছেন, নিজ হাতে নিজের জুতা মেরামত করছেন, খুবই ছোট একেবারেই একটি সংকীর্ণ অপরিসর ঘরে অকল্পনীয় দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়ে তিনি সংসার নির্বাহ করছেন। দড়ির একটি চার-পায়া, একটি পানির মশক ছাড়া আসবাব বলতে কিছুই নেই; স্ত্রী-পরিজন নিয়ে প্রায়ই অনাহার অর্ধাহারে যাঁর দিন অতিবাহিত হচ্ছে। অথচ এই মানুষটি শুধু আল্লাহর নবী নন, বিশাল আরব-ভূখণ্ডের অবিসংবাদিত সম্রাটও বটে।

এমন অনুপম হতবাক-করা দৃশ্য, এমন-কৃচ্ছ্রতার অবিশ্বাস্য বাস্তবরূপ পৃথিবী কখনো দেখে নি, কখনো দেখবেও না। বৃক্ষের হেঁটে আসা, সওর পর্বতের গুহামুখে মাকড়সার জাল-বুনন, হিজরতের পথে অর্থলোভে পশ্চাদ্ধাবনরত ঘোড়াসহ সুরাকার উপর্যুপরি বিপর্যয়, এ-সবও এক একটি মোযেজার অভাবনীয় উদাহরণ। কিন্তু রাসুল (সাঃ)-এর নিত্যদিনের যে-জীবনচিত্র, সেই চিত্র কি যে-কোন প্রদর্শিত মোযেজার চেয়ে কম বিস্ময়কর!

রাসুল (সাঃ) দৃশ্যত যদিও নিদ্রা যেতেন কিন্তু তাঁর অন্তর কখনো ঘুমোতো না, যে-কারণে নিদ্রাহেতু তাঁর অজু নষ্ট হতো না। শরীরে অক্সিজেনের অভাবহেতু মানুষের যে কখনো কখনো হাই ওঠে, রাসুল (সাঃ)-এর কখনো এই ধরনের অবসাদজনিত হাই ওঠে নি। এ সবই মোযেজা। তাঁর কাছে আগত দর্শনার্থীরা বহু দূর থেকেই এক ধরনের ভীতিমিশ্রিত প্রভাব অনুভব করতো, এটাও মোযেজা। কিন্তু যখন দেখি, অসংখ্য যুদ্ধের তিনি মহানায়ক, এবং সব যুদ্ধেই তিনি নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছেন; অথচ এমন একটি দৃষ্টান্ত নেই যে, তিনি যুদ্ধজয়ের কারণে কখনো মুহূর্তমাত্রও উল্লসিত হয়েছেন। বরং মনে হয়েছে, পরাজিত প্রতিপক্ষও তাঁর আপনজন, যাদের পার্থিব ও পারলৌকিক সর্বনাশ তাঁকে দুঃখী ও ব্যথিত করে তোলে। দুশমনের প্রতিও এই যে এমন অন্তরমথিত প্রেম, একে কী-পরিচয়ে অভিহিত করা যায়? মক্কার যে কাফের ও মুশরিকরা বছরের পর বছর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে, মক্কাবিজয়ের পর পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, রাসুল (সাঃ) তাদের সবাইকে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা করলেন। ক্ষমার এই এমন অদৃষ্টপূর্ব

www.pathagar.com

অশ্রুতপূর্ব ঘটনাটিকে কী বলা যায়? ক্ষমা ও ঔদার্যের মধ্যে বাঙময় হয়ে ওঠা মানবিক মহত্ত্বের এই অসম্ভব অত্যুচ্চ উদাহরণ কি রাসুল-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মোযেজা নয়?

প্রকৃতপক্ষে রাসুল (সাঃ)-এর ৬৩ বছরের পুরো জিন্দিগীটাই একটি বহুবর্ণ মোযেজার এক অবিসংবাদিত সমাহার। আল্লাহপাক তাঁর তাওহিদী-দ্বীনের জন্য সর্বাত্মক কোরবানী ও সংগ্রামের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী এই রসুল (সাঃ) কে দান করেছিলেন সব দিক থেকে মানববুদ্ধির গম্য-অগম্য সর্বোচ্চ শক্তি ও সর্বাধিক অনুগ্রহ। তাঁর কোন দোয়াই আল্লাহপাক কখনো অপূর্ণ রাখেন নি।

অতএব পৃথিবীচক্ষে যা-মোযেজা, রাসুল (সাঃ)-এর কাছে তা-সবই ছিল স্বাভাবিক। আল্লাহপাক সূরা জাছিয়াতে বলেছেন, ধরাপৃষ্ঠ থেকে নভোমণ্ডল পর্যন্ত যেখানে যা কিছু আছে, সব তোমাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে।

এই কথা যদি সত্য হয়, এবং অবশ্যই সত্য, তাহলে আল্লাহপাকের সর্বাধিক প্রিয় মানুষটির সম্ভব-অসম্ভব সকল ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য আকাশে পৃথিবীতে সবাই যে প্রস্তুত, সবাই যে সদাব্যগ্র, এ নিয়ে আর সন্দেহ কী!

বড়পীর সাহেব হজরত আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর জীবনীগ্রন্থে একটি বেশ রোমাঞ্চকর ঘটনার উল্লেখ আছে। একদা একজন গোঁড়া খ্রীস্টান 'ঈশ্বরপুত্র' যীশুখ্রীস্টের বড়ত্ব প্রমাণ করবার জন্য বললো, 'যীশু অনেক মৃতকে জীবিত করেছেন, কিন্তু আপনাদের রাসুল তো কখনো কোন মৃত মানুষকে জীবন দান করতে পারেন নি।' বড়পীর সাহেব মুখে তাৎক্ষণিকভাবে কোন জবাব না দিয়ে খ্রীস্টানকে সঙ্গে নিয়ে গোরস্থানে গেলেন। তারপর একজন কবরবাসীকে আহবান জানালেন উঠে আসবার জন্য। আল্লাহপাকের ইচ্ছায় সেই কবরবাসী উঠে এসে সালাম জানিয়ে কিছু সময় বাক্যালাপ করে আবার কবরে ফিরে গেল। খ্রীস্টান ব্যক্তিটি স্তম্ভিত, হতবাক। বড়পীর সাহেব খ্রীস্টানকে বললেন, 'যে-নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর মোবারক পায়ের নগণ্যতম একটি ধূলিকণার যোগ্যও আমি নই, সেই আমিই যখন ইনশাআল্লাহ মৃতকে জীবিত করতে পারি, আমার রাসুল (সাঃ) কীই-না পারতেন!'

www.pathagar.com

রাসুল (সাঃ)এর দাম্পত্য জীবন

দাম্পত্য জীবন ও দাম্পত্য জীবনের সৌরভ মানুষের জন্য আল্লাহপাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এই নেয়ামত থেকে কেউ যাতে কোন অনিবার্য কারণ ছাড়া স্বেচ্ছায় নিজেকে মাহরুম না-রাখে, সে-জন্য রাসুল (সাঃ) বিবাহকে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ্ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এবং এটা আল্লাহপাকেরও অভিপ্রায় যে, মানুষ স্বামী-স্ত্রীরূপে পরস্পর-সম্পৃক্ত ও সন্নিবিষ্ট যুগল জীবনযাপন করুক। অবশ্য এটা মানুষের স্বভাবেরও দাবী, সভ্যতারও দাবী, এবং মানবজীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ও পূর্ণতারও দাবী। অর্থাৎ দাম্পত্যজীবন-বিচ্ছিন্ন একটি মানুষ, মানব-সভ্যতার স্বাভাবিক ও শাশ্বত দাবীর বিপরীত মেরুতে দণ্ডায়মান একটি অস্বাভাবিক অপূর্ণ ও অপরিণত মানুষ। তার দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি অসম্পূর্ণ, জীবন ও জীবনবোধ খণ্ডিত; এবং সর্বোপরি আল্লাহর একটি অমূল্য অনুগ্রহ থেকে মাহরুম, সে-একজন অতিশয় দুঃখী ও নিঃস্ব-নিঃসঙ্গ মানবসন্তান। কিন্তু এ-হলো একান্তভাবেই যারা বিবাহ-বিমুখ, যারা কৌমার্যের অনুরাগী বৈরাগ্যবিলাসী, সেই সব নিয়তির হাতে স্বেচ্ছাপ্রহৃত দুর্ভাগাদের কথা। এদের সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এদের এই অনভিপ্রেত একাকী-জীবন মানব প্রকৃতির পরিপন্থি-তো বটেই, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) কাছে বিশেষ অপছন্দনীয়ও বটে।

অবশ্য এই ধরনের দুঃখী দুর্ভাগাদের সংখ্যা, অন্তত মুসলিম সমাজে, খুবই কম; অতএব এ-নিয়ে বেশি আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও কম। কিন্তু যে-কথাটি বেশি জরুরি তাহলো, দাম্পত্য জীবন আল্লাহপাকের একটি বিশেষ নেয়ামত বটে, কিন্তু খুব কম মানুষের দাম্পত্য জীবনই সুখময় ও স্নিগ্ধ-সৌরভে আমোদিত। শুধু আজ নয়, চিরকালই, যেখানে দু'টি মানুষের মিলিত জীবন হয়ে ওঠার কথা অনাবিলভাবে আনন্দঘন, হয়ে ওঠার কথা আবেগে-অনুরাগে অন্তরঙ্গ, সেই জীবনেরই মধ্য দিয়ে নিরন্তর বয়ে চলে এক অসহ্য অকথ্য যন্ত্রণার নদী; জীবনে জড়িয়ে থাকে শুধু কন্টক,শুধু বিবমিষা, শুধু মরুভূমির মত হাহাকার, শুধু রক্তক্ষরিত নারকীয় দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু এ-থেকে বাঁচবার উপায় কী? উপায় হলো, ইসলাম যেভাবে বলে সেইভাবে সংসারকে সাজিয়ে নেয়া। ইসলাম যেহেতু মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনের সর্বতোমুখী সংকট সমস্যা ও সুখদুঃখের প্রতি পূর্ণমনস্ক, দাম্পত্য জীবনের মত এই একটি অপরিহার্য দিক-কে ইসলাম অবহেলা করতে পারে না, করেও না।

বলাই বাহুল্য, ইসলাম অন্য কিছু নয়, ইসলাম হলো আল্লাহপাক কর্তৃক প্রেরিত আদেশ-নিষেধ সম্বলিত নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত এবং রাসুল (সাঃ) পেশকৃত আদর্শ। নিশ্চিতরূপে বলা যায়, এই দু'টি বস্তু যদি কোন দম্পতির সম্মুখে আলোকবর্তিকারূপে বিরাজ করে, অভাব অনটন সাংসারিক দুঃখ-দৈন্য যাই থাক, দাম্পত্যজীবনের সখ্য ও

www.pathagar.com

সৌন্দর্য কিছুমাত্র নষ্ট কি নিষ্প্রভ হওয়ার কথা নয়। আসলে নারী-পুরুষের মিলিত স্বপ্নের সংসার-যে দ্রুত বা ধীরগতিতে একটি অশান্তির লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়, তার কারণ পারস্পরিক অবিশ্বাস, পারস্পরিক অশ্রদ্ধা ও অবমূল্যায়ন এবং এক ধরনের নীরব আত্মম্ভরিতা। এই কারণগুলিই প্রকৃত কারণ, যা-থেকে সৃষ্টি হয় দুরারোগ্য ধরনের অসংগতি, সৃষ্টি হয় ফাঁক ও ফাঁকি ও ফাটল। কিছু ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু সাধারণভাবে এইগুলিই কারণ। দোষটা দ্বিপাক্ষিক নয়, সম্পূর্ণরূপে এক-পাক্ষিক, এইরকম কিছু ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করি। হজরত লুত (আঃ)এর স্ত্রীর কর্ম ও আচরণ ছিল স্বামীর সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক, যেহেতু নবী রাসুলরা সর্বদা সবদিক থেকেই নিষ্পাপ, অতএব লুত (আঃ)কে এতটুকু দায়ী করার কোন উপায় নেই; অথচ তাঁকে স্ত্রীর কারণে সততই মানসিক কষ্ট ও অস্থিরতার মধ্যে থাকতে হয়েছে। হজরত আছিয়া সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহীয়সী নারী, অথচ তাঁর স্বামী ছিল জগদ্বিখ্যাত খোদাদ্রোহী ফেরাউন। শেখ সাদীর (রহঃ) স্ত্রী ছিল স্বামীর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অসম্ভব রকম কলহপরায়ন, যা সাদীকে (রহঃ) সর্বদা অস্থির করে রাখতো। এ-ধরনের উদাহরণ আরো আছে; কিন্তু এ-সবই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত এক একটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যা সত্য তাহলো, পারস্পরিক প্রীতি ও সহমর্মিতার যে অভাব, সেটাই নারী-পুরুষের মিলিত গৃহী-জীবনকে তছনছ করে দেয়। আর মানুষের স্বভাব এ-রকম যে, একবার কোন ফাটল সৃষ্টি হলে, তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে, কোন অবিশ্বাসের বীজ একবার অন্তর্দেশে পতিত হলে, তা দিনে দিনে মহীরুহে পরিণত হয়। অতএব পূর্ব থেকে সতর্ক না-হলে জীবন একটি লাভাস্রাবী অগ্নিগিরি হয়ে ওঠা একরকম অবশ্যম্ভাবী। এই সমূহ বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের সহজ কোন উপায় কি নেই? দেখা যাক, এক্ষেত্রে ইসলাম কী পুর্ব প্রতিরোধ ও পূর্ব-গৃহীতব্য প্রতিষেধকের কথা বলে।

আল্লাহপাক বলেন, তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) পরস্পরের পরিচ্ছদ স্বরূপ। এই কথার অর্থ হলো, মান-সম্মান ইজ্জত-সম্ভ্রম সুখ-দুঃখ প্রীতি-প্রেম সবকিছু নিয়ে স্বামী-স্ত্রী এমন এক অখণ্ড অবিভাজ্যতার মধ্যে লীন ও অন্তরঙ্গ, যা-থেকে বেরিয়ে আসা মানে পরিচ্ছদ বর্জন করে উলঙ্গ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ পোশাক যেমন মানুষকে নিরাবরণ উলঙ্গতা থেকে রক্ষা করে, সম্ভ্রম দান করে, সভ্য ও শালীন ও সুন্দর করে তোলে, স্বামী-স্ত্রীও এইরকমই পরস্পরের জন্য সভ্য শালীন ও সম্ভ্রমপূর্ণ এক সার্বক্ষণিক ভূষণ। রাসুল (সাঃ) পুরুষদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর বিচারে উত্তম।' আর নারীদেরকে বলেন, কোন স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি একদিন অসন্তুষ্ট থাকে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেই নারীর কোন ইবাদাত আল্লাহপাকের কাছে গ্রাহ্য হয় না। এবং রাসুল (সাঃ) এই কথাও বলেন, মানুষ মানুষকে সেজদা করতে পারে, যদি এই অনুমতি দেয়া যেতো, তাহলে আমি প্রত্যেক স্ত্রীকে তার স্বামীর সেজদা করতে বলতাম। বেশি নয়, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের (সাঃ) অন্তত এই দু'টি কথাও যদি মানুষ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতো, কোন

www.pathagar.com

সন্দেহ নেই, সব সংসার এক একটি স্বর্গীয় উদ্যানে পরিণত হতো।

যাই হোক, ইসলাম কোন তত্ত্বসর্বস্ব পরামর্শনির্ভর ধর্ম নয়; তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে পূর্ণ ব্যবহারিক নমুনা পাশাপাশি যুক্ত হয়েই ইসলামের প্রকৃষ্ট হেদায়াত। আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবশ্যমান্য যে-ব্যবহারিক হেদায়াতের নির্ভুল নমুনা, রাসুল (সাঃ) এর সমগ্র জীবন সকলের জন্য সেই অব্যর্থ পথ নির্দেশনারই অত্যুত্তম আদর্শ। অতএব দাম্পত্য-সম্পর্ক যেহেতু জীবনের একটি অন্যতম প্রধান ও বৃহৎ অংশ, যেহেতু দাম্পত্য জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতার সঙ্গে পুরো জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা জড়িত, রাসুল (সাঃ)এর অনুপম দাম্পত্যজীবনের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ সেখানেই রয়েছে এমন শিক্ষনীয় এক আলোকস্নিগ্ধ জীবনের পাঠ, এমন অবশ্য-অনুসরণীয় আদর্শ, যা মানুষকে মধুর ও প্রীতি-পল্লবিত এক সুখী ও সুষমাময় দাম্পত্যজীবনের রহস্যকে অনুধাবন করতে শেখায়।

রাসুল (সাঃ) প্রথম বিবাহ করেছিলেন তাঁর চেয়ে পনর বছরের অধিক বয়স্কা আমাদের জননী খাদীজাকে (রাঃ)। এই প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গেই তিনি অতিবাহিত করেন পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত জীবনের একটি সুদীর্ঘ অধ্যায়। বয়সের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও এই অধ্যায়টি ছিল পরস্পরের প্রতি গভীর ও একাগ্র ভালোবাসায় সতত সমুজ্জ্বল। জননী খাদীজা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন, বলা চলে একেবারে বৃদ্ধাবস্থায় ৬৫ বৎসর বয়সে, কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্তও তিনি রাসুল (সাঃ)-এর যে-একনিষ্ঠ প্রেম ও ভালোবাসা নিরবচ্ছিন্নভাবে লাভ করেছেন, তা শুধু অনুপম নয়, রীতিমত বিস্ময়। আর তিনি নিজেও সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলেন আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) জন্য। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধনাঢ্য মহিলা; স্বামী এবং ইসলামের জন্য তিনি সবকিছু হাসিমুখে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। অনেকের অনেক কষ্ট ক্লেশ ও কোরবানীর মধ্য দিয়ে ইসলাম দিনে দিনে পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু যাঁর কাছে ইসলামের সর্বাধিক ঋণ, তিনি হলেন আমাদের মহীয়সী জননী হজরত খাদীজা রাদিআল্লাহু আন্হা। রাসুল (সাঃ) ও তাঁর সর্বগুণান্বিতা এই প্রথমা স্ত্রীর দীর্ঘ পঁচিশ বছরের দাম্পত্যজীবন ছিল এতটাই মধুর ও মনোরম ও পারস্পরিক ভালোবাসায় নিবিড় যে, কোন বিধর্মী গবেষকও এই দাম্পত্য জীবনের মধ্যে একটি কোন সাধারণ হৃদয়ভঙ্গ কি মান অভিমানের একটি ক্ষুদ্রতম তথ্যও খুঁজে পান নি। এ যেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দুই মানব-মানবীর যুগল-জীবনের এক সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।

হজরত খাদীজার (রাঃ) ইন্তেকালের পর হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত যে তিন বছরকাল রাসুল (সাঃ) মক্কাতে ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রথমে বিবাহ করেন হজরত সাওদা বিনতে জামাআকে (রাঃ)। আমাদের এই জননী ছিলেন অনেক বয়স্কা-বিধবা এবং রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্যের। তাঁর পূর্ব-স্বামী হজরত আল শাকরান (রাঃ) হিজরত করে

www.pathagar.com

আবিসিনিয়াতে যান এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। এই বিবাহের প্রথম কারণ হলো, খাদীজার অবর্তমানে সংসার ও সন্তান-সন্ততি দেখবার জন্য একজন পূণ্যবতী মহিলার যেমন প্রয়োজন, হজরত সাওদার (রাঃ) করুণ বিধবা জীবনে একটি সংগতি আনাও প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, হজরত সাওদার একটি তীব্র মনস্কামনা ছিল, তিনি আখেরাতে আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) সহধর্মিণী হিসাবে পরিচয় দেবার সৌভাগ্য অর্জন করতে চান। রাসুল (সাঃ) তাঁর এই আন্তরিক ইচ্ছার কথাটিও বিবেচনা করেছিলেন। এই বিবাহের অল্পকাল পর মক্কাতে থাকাবস্থায়ই আল্লাহপাকের অভিপ্রায়ক্রমে হজরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর কন্যা আমাদের মা আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) সঙ্গে রাসুল (সাঃ) এর বিবাহের আক্‌দ সুসম্পন্ন হয়। মা আয়েশার বয়স তখন সাত আটের বেশি নয়। রসুমত্ অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনি নবীগৃহে আগমন করেন হিজরত-উত্তর মদীনায় প্রায় দুইবছর অতিক্রান্ত হবার পর বদর যুদ্ধ পরবর্তী শাওয়াল মাসে। আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) তখন নবম কি দশম বর্ষীয়া বালিকা। এরপর হিজরি তৃতীয় বর্ষে রাসুল (সাঃ) আরো দু'টি বিবাহ করেন, প্রথমে উম্মুল মুমেনীন হাফসা বিনতে উমার বিন খাত্তাব এবং পরে উঃ মুঃ যায়নাব বিনতে খুজায়মা কে। দু'জনেই পূর্ববিবাহিত এবং তাঁদের পূর্বস্বামী বদর যুদ্ধে শহীদ হন। পরবর্তী বছর হিজরি চতুর্থ সনে রাসুল (সাঃ) উম্মে সালমা বিনতে আবু উমাইয়া (রাঃ)কে বিবাহ করেন, যাঁর পূর্বস্বামী আবু সালমা (রাঃ) ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। পঞ্চম হিজরির শেষ দিকে মহানবী (সাঃ) তাঁর প্রাক্তন ক্রীতদাস ও পোষ্যপুত্র যায়িদ বিন হারিসার (রাঃ) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উঃ মুঃ যয়নাব বিনতে জাহাশ্‌কে বিবাহ করেন। আল্লাহপাকের আদেশে সম্পাদিত এই বিবাহের মধ্য দিয়ে পোষ্যপুত্র-প্রথার বিলোপ সাধিত হয়। বনু মুসতালিক অভিযানের একজন যুদ্ধবন্দিনী জুয়াইরিয়া বিনতে আল হারিস, তাঁর স্বামী মুসাফা বিন সাফওয়ান যুদ্ধে নিহত হয়। এই বিধবা যুদ্ধবন্দিনীকে রাসুল (সাঃ) পত্নীরূপে গ্রহণ করেন হিজরি ষষ্ঠ বর্ষে। এই বিবাহের পর হিজরি সপ্তম সনের জ্বিলকদ মাসের মধ্যে রাসুল (সাঃ) আরো তিনজন পুণ্যবতী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন উম্মুল মুমেনীন উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান, উঃ মুঃ সাফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতাব এবং সর্বশেষ উঃ মুঃ মায়মুনা বিনতে আল হারিস। আমাদের এই জননী তিনজনও পূর্ববিবাহিত এবং বিধবা। আসলে 'আজওয়াজি মুতাহ্‌হিরা' অর্থাৎ রাসুল (সাঃ)এর পূতপবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র মা আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ছাড়া আর কেউই কুমারী ছিলেন না। রাসুল (সাঃ) আরো দু'জন যুদ্ধবন্দিনী আসমা বিনতে আন্‌নোমান এবং আম্‌রা বিনতে ইয়াজিদকে বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু রসুমত্ বা আনুষ্ঠানিকতার কোন সংগত কারণে তাঁরা রাসুল (সাঃ) এর পত্নীর মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি। আর একজন মহিলা আমাদের মা হজরত মারিয়া কিবতি (রাঃ), তাঁকে মিশরের মুকাউকিস রাসুল (সাঃ) এর খেদমতে দাসীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। আমাদের এই মায়ের গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন রাসুল (সাঃ) এর

www.pathagar.com

তৃতীয় পুত্র ইবরাহিম (রাঃ), যিনি একেবারে শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। যাই হোক, রাসুল (সাঃ) সর্বমোট ১১টি বিবাহ করেছিলেন, তন্মধ্যে হজরত খাদীজা (রাঃ) এবং হজরত যায়নাব বিনতে খুজাইমা (রাঃ) রাসুল (সাঃ) এর জীবিতাবস্থায়ই ইন্তেকাল করেন। অবশিষ্ট সবাই রাসুল (সাঃ)এর ওফাতের পরে বিভিন্ন সময়ে ইন্তেকাল করেন।

রাসুল (সাঃ) এর বিবাহ নিয়ে যে-বিষয়টি সর্বাধিক আলোচিত তাহলো, কুরআনুল কারীম যেখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে ৪টির অধিক বিবাহকে (ঠিক বিবাহ নয়, একসঙ্গে ৪ জনের অধিক স্ত্রী রাখা) নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে, সেখানে তিনি একসঙ্গে এতগুলি বিবাহ করলেন কীভাবে? অসম্ভব যে, তিনি কোরআনের নিষেধ লংঘন করেছেন; এবং এটাও ভুল যে, সবগুলো বিবাহই সম্পাদিত হয়েছে বিবাহ সীমিতকরণের প্রত্যাদেশ নাজিল হওয়ার পূর্বে (সৈয়দ আমীর আলী তাঁর 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম' গ্রন্থে এই রকমই বলেছেন, যা আদৌ সত্য নয়)। আসলে বহুবিবাহ সীমিতকরণের যে প্রত্যাদেশ নাজিল হয়, সেটা ওহুদ যুদ্ধের অব্যবহিত পরে হিজরি তৃতীয় সনে সুরা নিসায়। অতএব এ কথা বলার কোন উপায় নেই যে, রাসুল (সাঃ)এর বিবাহ যা হবার তা আগেই হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রসার ও সুরক্ষা ও প্রয়োজন, এবং কিছু মহিলার বৈধব্য ও অসহায়ত্বের কারণে আল্লাহপাক তাঁর রাসুলকে এই অতিরিক্ত পত্নীগ্রহণের স্বাধীনতা ও দায়িত্বভার মঞ্জুর করেছিলেন। সুরা আহযাব-এ বিষয়টি আল্লাহপাক পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সুরাতুল আহযাব থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু আমরা স্মরণ করতে পারি। 'হে নবী, আমি আপনার জন্য হালাল করেছি আপনার স্ত্রীগণকে.... এটা শুধুমাত্র আপনার জন্য, অন্য মুমেনদের জন্য নয়,..... যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয়' আঃ ৫০। এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে পঞ্চম হিজরির শেষ দিকে, এবং রাসুল (সাঃ)-যে আমাদের জননী মায়মুনা বিনতে আল হারিসের পর আর কোন বিবাহ করেন নি, এটা তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছার কারণে নয়, সপ্তম হিজরির শেষদিকে নাজিলকৃত সুরা আহযাব-এর অপর একটি আয়াতই হলো প্রকৃত কারণ, যেখানে বলা হয়েছে, 'এর পরে আপনার জন্য আর কোন নারী বৈধ হবে না, কিংবা তাদের কারও পরিবর্তে অন্য কোন নারী-গ্রহণও সিদ্ধ হবে না' আঃ ৫২। অতএব রাসুল (সাঃ) এর সবগুলি বিবাহই আল্লাহপাকের অনুমোদিত ও অভিপ্রায়সম্ভূত।

যারা রাসুল (সাঃ)এর বহুবিবাহকে প্রবৃত্তিতাড়িত অসংযম বলে ধারণা করেন (নাউজুবিল্লাহ), তারা নিকৃষ্ট ধরনের নিন্দুক শুধু নয়, একেবারে কান্ডজ্ঞানহীন বুরবাকও বটে। পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ, দীর্ঘ পঁচিশটি বছর অতিবাহিত হলো পনর বছরের বয়োজ্যেষ্ঠা একজন বয়স্কা মহিলার সঙ্গে, প্রবৃত্তির এতটুকু তাড়না কোনদিন লক্ষ করা গেল না; সেই মানুষটি হঠাৎ শেষ বয়সে এসে বিবাহ-পাগল হয়ে উঠলেন (আবার বলি নাউজুবিল্লাহ), এর মধ্যে কোন যুক্তি ও বাস্তবতার নামগন্ধ আছে! রাসুল (সাঃ) যে-

www.pathagar.com

বিবাহগুলি করেছেন, তার মধ্যে একজন একেবারেই অপ্রাপ্তবয়স্কা সাত-আট বছরের বালিকা এবং অবশিষ্ট সবাই পূর্ববিবাহিতা। আসলে সবগুলি বিবাহই ছিল নববিকাশমান ইসলামের জন্য বিশেষ প্রয়োজন এবং আল্লাহপাকের একান্ত ইচ্ছাধীন। এবং এইজন্যই সুরা আহযাব-এর প্রাগুক্ত দু'টি আয়াতের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেমন বিশেষ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, একটি সময়ান্তে আল্লাহপাক সে অনুমতি প্রত্যাহারও করে নিয়েছেন। অতএব এই বিবাহের মধ্যে যারা অন্য কিছু অনুসন্ধান করে, আগেই বলেছি, তারা খুবই নিকৃষ্টমানের নিন্দুক ও খুবই কান্ডজ্ঞানহীন বুরবাক। অতএব এ নিয়ে পেরেশানির কিছু নেই, কারণ কিছু কুকুরের কুৎসিত ঘেউ ঘেউ দিয়ে ঐরাবতের বিচার হয় না। রাসুল (সাঃ)এর জীবনে শুধু বিবাহ নয়, যা-কিছু ঘটেছে, সবই পূত-পবিত্র ও সুন্দর, কোথাও কোন অশ্লীলতা কি খেয়াল কি প্রবৃত্তির এতটুকু গন্ধমাত্র নেই। যা ঘটেছে, সবই আল্লাহর ইচ্ছানুক্রমে ঘটেছে, ইসলামের বিজয় ও তরক্কীর জন্য ঘটেছে।

বলাই বাহুল্য, রাসুল (সাঃ) এর জীবনের অন্য সব বিষয়ের মত দাম্পত্য জীবনও নির্ভুল ও অত্যুচ্চ আদর্শের নমুনা। মানুষতো একটি দু'টি স্ত্রী নিয়েই বেসামাল হয়ে পড়ে, ইনসাফ ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারে না, দায়িত্ব কর্তব্য ও ভালোবাসা নিয়ে যথাযথ পরিবেশও রক্ষা করতে পারে না, কিছুই পারে না। বাইরে থেকে হয়ত পরিষ্কার বুঝা যায় না, কিন্তু কম করে হলেও, শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এটা সত্য। এবং এই ব্যর্থতার কারণে আমেরিকা ইয়োরোপে তো দাম্পত্যজীবন পুরোপুরি ভেঙ্গেই পড়েছে; আর আমাদের এখানে ভাঙ্গে-নি বটে, তবে ভেতরে ভেতরে গোপন আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভাস্রোত-যে সকল গৃহে ও সংসারে নিরন্তর বয়ে চলেছে, এ-নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। দু'একজন যারা দাম্পত্যজীবনে সুখী ও সফল, তারা ভাগ্যবান, তারা আল্লাহর বিশেষ রহমত প্রাপ্ত, এবং জেনে না-জেনে তারা ইসলাম-পেশকৃত দাম্পত্য বিজ্ঞানের অনুগত ও অনুসারী। অথচ আমাদের রাসুল (সাঃ) বয়স্কা মধ্যবয়স্কা অপ্রাপ্তবয়স্কা ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাস ও রুচি ও ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির এগারোজন পত্নীকে প্রায় একসঙ্গে একটি সুরভিত পুষ্পমালিকার মত গেঁথে রেখেছেন। আমাদের পুণ্যশীলা জননীদের মধ্যে কলহ ছিল না, ঈর্ষা ছিল না, অনুযোগ অভিমান কিছুই ছিল না। আমাদের জননীরা সবাই রাসুল (সাঃ)এর স্বেচ্ছাদারিদ্র্য ও কৃচ্ছতাকেই জীবনের পরম ঐশ্বর্যজ্ঞানে সকলের সম্মিলিত সংসারকে এক অনুপম জান্নাতে পরিণত করে রেখেছিলেন।

দাম্পত্য জীবনে রাসুল (সাঃ) দু'বার মাত্র একটু সামান্য ঝড়ো হাওয়ার সম্মুখীন হয়েছিলেন। একটি মধুপানের ঘটনা এবং অপরটি আমাদের মা আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) নির্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর কিছু মুনাফিকের সৃষ্ট কলঙ্ক রটনা। প্রথমটি ছিল আমাদের দু'একজন জননীর নিতান্তই লঘু পরিহাস, যা রাসুল (সাঃ) একটু গুরুত্বের

www.pathagar.com

সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। আর দ্বিতীয়টি যে উফুকের ঘটনা, সেটা ছিল সর্বৈব মিথ্যা। তবু এই ঘটনায় রাসুল (সাঃ), মা আয়েশা (রাঃ) এবং হজরত আবু বকরের (রাঃ) পরিবার বেশ কয়েকদিন নিদারুণ অস্বস্তি ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন। তারপর কিছুদিনের মধ্যে অহি নাজিল হওয়ায় পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এ নিয়ে আমাদের মা মাঝে মাঝে অহমিকাশূন্য এক ধরনের গৌরব করে বলতেন, 'আমার নিষ্কলুষ চরিত্রের শুভ্রতা স্বয়ং আল্লাহপাক কর্তৃক সত্যায়িত।' এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আরো দু'একটি বিষয়ও বেশ স্পষ্ট হয়ে যায়। রাসুল (সাঃ) যখন হজরত উমারের (রাঃ) কাছে মতামত জানতে চাইলেন, তিনি বললেন, 'মা আয়েশার সঙ্গে আপনার বিবাহ কি আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে হয়নি'? আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বললেন, 'অবশ্যই।' ফারুকে আযম তখন বললেন, 'আল্লাহপাক কি আপনার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারেন'! অথচ তাঁর আপন কন্যা হাফসাও (রাঃ) একজন নবীপত্নী; রাসুলের (সাঃ) কাছে নিজ কন্যার মুল্যবৃদ্ধিকল্পে তিনি নীরব থাকতে পারতেন, কিছুটা দ্বিধা প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু অসম্ভব! আল্লাহর নবীর সাহাবীরা ছিলেন সকল স্বার্থ ও সংকীর্ণতার উর্ধে সত্য ও সততার আলোয় সদা-দীপ্যমান এক একটি স্থির অচঞ্চল ধ্রুবনক্ষত্র। রাসুল (সাঃ) বিপর্যস্ত মন নিয়ে তাঁর কোন কোন সহধর্মিণীর কাছেও মতামত জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেউই সপত্নীর স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ে এই অপবাদকে অনুমাত্র সমর্থন করেন নি; কেউ গা-বাঁচাবার মত করে বলেন নি, 'কী জানি, আল্লাহই ভালো জানেন'। বরং সবাই সর্বাধিক দৃঢ়তা নিয়ে সপত্নী আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) বিরুদ্ধে উত্থিত অপবাদকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ থেকে একটি যে-কথা অব্যর্থভাবে প্রমাণিত হয় তাহলো, আমাদের কোন জননীর মধ্যেই সপত্নীসুলভ এতটুকু অসূয়া ও এতটুকু বিক্ষেপ ছিল না। তাঁরা সবাই ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্বামীর শিক্ষা ও সাহচর্যধন্য পরস্পরের প্রতি সখ্য ও সৌহার্দ্য ও নিবিড় ভালোবাসায় সীমাহীনরূপে অন্তরঙ্গ। যাই হোক, এই দু'টি ঘটনা ছাড়া আর কখনো কোনদিন মুহূর্তের জন্যও রাসুল (সাঃ) এর পারিবারিক জীবনে কোনরূপ কোন অশান্তির ছায়াপাত ঘটে-নি। শত অভাব অনটনের মধ্যেও সে-জীবন ছিল নিরঙ্কুশভাবে শান্ত ও স্থির ও সুখময়।

অনেকে বলবেন, রাসুল (সাঃ) এর কথা স্বতন্ত্র; তাঁর সঙ্গে কি অন্য কারো তুলনা হয়! কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এই কথাও তো সত্য যে, তিনি ইন্দ্রজাল বিছিয়ে সকল পত্নীকে সমানভাবে সম্মোহিত করে রাখেন নি। আসল কথা, যা তিনি তাঁর উম্মতের জন্য আপন ব্যবহারিক জীবনের নমুনাসহ শাশ্বত আদর্শরূপে রেখে গেছেন তাহলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসা ও সপ্রীতি মনোযোগ যদি ষোল-আনা অক্ষত থাকে, অভাব অনটন সমস্যা-সংকট যাই থাক, দাম্পত্যজীবনে কোন ফাটল সৃষ্টি হবার কোন কারণ নেই। রাসুল (সাঃ) তাঁর ১১ জন স্ত্রীর মধ্যে কখনোই কোন পার্থক্য করেন নি; মেধা ও সৌন্দর্যে নিশ্চয়ই ব্যবধান ছিল, কিন্তু সেই ব্যবধানকে

www.pathagar.com

গুরুত্ব দিয়ে ইনসাফের এতটুকু ব্যত্যয় ঘটতে দেন নি। কারো প্রতি মুহূর্তের জন্যও কোনরূপ অবহেলা কি অমনোযোগের এতটুকু চিহ্নমাত্র ছিল না; তাঁর প্রেম ও মনোযোগ ছিল সকলের প্রতি সমানভাবে নিবদ্ধ। এমনকি রাসুল (সাঃ) যখন মৃত্যুশয্যায়, তখনো তিনি সকল স্ত্রীর সানন্দ-সম্মতিক্রমেই আমাদের মা-আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) ঘরে শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেন। কারো মনে, খুব ক্ষীণভাবে হলেও, সামান্য কষ্ট কি অভিমান যাতে তৈরী না-হয়, সে বিষয়ে মৃত্যুশয্যায়ও সতর্ক ছিলেন। জাগতিক বিবেচনায় তাঁর সুখী ও স্বপ্নময় দাম্পত্যজীবনের এটাই মূল রহস্য। অবশ্য আল্লাহপাকের সীমাহীন রহমতের কথাই সর্বাপেক্ষা বড়; কারণ যারা এই রহমত থেকে মাহরুম, শত-সতর্কতা সত্ত্বেও পারিবারিক অশান্তি ও অসংগতি তাদের নিত্যসহচর। অতএব বলতে হয়, আল্লাহপাকের অভিপ্রায় ও অশেষ অনুগ্রহের কারণেই, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী তাঁর কতিপয় পবিত্র-পতিব্রতা পত্নীকে নিয়ে রচনা করেছিলেন সমগ্র মানববংশের জন্য আদর্শস্বরূপ দাম্পত্যজীবনের এক শাশ্বত উদাহরণ। বলাই বাহুল্য, এই সফল স্বামী-পুরুষটি আমাদের প্রিয়তম রাসুল রাহমাতুল্লিল আলামীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ); এবং মহিলারা হলেন, সর্বকালের সর্বোচ্চ পবিত্রতার অধিকারিণী আমাদের জননী 'আজওয়াজি মুতাহ্হিরা।'

www.pathagar.com

মোহাম্মদ (সাঃ) ঃ পূর্ণ প্রস্ফুটিত মানব-প্রসূন

মোহাম্মদ (সাঃ)কে-যে মক্কাবাসীরা প্রথমে নবী হিসাবে মেনে নিতে পারে নি, তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে, মোহাম্মদ (সাঃ)এর মানুষি-অবয়ব ও নবুয়ত, একাধারে এই দু'টি বিষয় তাদের কাছে মনে হয়েছিল পরস্পরবিরোধী। তারা ধারণা করতো, আল্লাহ যদি সর্বমানবের কল্যাণার্থে সত্যের বার্তাবহ কোন নবীই পাঠাবেন, সেই নবী হবেন কোন ফেরেশতা। আর যদি আল্লাহ কোন মানুষকেই নবী হিসাবে মনোনীত করেন, তাহলে সেই মানুষটির হওয়া উচিত এমন, যিনি ধনাঢ্যতা কি রাজক্ষমতা কি অন্য কোন অভিনবত্বের গুণে সর্বসাধারণের কাছে স্বাভাবিকভাবেই সম্ভ্রম দাবী করতে পারেন। কিন্তু জীবনের শুরু থেকেই যিনি পিতৃমাতৃহীন এতীম ও অসহায়, দারিদ্র্য যাঁর নিত্যসঙ্গী, মোহাম্মদ (সাঃ)এর মত অতি সাধারণ এমন একটি মানুষ, কী করে নবী হবেন! এটা যুগপৎ অসংগত ও অসম্ভব। সত্য যে, বহু সদ্‌গুণের আধার এই মানুষটি, কিন্তু তাই বলে নবুয়তের মত অসাধারণ মুকুট কি তাঁর শিরে শোভা পায়! অতএব অধিকাংশ মক্কাবাসী এইহেতুও মোহাম্মদ (সাঃ)কে মেনে নিতে পারেনি যে, তিনি ছিলেন সাধারণ অতি-সাধারণ এমন এক মানব-সন্তান, যাঁর জাগতিক অবস্থান নবুয়তের মত অতি বিশিষ্ট উচ্চাসনের পক্ষে একেবারেই 'বেমানান' ও 'সংগতিহীন'। বলাই বাহুল্য, বৈরী মক্কাবাসীদের যুক্তির মধ্যে ছিল একটি বড় ভুল। ভুল, কারণ প্রথমত, মানুষের হেদায়াত ও সঠিক পথপ্রদর্শনের নিমিত্ত ফেরেশতাকেও আল্লাহ নিয়োগদান করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ জানেন তা যুক্তিযুক্ত নয়। অনুসরণযোগ্য আদর্শের বাস্তবরূপ যদি কোন নির্বাচিত মানুষ না-হয়ে ফেরেশতা হয়, তাহলে মানবস্বভাবের সমস্যা ও সম্ভাবনার প্রশ্নে ওই আদর্শকে মনে হবে কৃত্রিম ও আরোপিত। মানুষ তাকে পূজা করবে কিন্তু ভালোবাসতে পারবে না; মানুষ যেখানে ছিল সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, সত্য ও সৌন্দর্যময় গন্তব্যের দিকে সে বিশেষ অগ্রসর হবে না। এবং এই অনীহা ও অক্ষমতার জন্য তাকে অভিযুক্ত করাও কঠিন হবে, কারণ আত্মপক্ষ সমর্থনে সে সহজেই বলতে পারবে, ফেরেশতা-প্রদর্শিত পথে ফেরেশতারাই চলতে সক্ষম, সে-পথ মানুষের পক্ষে যথার্থই বড় অগম্য। পাখির পক্ষে ডানায় ভর করে আকাশে ভেসে থাকার শিক্ষা কোন হেলিকপ্টারের নিকট থেকে গ্রহণ করা কি প্রকৃতিসম্মত? অতএব আল্লাহপাক মানুষের মধ্য দিয়েই মানুষের জন্য পরম অনুগ্রহে অবারিত করে দিলেন এক বিকল্পহীন আলোকোজ্জ্বল শ্রেষ্ঠতম রাজপথ। এবং এইজন্য মহানবী (সাঃ)ও পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেন, তিনিও অন্যদের মতই রক্তমাংসে গঠিত সাধারণ একজন মানুষ, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, তাঁর কাছে অহী অবতীর্ণ হয়। এবং স্মরণ করিয়ে দেন এই হেতু যে, তাঁর প্রদর্শিত পথ যেন কেউ অতিশয় দুর্গম ও

www.pathagar.com

অননুকরণীয় বলে জ্ঞান না করে, এবং তাঁকে অতিমানবিক দেবতার আসনে বসিয়ে বৃহত্তর কোন ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত না হয়। দ্বিতীয়ত, এই নির্বাচিত মানুষটি যে ধনৈশ্বর্যহীন ও জাগতিক বিচারে নিতান্তই অতিসাধারণ এ-নিয়েও বিচলিত হবার কিছু নেই। যদিও খ্যাতি কি ঐশ্বর্য ক্ষমতা কি পার্থিব সাফল্য, এসব সাধারণ মানুষের কাছে খুবই প্রিয়, খুবই নন্দিত, কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ-সবের মূল্য খুবই অকিঞ্চিৎকর; কোন মহত্তর দায়িত্ব অর্পণের প্রশ্নে এটা বিচার্যও নয়, বিবেচনারও নয়। আল্লাহ যাঁকে নির্বাচন করেছেন সেই মোহাম্মদ (সাঃ) এতীম বটে, সম্পদরিক্ত বটে কিন্তু সততা ও সত্যবাদিতা, নিষ্কলুষ চারিত্রিক মহত্ব ও মাধুর্য ও মানবপ্রেমে তাঁর সমকক্ষ কোন মানুষ পৃথিবীতে কখনো ছিল না, কখনো হবেও না। অতএব অতিশয় মূঢ় কাফের ও মুশরিকরা সীমাহীন ভ্রান্তি কি ঔদ্ধত্যবশত যাই বলুক, আল্লাহর বিচার ও মনোনয়ন সর্বদাই প্রশ্নাতীত ও অভ্রান্ত।

কিন্তু বিশ্বাসীরাও তো একটি বিষয়ে মাঝে মাঝেই গলদঘর্ম হয়ে ওঠেন। তাঁরা অবশ্যই সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন মোহাম্মদ (সাঃ) যুগপৎ মানুষ এবং নবী, কিন্তু বহু ঘটনাকে তাঁরা ঠিক প্রকৃত তাৎপর্যে উপলব্ধি করতে পারেন না। প্রগাঢ় বিশ্বাসের কারণে তাঁরা বাহ্যত নির্বিকার নীরবতা অবলম্বন করেন সত্য, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে কিছুটা সুপ্ত কিছুটা জাগ্রত জটিল এক জিজ্ঞাসা তাঁদেরকে প্রায়শ অস্থির করে তোলে। কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহর যা-কিছু সৃষ্টি তার মধ্যে মোহাম্মদ (সাঃ)ই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি বিশ্বসৃষ্টির কাছে এক পরম রহমতস্বরূপ অবতীর্ণ। কিন্তু আল্লাহর প্রত্যক্ষ হাবীব ও অপার অনুগ্রহধন্য এই মানুষটির চলার পথ কেন সীমাহীনরূপে কন্টকাকীর্ণ? আল্লাহপাক যাঁকে অসীম অনুগ্রহে ও পরমাদরে বোরাকে চড়িয়ে মহাশূন্যে পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করেন, এবং বাধিত করেন আপন সাক্ষাৎদানে, সেই একই মানুষকে ভয়ে ভয়ে কেন দেশত্যাগ করতে হয়, কেন ভয়ে ভয়ে আত্মগোপন করতে হয় শ্বাপদসংকুল গুহার অভ্যন্তরে? যে মানুষটির কাছে চব্বিশ হাজারেরও অধিকবার জিব্রাইল ফেরেশতার আগমন ঘটে, যাঁর কোন প্রার্থনাই আল্লাহপাক না-মঞ্জুর করেন না, তিনি কেন রক্তাক্ত দেহে ফিরে আসেন তায়েফ থেকে? তাঁর সঙ্গীসাথীরা কেন তাঁর চোখের সামনেই শাহাদাত বরণ করেন এবং তিনি নিজেও অক্ষত থাকতে পারেন না, কেন শত্রুর মারণাঘাতে তাঁরও দেহ মোবারক ক্ষতবিক্ষত হয়? এমনকি নামাজরত অবস্থায়ও তাঁর উপরে চাপিয়ে দেয়া হয় বকরির নাড়িভুড়ি, রক্ষা করার কেউ থাকে না, নিতান্তই ছেলেমানুষ মা-ফাতিমাকে সেই নোংরা আবর্জনা থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে হয়। যাঁর অংগুলি সংকেতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, সেই তাঁকেই কেন দিনের পর দিন সহ্য করতে হয় কাফেরদের অমানুষিক অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ও নৃশংসতম নিগ্রহ? সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা কেন যথোচিত ব্যবস্থাগ্রহণ স্থগিত রেখে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেন তাঁর প্রিয়তম বন্ধুর এই লাঞ্ছনা ও অপমান ও দুর্দশা! কোন সন্দেহ নেই, দুটোই সত্য— তিনি আল্লাহপাকের সর্বাধিক প্রেমাস্পদ নবী

www.pathagar.com

এবং তিনিই সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্ত এক মানব। এ-যেন দুই পরস্পরবিরোধী ভূমিকার সমন্বয়, যেন দুই বিপরীত মেরুর একত্র সহাবস্থান। কিন্তু ব্যাখ্যাটি কী? এই ব্যাখ্যাই বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাহ্যত মনে হয় অতি জটিল ও দুরূহ ও অতল রহস্যময় এই অঙ্ক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুবই সহজ। আসলে মহানবী (সাঃ) স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন এই চ্যালেঞ্জ। তিনি আল্লাহপ্রদত্ত কঠিন দায়িত্ব লাভ করেছিলেন কিন্তু সেই গুরুভার বহনে কোন অলৌকিক কি অতিমানবিক সাহায্যের আশা তিনি করেন নি; সকল মানবিক সংকট ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তিনি তাঁর কার্যক্রমকে রূপদান করতে চেয়েছেন। আল্লাহপাকের নিজস্ব অভিপ্রায়ও ছিল এইরকমই; তিনি এই দায়িত্বই অর্পণ করেছিলেন যে, মোহাম্মদ (সাঃ) মানুষ হয়েই সকল মানবিক দুর্লংঘ্য বাধাকে জয় করে নেবেন। এইজন্যই, এবং এইজন্যই সমগ্র বিশ্বজাগতিক প্রেক্ষাপটে নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এমন এক প্রকৃষ্টতম নমুনা, সত্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যিনি সর্ববিধ বৈরিতার মোকাবিলা করেছেন সম্পূর্ণরূপে মানবিক শক্তি ও সহিষ্ণুতা প্রেম ও প্রজ্ঞা ও ধৈর্য নিয়ে। তায়েফ থেকে রক্তাপ্লুত হয়ে ফিরে আসেন, মক্কাবাসীদের নির্মমতম নিগ্রহের শিকারে পরিণত হন কিন্তু তিনি কখনো অভিসম্পাত করেন না। শত্রুনিধন তাঁর কাম্য নয়, প্রাণঘাতী বৈরিতার সম্মুখীন হয়েও তিনি তাঁর প্রভুর কাছে শুধু এই প্রার্থনা করেন যে, অবোধ মানুষের অন্তর যেন আলোকিত হয়ে ওঠে, তারা যেন তাঁকে বুঝতে পারে। এ-যেন অবুঝ অবাধ্য শিশুর মোকাবিলায় স্নেহময়ী জননীর ভূমিকা! দারিদ্র্য ও দুঃখ ও বৈরিতা তাঁর নিত্যসহচর, কিন্তু তাঁর কার্যক্রম ও গতিপথ এমন এক নিয়মের অধীন যে, ত্বরিৎ সাফল্যলাভের জন্য প্রভুর কাছে তিনি কোন অতিমানবিক ও অলৌকিক আনুকূল্য দাবী করেন নি। তিনি চাইলে, আল্লাহপাকের অশেষ রহমতে শত্রুরা তাঁকে 'ওয়াক ওভার' দিয়ে একযোগে আত্মসমর্পণ করতো। কিন্তু না, তিনি তা চান নি; কারণ এমন হলে তাঁর মানবিক ভূমিকায় টান পড়তো, খর্ব হতো তাঁর মানবিক মহিমা। এইজন্যই কোন ফেরেশতার ডানায় ভর করে তিনি হিজরত করেন নি, করেছেন সাধারণ মানুষের মত শঙ্কা ও উদ্বেগ নিয়ে চুপি চুপি গভীর নিশীথে বিপদসংকুল পথে। তিনি বার বার যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু করেছেন জীবন ও সর্বস্ব হারানোর ঝুঁকি নিয়ে। সত্য যে, তিনি বিজয়ীর বেশে ফিরে এসেছেন, কিন্তু অনায়াসে নয়, তাঁর সঙ্গী সাথীরা শহীদ হয়েছেন, নিজেরও দেহ মোবারক হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। তিনি কখনো এমন আশা করেন নি, প্রভুর সমীপে এমন প্রার্থনাও করেন নি যে, শত্রুরা কোন অলৌকিক কারণে পঙ্গু কি হীনবল হয়ে ফিরে যাক এবং তিনি অক্লেশে বিনাযুদ্ধে পৌঁছে যান গন্তব্যে। আসলে আল্লাহপাক তাঁকে এক কঠিন ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিলেন। অনেকটা এইরকম যে, তাঁকে আরোহণ করতে হবে সর্বাধিক দুর্গম ও দুরধিগম্য পর্বতের এক উচ্চতম শৃঙ্গে, কিন্তু সম্পূর্ণ পায়ে হেঁটে, আপন শক্তিতে। পৃথিবীর মানুষ দেখলো, আল্লাহপাক নিজেও দেখলেন, তাঁর প্রিয়তম

www.pathagar.com

হাবীব ধীরে ধীরে কেমন উঠে এলেন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে; সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা ও প্রতিপদে সকল অরিতাকে প্রসন্নমনে অতিক্রম করে সমাপ্ত হলো তাঁর অভিযাত্রা। ফেরেশতারাও এই দৃশ্য অবাক চোখে অবলোকন করলেন, এবং মনে পড়লো বহুকাল আগে তাঁরা যে একটি মাটির মানুষকে শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে একদা প্রণতি জানিয়েছিলেন, সেই প্রণতি কত যথার্থ।

আল্লাহপাক বলেছিলেন, 'আমি যা জানি তোমরা তা জানো না'। শুধু ফেরেশতা নয়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করলো, কী অনুপম ও অকাট্য এই সত্য। আল্লাহর নিহিত অভিপ্রায়ের কী নিখুঁত বাস্তবরূপ! নশ্বর এই জাগতিক প্রেক্ষাপটে বিশুদ্ধ মানবিক গুণাবলীকে সম্বল করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন এক অনন্তকালের মহানায়ক। সত্যই এমন কোন মানবিক গুণ নেই, যা তাঁর চরিত্রে পূর্ণতম বিভায় প্রস্ফুটিত হয় নি, এমন কোন পাপ কি ত্রুটি কি অসংগত পিপাসা নেই, যা তিনি পূর্ণরূপে পরাভূত করেন নি, পরিণত হয়নি বশংবদ ভৃত্যে; এবং মানুষ মুগ্ধ বিস্ময়ে এও প্রত্যক্ষ করলো যে, এমন কোন দুঃখ নেই, যার তীব্রতম আঘাতে তিনি দগ্ধ ও দংশিত হন নি। বলাই বাহুল্য, এমন নাহলে, এমন দুর্বিসহ কন্টকাকীর্ণ পথের অভিযাত্রী নাহলে, মানব অধ্যুষিত এই বিশ্বে আল্লাহপাকের এই সর্বমানবিক কল্যাণবহ ও সতর্কতাজ্ঞাপক নির্দেশবাণীর তাৎপর্য ও তীব্রতা কি হ্রাস পেতো না— 'ওয়ামা আতাকুমুররাছুলু ফাখুজুহু, ওয়ামা নাহাকুম আনহু ফানতাহু' 'রাসুল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ করো, যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো'। অতএব তিনি সত্য ও সৌন্দর্য, আদর্শ ও আলোর দিশারী বটে, নবী ও রাসুল বটে, কিন্তু একই সঙ্গে আঘাত ও দুঃখ, গ্লানি ও অন্ধকারের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি এক পূর্ণ প্রস্ফুটিত মানবও বটে। সত্যই, তাঁকে সৃষ্টি না করলে এই আকাশ, এই সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রপুঞ্জ, এই সাগরবিধৌত নদীকলস্বনা পৃথিবী, ফুল পাখি প্রাণী ও পতঙ্গ কিছুই সৃষ্টি করতেন না আল্লাহ-তায়ালা। সব তাঁরই জন্য, তিনি অবতরণ করবেন বলেই এমন প্রস্তুতি, এমন সুসজ্জিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। মালী-যে পরম যত্নে টব কি মাটি কি সার কি নিয়মিত জলসিঞ্চনে গাছের পরিচর্যা করেন, সে-তো আসলে একটি প্রস্ফুটিত গোলাপের জন্যই। সৃষ্টিকর্তাও জানতেন, এমন এক সহস্রদল গোলাপ ফুটে উঠবে, যা অবলোকন করে সমগ্র বিশ্ব হবে চমকিত ও আলোকস্নাত ও সৌরভে আমোদিত। এই নশ্বর পৃথিবীতে গোলাপটির পার্থিব আয়ুষ্কাল হবে স্বাভাবিক কিন্তু তার সৌরভ ও মাধুরিমা বিদ্যমান থাকবে অনন্তকাল। বহু উপদ্রবের মধ্যেও, বিপুল বাধা ও অরিতাসত্ত্বেও ফুটে-ওঠা এই নিখুঁত ও বিস্ময়কর মানব-গোলাপটির নামই হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)।

www.pathagar.com

নবী-জীবনের প্রকৃষ্ট পরিচয় হলো আল-হাদীস

পৃথিবীতে মানবসভ্যতার সেই আদিকাল থেকে অদ্যাবধি কত ভাষায় কত-যে বই লেখা হয়েছে, কোনো সুপার-এ্যাটমিক কম্পিউটারের সাহায্য নিয়েও তার কোনো হিসাব মেলানো যাবে না। কিন্তু বেদ বাইবেল যা-ই বলি, এ-নিয়ে কোনো তর্ক নেই যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ হলো, সর্বপ্রকার প্রমাদ ও বিকৃতি থেকে মুক্ত মহাপবিত্র আল কোরআন।

যেহেতু আল কোরআন হলো আল্লাহপাকের নিজস্ব রচনা, এই মহাপবিত্র গ্রন্থের একটি বাক্য কি শব্দ কি বর্ণের সঙ্গেও কোনো মানুষের কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতা নেই। লওহে-মাহফুজে সংরক্ষিত এই গ্রন্থ আল্লাহপাকের নির্দেশানুসারে হজরত জিবরাইল (আঃ) একটু-একটু করে রাসুল (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে এসেছেন। অতএব এই গ্রন্থের চিরঞ্জীব শ্রেষ্ঠত্ব, বিশুদ্ধতা ও অলৌকিকত্ব নিয়ে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

কিন্তু শাশ্বত শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে দ্বিতীয় আসনটি কোন গ্রন্থের প্রাপ্য? অথবা বলতে পারি মানবরচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোন গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ?

অবশ্যই আল্লাহ্'র রাসূলের (সঃ) কথা ও কর্মের যে-লেখ্য সংকলন, সেই পবিত্র সহীহ হাদীসের গ্রন্থ।

এটা শুধু কোটি-কোটি মুসলমানের বিশ্বাস ও সম্ভ্রম ও অনুরাগের কথা নয়; মানুষের সর্বব্যাপী-জীবনের প্রয়োজন, ব্যবহারিক-বাস্তবতা ও কার্যকারিতা প্রশ্নেও এই শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত।

পৃথিবীতে যারা খোলা-মনের মানুষ, যারা সত্যকে সত্য বলতে অকুণ্ঠচিত্ত, তারা স্বীকার করেন, মহানবী (সাঃ)-এর জীবননিঃসৃত সৌরভের যে-বাণীসংকলন, মানববংশের জন্য সেটাই চূড়ান্ত বরাভয়। যে-ধর্ম ও সম্প্রদায়েরই হোক, যে-কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নির্দ্বিধায় মেনে নিতে বাধ্য যে, হাদীস শরীফের মতো মানবরচিত এমন আর দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ নেই, যার প্রভাব ও কার্যকারিতা কোটি কোটি মানুষের উপর শত শত বছর ধরে একইভাবে অক্ষুন্ন ও ক্রিয়াশীল।

সত্যই রাসুল (সাঃ)-এর হাদীসের কোনো তুলনা হয় না। বরং বলতে হয়, এতই অতুলনীয় এতই অত্যুচ্চ তার মর্যাদা যে, অন্য কোনো গ্রন্থের সঙ্গে তুলনার কথা মনে মনে চিন্তা করাও রীতিমত মূর্খতা; এবং বোখারি কি তিরমিযী কি অন্য যে- কোনো সহীহ্ হাদীস শরীফের পবিত্র শান-এর খেলাফও বটে।

পৃথিবীর কোনো মানুষ কি ভাবতে পারে, একটি গ্রন্থ সংকলনের কাজে হাজার হাজার মেধাবী মানুষ তাঁদের সমগ্র জীবনের সবটুকু প্রেম ও সময়, সবটুকু মেধা ও শক্তি

www.pathagar.com

নিঃশেষে কোরবানী করে দিয়েছেন। কেউ কি ভাবতে পারে, একটি গ্রন্থের যাচাই-বাচাই ও শুদ্ধাশুদ্ধির প্রশ্নে কোনোভাবে যুক্ত, অর্থাৎ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট এমন পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের আদ্যোপান্ত জীবনচরিত নিয়ে গড়ে উঠেছে এক বিশাল জ্ঞান ও গবেষণার ভাণ্ডার 'আসমাউর রিজাল'।

একটিমাত্র গ্রন্থের জন্য শ্রম ও সহিষ্ণুতার এত কোরবানী, প্রেমের এমন পরাকাষ্ঠা সত্যই অকল্পনীয় অভাবনীয়, পৃথিবীতে যার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

অনেকে জানেন, সহীহ বোখারি শরীফের সংকলক হজরত ইমাম বোখারি (রহঃ) প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। নানাভাবে নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ হাদীস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। সারা জীবনের সাধনা ও পরিশ্রমলব্ধ ছয় লক্ষাধিক হাদীসের এক সুবিশাল সম্ভার নিয়ে তিনি সহীহ সংকলনের কাজটি শুরু ও শেষ করলেন পবিত্র মসজিদে নববীতে বসে। তিনি একটি করে হাদীস লেখার শুরুতেই দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করেন; এইভাবেই দীর্ঘ ১৬ বছরের একাগ্র অব্যাহত পরিশ্রমে সংকলিত হলো হাদীস বোখারি শরীফ। বিশুদ্ধতা রক্ষায় এত পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা ও সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন যে, পুনরুক্তি বাদ দিলে সহীহ-বোখারি-তে হাদীস সংখ্যা মাত্র ২৫১৩।

বিষয়টি উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, শুধু মেধা ও শ্রম, আন্তরিকতা ও স্মৃতিশক্তি নয়; সহীহ হাদীস সংকলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সর্বাধিক আল্লাহ'র ভয় ও সর্বোচ্চ সতর্কতা। পৃথিবীর কোনো গ্রন্থ বা গ্রন্থকার কি এই দাবি করতে পারে?

দাবি তো দূরের কথা ভাবতেও পারে না। আমরা বরং উল্টোটাই দেখতে পাই। যে সকল গ্রন্থ নিয়ে পৃথিবী খুব গর্ব অনুভব, তা অধিকাংশই প্রণীত বা সংকলিত হয়েছে খেয়ালে-বেখেয়ালে পান-সিগারেট খেতে খেতে বা মদ্যপান করতে করতে।

হাদীস শরীফের অপর একটি বড় মোযেজা হলো, পৃথিবীতে সব দেশে সব সময়ই যেমন আল-কোরআনের লক্ষ লক্ষ হাফেজ রয়েছে, একইভাবে সারা বিশ্বে আল হাদীসেরও অসংখ্য হাফেজ বর্তমান। অথচ এই কাজটি অবর্ণনীয় কঠিন। কারণ, রাবীদের পরম্পরা ঠিক রেখে হাজার হাজার সহীহ্ হাদীস মুখস্থ রাখা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

আল্লাহপাকের বিশেষ অভিপ্রায় ও অনুগ্রহই বটে! পৃথিবীতে কত-যে নামী-নামী লেখক ও তাদের বই বর্তমান, তার কোনো ইয়ত্তা নেই; কিন্তু একটি কোনো ক্ষুদ্র পুস্তকেরও কি এই সৌভাগ্য হয়েছে যে, তাকে কিছু মানুষ চিরকালই কণ্ঠস্থ করে রাখে!

যাই হোক, অনেক কথা বলা যায়। বলা যায়, বিশ্ব-ইতিহাসে এমন কোনো মানুষের সন্ধান কি আমরা জানি, যাঁর যে-কোনো কথাই অবশ্যমান্য আইন ? না,

www.pathagar.com

একমাত্র হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ছাড়া এমন আর কোনো দ্বিতীয় মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। খানাপিনা, পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সমাজ-পরিবার-রাষ্ট্রপরিচালনা ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক পর্যন্ত সর্বত্রই ও সর্বক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই কথা চূড়ান্ত আইনের মর্যাদা লাভ করেছে। এবং একজন-দু'জন নয় আর এক-দুই বছরের জন্যও নয়, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজা-বাদশাহ্ পর্যন্ত কোটি কোটি মুসলমান বিনা প্রশ্নে মান্য করে চলেছে; যে-আনুগত্য রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকবে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এর চেয়ে বড় অলৌকিকত্ব আর কী হতে পারে।

আর শুধু আইন বললে যথার্থ বলা হয় না; রাসুল (সাঃ)এর যে-কোনো আদেশ, নিষেধ ও নীরবতা আইনের থেকেও অনেক বড়। কারণ, মানবরচিত যে-আইন, শত প্রহরার মধ্যেও তাকে ফাঁকি দেয়া যায়, নিরাপদ বুঝলে প্রসন্নমনে লংঘনও করা যায়। অথচ সুবিধা-অসুবিধা যাই হোক, কোনো দিক থেকে কোনো বাধা আসুক না-আসুক, রাসুল (সাঃ)এর কোনো একটি সাধারণ কথাও অমান্য করতে মুসলমানের বুক কেঁপে ওঠে। ইবলিসের বহুবর্ণ প্ররোচনায় অমান্য অনেক করছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একে কঠিন অপরাধবোধে নিরন্তর দগ্ধও হচ্ছে। ভেতরে ভেতর জ্বলে উঠছে অনুতাপ ও অনুশোচনার আগুন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনে মদ্যপান করে গাড়ি চালানো বেআইনী। কিন্তু অসংখ্য মদ্যপ এই আইন অবজ্ঞা করে গাড়ি চালাচ্ছে। দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার না-হওয়া পর্যন্ত এ-নিয়ে তার মধ্যে সামান্য পরিমাণ অপরাধবোধেরও উদ্রেক ঘটে না। অথচ সেই কবে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, জুতা পরিধান করতে হয় প্রথমে ডান পায়ে, খুলতে হয় বাম পায়ে, এই কথাটিও কোনো মুমেন অবহেলা করতে পারে না। ভুলক্রমে যদি এদিক-ওদিক হয়ে যায়, মনে বড় ধরনের কষ্ট জেগে ওঠে। অবশ্য এমন মুসলমান দুর্লভ নয়, যারা বেপরোয়াভাবে তাঁর কথার অবাধ্যতা করছে; এমনকি কাফের-মুশরেকদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে রাসুল (সাঃ)এর হুকুম সংশোধন করারও ধৃষ্ট ইচ্ছা ব্যক্ত করছে। তাদের কথা আদৌ ধর্তব্য নয়; তারা নামত মুসলমান বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক।

যাক, রাসুল (সাঃ)এর কথার সুমহান মর্যাদা ও শাশ্বত-অপরিহার্যতা নিয়ে বহু কথা বলার আছে, কিন্তু সেই বিষয়টি বর্তমান আলোচনার উপজীব্য নয়। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো, আমাদের অক্ষম দৃষ্টিতে যতটুকু সম্ভব রাসুল (সাঃ)কে চেয়ে দেখা। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি ঝাপসা, আমাদের ভাষা আড়ষ্ট, আমাদের চিন্তাপ্রক্রিয়া অসংলগ্ন; অতএব আমরা যত কথাই বলি, আমাদের সে-সকল কথার প্রকৃত মূল্য খুব-একটা বেশি নয়। আসলে রাসুল (সাঃ)এর মোবারক মুখনিঃসৃত কথার মধ্যেই আমরা তাঁকে সর্বাধিক

www.pathagar.com

উত্তরূপে খুঁজে পেতে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে তাঁকে সার্থকভাবে অবলোকন করার এর চেয়ে প্রকৃষ্ট আর কোনো উপাই নেই। এইকথা মনে রেখেই যথোচিত সমম্ভ্রমে মহানবী (সাঃ) এর কতিপয় পবিত্র সহীহ হাদীস এখানে উপস্থাপন করা জরুরি মনে করি। সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সন্দেহাতীত যে-ছয়খানি সহীহ হাদীসগ্রন্থ, প্রচলিত পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'সিহায়ে সিত্তাহ' বলাই বাহুল্য, সেখানে সংকলিত হাদীসসমূহের সম্মিলিত সংখ্যা ও পরিমাণ বিশাল। মানবসম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াতের শাশ্বত আলোকবর্তিকাস্বরূপ সেই বিশাল অমৃতভাণ্ডার থেকে নির্বাচিত অতি অল্পসংখ্যক হাদীস এখানে পেশ করা হলো। নিঃসন্দেহে পরিমাণে খুবই সামান্য, বলা উচিত বিন্দুবৎ, তবুও আশা করা যায়, এই সামান্যের মধ্যেই ক্ষুদ্রাকারে হলেও আমরা দেখতে পাবো মহানবী (সাঃ)এর জীবন ও জীবনাদর্শের এক নিখুঁত আলেখ্য; তাঁর শাশ্বত শিক্ষা ও অবদানের এক জীবন্ত সবাকচিত্র।

এক. ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন : ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল; নামাজ কায়েম করা; যাকাত দেয়া; হজ্ব করা এবং রমযানের রোজা রাখা । (বোখারি)

দুই. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ্, কোন মুসলমানের ইসলাম সর্বাপেক্ষা ভালো? তিনি বললেন : ওই মুসলিমের ইসলাম সবচেয়ে ভালো, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ। (বোখারি)

তিন. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কেউ ঈমানদার ইয় না, যতক্ষণ-না আমি তার নিকট তার পিতা-পুত্র এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে প্রিয়তর হই। (রোখারি)

চার. আবু যর (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি লাইলাহা ইল্লাল্লাহ-র ঘোষণা দেয় এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে অবশ্যই সে-ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

পাঁচ. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ)কে জিজ্ঞাস করা হলো, 'কোন কাজ সবচেয়ে ভালো ?' তিনি বললেন 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস'। জিজ্ঞাসা করা হলো 'তারপর কী?' তিনি বললেন 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ'। জিজ্ঞাসা করা হলো 'তারপর কী?' তিনি বললেন, 'ত্রুটিহীন হজ্ব' । (বোখারি)

ছয়. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বলেছেন, নবী (সাঃ) বলেন : চারটি দোষ যার মধ্যে থাকে, সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে দোষগুলোর কোনো-একটি থাকে, সেটা পরিত্যাগ না-করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর স্বভাব থেকে যায়। দোষগুলি হলো, (১)

www.pathagar.com

তার কাছে কোনো আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে, (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে। (৩) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, (৪) ঝগড়া করলে গালাগালি দেয়। (বোখারি)

সাত. হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) এর খেদমতে আরজ করলাম, কোন্ আমল আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় ? রাসুল (সাঃ) বললেন, 'সময়মত নামাজ আদায় করা'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর? তিনি বললেন, 'মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর ? তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা'। আমি আরও জানতে চাইলে হজরত (সাঃ) আরও উত্তর দিতেন। (বোখারি)

আট. আমর ইবনে মাইমুন আল-আওদী থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দান করতে গিয়ে বলেন, পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গনীমত মনে করবে। বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে; অসুস্থ হবার পূর্বে সুস্থতাকে; অসচ্ছলতা আসার পূর্বে সচ্ছলতাকে; ব্যস্ত হয়ে পড়ার পূর্বে অবসরকে; এবং মৃত্যু আসার পূর্বে জীবনকে। (তিরমিযী)

নয়. হজরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'নিজেকে নিজে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ছোট করা মুমেনের জন্য উচিত নয়'। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, মুমেন কী-ভাবে নিজেকে লাঞ্ছিত করে? তিনি বললেন, 'সামর্থ্যের চেয়ে বড় পরীক্ষায় নিজেকে অবতীর্ণ করে'। (তিরমিযী)

দশ. আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন : দুনিয়া খুবই সুস্বাদু ও মনোরম ও উপভোগ্য। আর আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে দেখছেন, তোমরা কী-রূপ আমল কর। (মুসলিম)

এগারো. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) থেকে এরশাদ করেছেন 'একজন সমঝদার আলেম শয়তানের কাছে এক হাজার আবেদের তুলনায় অধিক ভয়াবহ'। (তিরমিযী)

বারো. আইয়ুব বিন মুসা তাঁর পিতার নিকট থেকে, তিনি তাঁর দাদার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) বলেন, 'কোনো পিতা তার সন্তানদের জন্য উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিক ভালো কোনো জিনিসই দান করতে পারে না।' (তিরমিযী)

তেরো. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন : মৃত্যুর পর মানুষের আমল শেষ হয়ে যায়। শুধু তিন প্রকার আমল জারি থাকে। (১) সাদকায়ে জারিয়া অর্থাৎ এমন দান-সদকা যা-দ্বারা মানুষ দীর্ঘদিন ধরে উপকৃত হতে থাকে (২)

www.pathagar.com

এমন ইল্‌ম, যা-থেকে মানুষ ফায়দা লাভ করতে পারে (৩) সচ্চরিত্র সন্তান, যারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম)

চৌদ্দ. হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা জুব্বুল হুয্‌ন থেকে আল্লাহ্‌ নিকট আশ্রয় চাও'। লোকেরা বললো 'ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌, জুব্বুল হুয্‌ন কী'? তিনি বললেন, 'জাহান্নামের একটা ঘাঁটি, খোদ জাহান্নামই এই ঘাঁটি থেকে প্রতিদিন চার শ' বার পানাহ চায়'। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌, এই ঘাঁটিতে কারা প্রবেশ করবে'? তিনি বললেন, 'সেই আলেম, যারা নিজেদের ইল্‌ম ও আমলের প্রদর্শনী করে বেড়ায়'। (তিরমিযী)

ইবনে মাজা-তে একই হাদীসে এই কথাটিও আছে, 'আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত সেই সব আলেম, যারা শাসকদের মসনদ তওয়াফ করে বেড়ায়'।

পনের. জরীর ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণিত। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ্‌ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না'। (বুখারি)

ষোল. হজরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'লোকদের মর্যাদা মোতাবেক তাদের সাথে আচরণ করো'। (আবু দাউদ)

সতের. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তিনটি জিনিস যার মধ্যে পাওয়া যাবে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে সহজ মৃত্যু দান করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (১) বৃদ্ধ ও দুর্বলদের সাথে কোমল আচরণ (২) পিতামাতার প্রতি মুহাব্বাত ও আন্তরিকতা (৩) গোলামদের সাথে সদাচরণ। (তিরমিযী)

আঠারো. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন 'দুনিয়ার সবই নেয়ামত, তবে সর্বোত্তম নেয়ামত হচ্ছে পূণ্যবতী স্ত্রী'। (মুসলিম)

ঊনিশ. আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, 'রাসুল (সাঃ) কখনো খানার দোষ ধরেন নি, পছন্দ হলে খেয়েছেন, অপছন্দ হলে খান-নি'। (বুখারি)

বিশ. আবু মালিক আশআরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ'। (মুসলিম)

একুশ. রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'দুটি জিনিস অবশ্যই ঘটবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, সেই দু'টি জিনিস কী' ? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করে মারা গিয়েছে, সে অবশ্যই দোযখে যাবে। আর যে-ব্যক্তি আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় জেনে মারা গেছে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই বেহেশতে যাবে'। (মুসলিম)

www.pathagar.com

বাইশ. হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'বাজে কাজ পরিহার করা ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত'। (তিরমিযী)

তেইশ. আল্লহ্‌র রাসুল বলেন, 'প্রত্যেক জিনিসেরই সৌন্দর্য আছে, অন্তরের সৌন্দর্য আল্লাহ্‌র ইবাদত'। (আবু দাউদ)

চব্বিশ. নবী করীম (সাঃ) বলেছেন,'সমস্ত মানবসন্তানই পাপী, এবং পাপীদের মধ্যে যারা অনুতাপ করে, তারাই উৎকৃষ্ট'। তিনি এইকথাও বলেছেন, 'যে-ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে কখনো বিপদগ্রস্ত হয় না; যদিও সে প্রতিদিন ৭০ বার সীমা অতিক্রম করে'। (তিরমিযী)

পঁচিশ. আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেন : আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়ার মূল্য যদি একটি মাছির একখানা ভাঙা-ডানার সমতুল্যও হতো, তাহলে কোনো কাফেরকে তিনি এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। (তিরমিযী)

ছাব্বিশ. আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেন : 'আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের কেউ একটি অংগুলি সমুদ্রে ডোবালে তা যতটুকু পানি নিয়ে ফিরে আসে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উপমা ততটুকু'। (বোখারি)

সাতাশ. 'আল্লাহ্‌ যখন সৃষ্টি করলেন, তিনি তখন লওহে মাহ্‌ফুজে লিখলেন, আমার ক্ষমা ও করুণা নিশ্চয়ই আমার ক্রোধকে অতিক্রম করেছে'। (বোখারি)

আটাশ. ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। মহানবী (সাঃ) বলতেন, 'ইয়া আল্লাহ্‌, আমি আপনার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা প্রার্থনা করি'। (মুসলিম)

উনত্রিশ. 'পরনিন্দুক কখনো জান্নাতে যাবে না'। 'এমন কখনো হবে না যে, কোনো মানুষ অপরের দোষ গোপন করবে কিন্তু আল্লাহ্‌ তার দোষ গোপন করবেন না'। (বোখারি)

তিরিশ. 'আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো, (১) বৃদ্ধ জেনাকার (২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ্‌ (৩) দরিদ্র অহংকারী'। (মুসলিম)

একত্রিশ. 'মজলুমের বদ-দোয়াকে ভয় করো, কারণ তার প্রার্থনা ও আল্লাহ্‌র মধ্যে কোনো আড়াল নাই'। (মুসলিম)

বত্রিশ. রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'যে স্ত্রীলোকের মৃত্যুকালে তারা স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, সেই মহিলা জান্নাতী'। (তিরমিযী)

তেত্রিশ. 'দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ, বেহেশত ও মানুষের নিকটবর্তী এবং দোযখ

www.pathagar.com

থেকে দূরবর্তী। কৃপণ লোক আল্লাহ, বেহেশত ও মানুষ থেকে দূরবর্তী, কিন্তু দোযখের নিকটবর্তী'। (বোখারি)

চৌত্রিশ. 'তোমরা অত্যাচারী ও উৎপীড়িতকে সাহায্য করো'। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ্, মজলুমকে তো সাহায্য করবো, কিন্তু জালিমকে কিরূপে সাহায্য করবো'? রাসুল (সাঃ) বললেন, 'জালিমকে জুলুম করা থেকে বাধা প্রদান করাই হবে তাকে সাহায্য করা'। (বোখারি)

পঁয়ত্রিশ. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত : রাসুল (সাঃ) বলেছেন 'কারো অভ্যন্তর পুঁজে পরিপূর্ণ হয়ে পচে যাক, সেটা কবিতায় পরিপূর্ণ হওয়া অপেক্ষা উত্তম'। অবশ্য রাসুল (সাঃ) এই কথাও বলেছেন, 'কোনো কোনো কাব্যে জ্ঞানের কথাও থাকে' অর্থাৎ (দোষণীয় নয়) । (বোখারি)

ছত্রিশ. রাসূল (সাঃ)একবার হজরত আলী (রাঃ)কে আদেশ দিয়েছিলেন, 'ছবি দেখলেই তা নষ্ট করে দেবে এবং উচুঁ কবর দেখলেই তা সমতল করে দেবে। (মুসলিম)

সাঁইত্রিশ. 'আল্লাহপাক যার কল্যাণ করতে ইচ্ছা করেন, তাকে বিপদাপদে জড়িত করেন'। (বোখারি)

আটত্রিশ. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুল (সাঃ) অধিকাংশ সময় প্রার্থনা করতেন, 'ইয়া আল্লাহ, আমি চারটি বস্তু থেকে তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করছি। (১) এমন বিদ্যা যা উপকারে আসে না। (২) এমন হৃদয় যা আল্লাহকে ভয় করে না। (৩)এমন প্রকৃতি যা সন্তুষ্ট হয় না। (৪) এমন দোয়া যা কবুল হয় না'। (আবু দাউদ)

উনচল্লিশ. 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক জীবিত ও দয়ালু, কোনো বান্দাহ তাঁর নিকট হাত তুললে, তিনি সেই হাতকে শূন্য অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন'। (তিরমিযী)

চল্লিশ. মহানবী (সাঃ)এর প্রার্থনা : 'ইয়া আল্লাহ্, তোমার নিকট আমি কার্যে দৃঢ়তা, সুদৃঢ় পরিকল্পনা এবং তোমার সম্পদের কৃতজ্ঞতা ও তোমার ইবাদতের সৌন্দর্য প্রার্থনা করছি। তোমার নিকট সত্যবাদী রসনা ও সুস্থ হৃদয় কামনা করছি। যা তুমি অবগত আছো সেই অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি; যে-কল্যাণ তুমি অবগত আছো, তা কামনা করছি এবং যা তুমি জ্ঞাত আছো, সেই পাপের মার্জনা চাইছি। নিশ্চয়ই তুমি যাবতীয় গোপন বিষয়ে সর্বজ্ঞানী'। (তিরমিযী)

www.pathagar.com

রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে আল্লাহপাক স্বয়ং কী-বলেন ?

জননী মারিয়ামের পুত্র হজরত ঈসা (আঃ) বনি ইসরাইলদের লক্ষ করে বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসুল। আমার আগমন তাওরাত-কিতাবের সত্যায়নের জন্য; এবং আমি একজন রাসুলের সুসংবাদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ' (সুরা ছফ ; আঃ ৬)। এবং এরও অনেক আগে, কাবাগৃহের ভিত্তিস্থাপন করার সময় হজরত ইবরাহিম এবং হজরত ইসমাইল (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, ' হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের (আমাদের বংশধর) মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি মহা-পরাক্রম ও অসীম প্রজ্ঞার অধিকারী' (সূরা বাকারা-আঃ ১২৯)। নিঃসন্দেহে আল্লাহপাকের অশেষ অনুগ্রহ, হজরত ঈসা (আঃ) বর্ণিত সেই অগ্রিম সুসংবাদ এবং হজরত ইবরাহিম ও ইসমাইল (আঃ) এর দোয়ার বাস্তব রূপ নিয়ে ধরাপৃষ্ঠে আগমন করলেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। দু'জন বিশিষ্ট নবী (আঃ)এর যে-দোয়া, প্রায় ঠিক হুবহু একই ভাষায় আল্লাহপাক তাঁর সর্বশেষ রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে এরশাদ করেন, 'আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসুল, যিনি তোমাদের কাছে আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করবেন; শিক্ষা দেবেন কিতাব ও হিকমত, শিক্ষা দেবেন এমন-সকল বিষয়, যা কখনো তোমরা জানতে না' (সুরা বাকারা-আঃ ১৫১)।

যাই হোক, তাওহীদ কি আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না-থাকলে যেমন হয়, রাসুল (সাঃ)কে সন্দেহ কি অবিশ্বাস করলেও ঠিক একই রকম, মুসলমান হওয়াও যায় না, থাকাও যায় না। এবং এই সঙ্গে আরো একটি কথা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাহলো, রাসুল (সাঃ)এর প্রতি সর্বাচ্চ ভালোবাসার মধ্যেই আমাদের ঈমানের পরিপূর্ণতা। অর্থাৎ পিতামাতা স্ত্রী পুত্রকন্যা বন্ধু আত্মীয় পরিজন পৃথিবীর সকল কিছুর উর্ধে আমাদের সর্বাধিক ও সর্বোচ্চ মুহাব্বত যাঁর প্রাপ্য, তিনি আল্লাহর রাসুল হজরত মোহাম্মদ মোস্ত ফা (সাঃ)। এটা শুধু আবেগ ও অনুরাগের কথা নয়, এটা আমাদের দ্বীনী-যোগ্যতা ও ঈমানী-পরিপূর্ণতার অপরিহার্য দাবী। কারণ রাসূল (সাঃ) নিজে বলেছেন, 'যতক্ষণ তুমি সর্বাপেক্ষা আমাকে ভালো না-বাসবে, ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণ ঈমানদার নও'। অতএব রাসুল (সাঃ)এর প্রতি আল্লাহপাকের মুমেন বান্দাহদের যে-মুহাব্বত, তা পার্থিব যে-কোন দাবীর মোকাবিলায় শর্তহীন ও অবিসংবাদিত।

কিন্তু অন্তরের ভালোবাসা-তো আল্লাহপাকের একটি বিশেষ নেয়ামত, একটি

www.pathagar.com

বিশেষ অনুগ্রহ। 'ওয়ামা তাশাউনা ইল্লা আঁইয়াশাউ আল্লাহু রাব্বুল আলামীন' (সুরা তাকবীর)। মানুষের সুমতি, হেদায়াত ও অন্তরের গতিপ্রকৃতি যেমন আল্লাহপাকের অনুগ্রহনির্ভর; ভালোবাসাও একান্তভাবেই আল্লাহপাকের ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ আমরা জোর করে কাউকে ভালোবাসতে পারি না, কারো নিকট থেকে ভালোবাসা পেতেও পারি না। অতএব আমাদের ঈমান যতই অর্পূন রয়ে যাক, আল্লাহপাকের একান্ত অনুগ্রহ ছাড়া তাঁর রাসুল (সাঃ) কে না ভালোবাসার নসীব হয়, না তাঁকে সম্যকভাবে চেনার সৌভাগ্যলাভ ঘটে। তবে একটি কথা সত্য যে, ভালোবাসার জন্য আমরা আমাদের ইচ্ছাটাকে জাগিয়ে তুলতে পারি; রাসুল (সাঃ)কে সম্যক অনুধাবনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারি; বাকিটা মহান আল্লাহপাকের অভিপ্রায়। রাসুল (সাঃ)এর যথার্থ পরিচয় কী, তাঁর অত্যুচ্চ মর্যাদার রূপরেখা কেমন, এ-সকল প্রশ্নের জবাব দেবার সাধ্য কোন মানুষের নেই। এটা একটা খুবই উচ্চমার্গীয় কামালিয়াত ও মারেফাত। মারেফাতের এই নূর আল্লাহপাক সবাইকে দান করেন না; সকলের এই দান গ্রহণের যোগ্যতাও নেই। তবে রাসুল (সাঃ)কে চেনবার একটি সহজ উপায় হচ্ছে আল কোরআন। আমাদের জননী আয়েশা সিদ্দীকাও (রাঃ) একদা এই রকমই বলেছিলেন, 'তোমরা কি কোরআন পড়ো নি'? এইজন্যই আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়তম হাবীব সম্পর্কে যা-বলেন, সেইদিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই, আশা করা যায় আমরা তাঁকে কাছে পাবো। কারণ আল্লাহর চেয়ে অধিক-যথাযথ বর্ণনা ও পরিচয় আর কে দিতে পারেন

মহানবী (সাঃ)-যে সমগ্র মানববংশের জন্য আলো ও কল্যাণের একমাত্র দিকপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরিত, এ বিষয়ে আল্লাহপাক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এরশাদ করেন: 'আল্লাহপাকের তরফ থেকে এসেছে আলোকবর্তিকা (অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (সাঃ)) এবং কিতাবুম মুবীন, প্রকাশ্য কিতাব (অর্থাৎ আল কোরআন)' (সুরা মায়িদা : ১৫)। 'হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে' (সূরা আহযাব : ৪৫,৪৬)। 'তিনিই তাঁর রাসুলকে হেদায়াত ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য-প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহই যথেষ্ট' (সুরা আল ফাত্হ : ২৮) 'সত্য সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত আপনি নিশ্চয়ই রাসুলগণের অন্যতম' (সূরা ইয়াসীন : ২,৩)। 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি' (সুরা আম্বিয়া : ১০৭)।

কিন্তু অনেক মানুষের বড় বদনসীব, আল্লাহপাকের সুস্পষ্ট ঘোষণাসত্ত্বেও, তারা তাঁকে চিনলো না, চিনেও চিনলো না। এবং নবী হিসেবে তো মানলোই না, বরং তাঁকে পাগল গণক ইত্যাদি নানারকম অভিধায় চিহ্নিত করতে লাগলো। কাফিরদের এই অজ্ঞতা, অপরিণামদর্শিতা ও দুশমনির জবাবে আল্লাহপাক বলেন : ' তোমাদের সঙ্গী

www.pathagar.com

(অর্থাৎ মোহাম্মদ সাঃ) পথভ্রষ্ট হন-নি, বিপথগামীও হন-নি। এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না' (সুরা নজম : ২,৩)। 'আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি বিকৃতমস্তিষ্ক নন। নিশ্চয়ই আপনার জন্য নির্ধারিত রয়েছে অশেষ পুরস্কার। এবং নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এদের কথায় ব্যথিত হবেন না। অচিরেই আপনি দেখতে পাবেন, তারাও দেখবে, আসলেই কে বিকৃতমস্তিষ্ক' (সুরা আল কলম : ২-৬)। 'আমি তোমাদের কাছে তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ একজন রাসুলকে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রাসুল' (সুরা মুয্যাম্মিল : ১৫) ' তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল, তোমাদের দুঃখকষ্ট যাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমেনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়' (সূরা তাওবাহ : ১২৮)। কাফেররা অবশ্য একবারে না-বুঝ ছিল না। এবং যেহেতু তারা মোহাম্মদ(সাঃ)কে দীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন করেছে, তারা তাঁকে কোন মানবিক-দোষে অভিযুক্তও করে নি, অভিহিতও করে নি। তারা শুধু ঘুরে ফিরে একই কথা বলেছে, লোকটা কবি অথবা উন্মাদ অথবা দুষ্ট আত্মাগ্রস্ত অতিন্দ্রীয়বাদী ইত্যাদি। এবং আল্লাহপাকও বার বার এই ভুল সংশোধন করে দিয়ে তাঁর রাসুলের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'আমি তাঁকে কবিতা শিক্ষা দেই নাই, এবং কবিতা তাঁর উপযুক্তও নয়'। 'নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রাসুলের আনীত। এটা কোন কবির কালাম নয়, তোমরা কমই বিশ্বাস করো। এবং তোমরা কমই অনুধাবন করো যে, এটা কোন অতিন্দ্রীয়বাদীর কথা নয়। এটা বিশ্বপালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ' (সূরা আল হাককাহ : ৪০-৪৩)। 'নিশ্চয়ই আল কোরআন সম্মানিত রাসুলের আনীত বাণী, যিনি আরশের প্রতাপান্বিত মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, সবার মান্যবর ও সেখানকার বিশ্বাসভাজন। এবং তোমাদের সঙ্গী উন্মাদ নন' (সুরা তাকভীর : ১৯-২২)। কিন্তু এত কথার পরেও, এত স্পষ্ট চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া সত্ত্বেও অনেক মানুষ, যে-কাফের সেই কাফেরই থেকে গেল। এর কারণ শুধু এই নয় যে, তারা তাদের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে না-আসতে পারার যে-ব্যর্থতা, সেই হেতু তাঁকে চিনতে পারে নি। অনেকের ক্ষেত্রে হয়ত সত্য, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে এটাও সত্য, বিশেষ করে যারা আহলে-কেতাব, তারা আসলে জ্ঞানপাপী; যে-কারণে আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাঁকে চেনে, যেমন করে চেনে আপন সন্তান সন্ততিকে' (সুরা বাকারা-১৪৬)।

বলাই বাহুল্য, শুরু থেকেই এক কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাসুল (সাঃ)কে অগ্রসর হতে হয়েছে। চতুর্দিকে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ দুশমনি, অনুচিত অসংগত প্রাণঘাতী বৈরিতা, নিরন্তর অসহ্য-অকথ্য নির্যাতন; কত অপমান কত দুঃখ শোক, কত আততায়ীর কত চক্রান্ত ষড়যন্ত্র, যারা হিসাব মেলানো কঠিন। আর এইসব নিয়েই তাঁর অব্যাহত অবিরাম পথযাত্রা। কিন্তু রাসুল (সাঃ) মুহূর্তের জন্যও কখনো হতোদ্যম হননি। তিনি

www.pathagar.com

তাঁর নির্ধারিত লক্ষ্যের প্রতি একাগ্র অভিনিবিষ্ট তন্ময় ও স্থির ও অচঞ্চল। তবু পথের দুর্গমতা, অর্পিত দায়িত্বের কঠিন গুরুভার ইত্যাদি কারণে ক্বচিৎ জেগে-ওঠা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মুখচ্ছবির কথা ভেবে আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়তম হাবীবকে সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : 'আপনার প্রতিপালক আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। আপনার জন্য পরবর্তী অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা শ্রেয়। আপনার প্রতিপালক শীঘ্রই আপনাকে দান করবেন; অতঃপর আপনি আনন্দিত হবেন। তিনি কি আপনাকে এতীম রূপে পান নি? তারপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা ও নিঃস্ব; অতঃপর তিনি আপনাকে পথপ্রদর্শন করেছেন, অভাবমুক্ত করেছেন' (সুরা দ্বোহা : ৩-৮)। ' আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশীগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন; এবং এমন বিষয় আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম' (সূরা নিসা : ১১৩)। 'আমি আপনার (নামের মহিমা ও) আলোচনাকে সুউচ্চে তুলে ধরেছি' (সুরা আল ইনশিরাহ : ৪) । 'রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জেগে থাকুন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত অর্থাৎ নফল; হয়ত-বা আপনার প্রতিপালক আপনাকে মাকামে-মাহমুদে পৌঁছে দেবেন' (সুরা বনি ইসরাইল : ৭৯)। 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। আপনার শত্রুই-তো লেজকাটা নির্বংশ' (সুরা কাউসার : ১,৩)।

যাই হোক, মহানবী (সাঃ)যে সমগ্র মানববংশের জন্য আলো ও কল্যাণের একমাত্র দিকপ্রদর্শক হিসাবে প্রেরিত, এ-বিষয়ে আল্লাহপাক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এরশাদ করেন : 'আল্লাহপাকের তরফ থেকে এসেছে আলোকবর্তিকা (অর্থাৎ আল্লাহর রাসুল সাঃ) এবং কিতাবুম মুবীন, প্রকাশে কিতাব অর্থাৎ আল কোরআন' (সুরা মায়িদা : ১৫)। 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্যদ্বীনসহ সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি; এবং জাহান্নামীদের সম্পর্কে আপনাকে কোনরূপ প্রশ্ন করা হবে না' (সুরা বাকারা : ১১৯)। আয়াতের শেষাংশটি বড় তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহপাক তাঁর হাবীবকে অপরিসীম করুণা ও ভালোবাসার সঙ্গে অগ্রিম জানিয়ে দিচ্ছেন, তাঁকে তাঁর উপর অর্পিত কাজের জন্য স্বীয় প্রতিপালকের নিকট আদৌ কোনরূপ জবাবদিহি করতে হবে না। অবশ্য প্রকৃত অর্থে জবাবদিহি করার কিছু নেই-ও। তিনি তাঁর দায়িত্ব ষোলআনা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন; অতঃপর কে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না-করবে, সেটা একান্তভাবেই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তবু আল্লাহপাক যা-বললেন, সেটা তাঁর প্রিয়তম হাবীবের প্রতি যে-সীমাহীন মর্যাদা ও প্রতীও পরিচায়ক, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্য একটি জায়গায়ও দেখতে পাই, আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ কখনোই তাদের উপর আযাব নাজিল করবেন না, যতক্ষণ আপনি তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন' (সুরা আনফাল-৩৩)

www.pathagar.com

অবশ্য এটাই-তো সর্বাশে সত্য যে, আমরা আল্লাহকে দেখিনি, আল্লাহকে চিনতামত্ত না; যেটুকু চেনার সৌভাগ্য হয়েছে সে-তো রাসুল (সাঃ)এর নিকট থেকেই। অতএব রাসুল (সাঃ)এর পথনির্দেশ ও জীবনাদর্শ, কথা ও কাজ, আদেশ ও নিষেধ নিঃশর্তভাবে মান্য করা ঈমানদারদের জন্য ফরজ। এই আনুগত্য থেকে কেউ যাতে চুল-পরিমাণ বিচ্যুত না-হয়, এজন্য আল্লাহপাক পুনঃ পুনঃ এরশাদ করেন : 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়'' (সুরা আল ইমরান-১৩২)। ' যে-কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, তাকে তিনি (আল্লাহপাক) জান্নাতে দাখিল করবেন'। (সুরা আল ফাত্হ : ১৭)। আল্লাহপাক আরো বলেন, 'যারা আল্লাহ্ ও শেষ-দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম নমুনা' (সুরা আহযাব : ২১)। অতএব 'রাসুল তোমাদেরকে যা- দেন তা গ্রহণ করো; যা নিষেধ করেন তা-থেকে বিরত থাকো, এবং আল্লাহকে ভয় করো' (সুরা হাশর : ৭)। 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করো; এবং শোনার পর তাথেকে বিমুখ হয়ো না' (সুরা আনফাল : ২০)। নিঃসন্দেহে আল্লাহপাকই আমাদের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু ও অভিভাবক ও আশা-ভরসার স্থল। 'আল্লাহু ওয়ালিউল্লাজীনা আমানু' মুমেনদের জন্য আল্লাহই বন্ধু (সুরা বাকারা : ২৫৭) : 'ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়ালিয়াঁউ ওয়া কাফা বিল্লাহি নাসীরা' বন্ধু এবং সহায়ক হিসেবে আল্লাহপাকই যথেষ্ট (সুরা নিসা : ৪৫); 'বালিল্লাহু মাওলাকুম ওয়া হুওয়া খাইরুন্ নাসিরীন' আল্লাহপাকই প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী (সুরা আল ইমরান : ১৫০)। কিন্তু এই পার্থিব দৃশ্যমান পরিবেশে মুমেনদের জন্য আল্লাহর রাসুল (সাঃ)ই সর্বাধিক আপন ও সর্বাধিক শুভানুধ্যায়ী। এইজন্যই আল্লাহপাক বলেন, 'নবী মুমেনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক আপন ও ঘনিষ্ঠ; এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাঁদের জননী' (সুরা আহযাব : ৬)।

আরো অনেক কথা অনেকভাবে আল্লাহপাক তাঁর রাসুল (সাঃ) সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেন; কিন্তু মোটামুটি এই হলো আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত ও এরশাদকৃত তাঁর হাবীবের পরিচিতি-জ্ঞাপক সারসংক্ষেপ। এখন যে-প্রশ্নটি সর্বাধিক জরুরি ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহলো, আল্লাহপাক তাঁর রাসুল (সাঃ)কে কি শুধু শুধুই প্রেরণ করেছেন এই ধরাপৃষ্ঠে? যদিও বলেছেন 'আলোকবর্তিকা', বলেছেন 'সুসংবাদদাতা' 'সতর্ককারী' 'বিশ্বমানবের জন্য আর্শীবাদ'; বলেছেন 'সর্বোত্তম স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত' 'সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী', 'মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শের নমুনা' 'সর্বাধিক মুহাব্বত ও নিঃশর্তভাবে সর্বাধিক আনুগত্যের দাবীদার'; কিন্তু তাঁর উপর অর্পিত মূল দায়িত্বটা কী? তাঁর উপর আল্লাহপাকের এই ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে যথোচিত অবহিত না-হলে, রাসুল (সাঃ)এর প্রকৃত পরিচয় আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হবে না; তাঁর প্রকৃত অভিজ্ঞান অবগুণ্ঠনের আড়ালে সর্বদা অনুদ্ঘাটিতই রয়ে যাবে। অবশ্য মানুষ

www.pathagar.com

যাতে ভুল না-বোঝে, ইহুদি-নাসারাদের মত তাদের নবী-রাসুলকে নিয়ে গর্হিত ও অমার্জনীয় বাড়াবাড়ি করে না-বসে, এজন্য আল্লাহপাক সতর্ক করে দিয়েছেন : আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মতই মানুষ; পার্থক্য এইটুকু যে, আমার কাছে অহী আগমন করে' (সুরা কাহাফ : ১১০)। 'বলে দিন, রাসুলগণের মধ্যে আমি নতুন কিছু নই। আমার সাথে ও তোমাদের সাথে কী করা হবে আমি জানি না। আমার কাছে যা প্রত্যাদেশ করা হয়, আমি তারই অনুসরণ করি। আমি শুধু একজন প্রকাশ্য ভয়প্রদর্শনকারী' (সুরা আহকাফ : ৯)। এবং কোন মানুষের যাতে বাড়াবাড়ি করার কোন অবকাশই না-থাকে, সেজন্য আল্লাহ এই কঠিন কয়েকটি আয়াতও নাজিল করেন : ' আমাদের উপর কোন কথা বানিয়ে বলতো, আমি তার দক্ষিণহস্ত পাকড়াও করতাম। তারপর তার গ্রীবাস্থিত ধমনী কর্তন করে দিতাম, তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারতে না' (সুরা হাক্কাহ : ৪৪-৪৭)। এখানে রাসুল (সাঃ)কে লক্ষ করে কথাগুলি বলা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্য হলো মুসলিম মিল্লাত। এবং এই কারণে পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহপাক জানিয়ে দিলেন, 'এটা নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ' (আ; ৪৮)।

রাসুল (সাঃ)এর দায়িত্ব ছিল, সকল প্রকার শির্ক ও পৌত্তলিকতা ও অংশীবাদকে সমূলে উৎখাত করে, আল্লাহর একক অখন্ড আবিভাজ্য সার্বভৌমত্বের অধীন একটি তাওহিদী পৃথিবী রচনা করা। তিনি পুরো জাযিরাতুল আরবে তা করেছিলেন। রাসুল (সাঃ) এর গৌরবময় ও পবিত্র উত্তরাধিকার নিয়ে এই দায়িত্ব এখন মুসলিম উম্মাহর। মুসলিম উম্মাহ যদি এই দায়িত্ব অনুধাবন না-করে, যদি তার চৈতন্যে ও চিন্তায় অনুপ্রবেশ করে তাওহিদ-বিনাশী নানাবর্ণ মুশরিকী বীজানু, সে যদি পৌত্তলিক অংশীবাদী ও অভিশপ্ত আহলে-কেতাবদের সখ্য ও সৌহার্দ্যকে মনে করে মূল্যবান, শিরকের মোকাবিলায় তার মধ্যে যদি জিহাদ ও শাহাদাতের কোন তামান্না জাগ্রত না-হয়, তাহলে তার অন্য সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদত, তা যত নিখুঁতই হোক, পরিণামে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

এটা এইজন্য যে, তাওহীদই হলো ইসলামের প্রাণ। তাওহীদ নেই তো-ইসলামও নেই। আর কাফের মুশরিকদের সঙ্গে রাসুল (সাঃ)এর মূল দ্বন্দ্বটাই-তো ছিল এখানে। তারা বলতো, 'সে (মোহাম্মদ সাঃ) কি সকল মাবুদকে এক মাবুদ বানাতে চায়? এটা-তো বড়ই অবাক হওয়ার কথা' (সুরা সাদ : ৫)। বলাই বাহুল্য, এই 'অবাক' হওয়ার মোকাবিলাতেই ইসলামী দাওয়াতের সূচনা। আর আজ এই বিশ্ববিস্তৃত বহুরূপী অংশীবাদের মোকাবিলায় রাসুল (সাঃ) এর উম্মতদেরও এটাই একমাত্র সংগ্রাম যে, তাদেরকে সবটুকু রক্ত ও সম্পদ কোরবানী করে হলেও, তাওহিদী কাফেলাকে সম্মুখপানে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ-নাহলে রাসুল (সাঃ) কে মুহাব্বত করা না-

www.pathagar.com

করা, তাঁর উম্মত হওয়া না-হওয়া উভয়ই সমান। এবং বিষয়টি সত্যই এত জরুরি, এত অপরিহার্য যে, হাদীসে কুদ্‌সীতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : 'হে আদম সন্তান, তুমি যদি কোন শির্‌ক না-করে (অর্থাৎ তাওহিদী প্রত্যয় নিয়ে) আমার সামনে দুনিয়াভর্তি পাপরাশি নিয়েও হাজির হও, তাহলে আমি তোমাকে দুনিয়াভর্তি ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করবো' (তিরমিযী)।

আল্লাহপাক স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর রাসুল ও রাসুল (সাঃ)এর জীবন ও জীবনাদর্শকে সঠিক অনুধাবন ও অনুসরণ করবার তওফিক এনায়েত করুন। শুধু তসবিহর দানার মধ্যে জান্নাত অনুসন্ধান করা নয়, ভীরুতা নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে শুধু আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ময়দানে ময়দানে দোয়া করা নয় (হয়ত এ-সবের মধ্যেও কিছু ফযীলত আছে)। আল্লাহপাক অনুগ্রহ করুন, আমরা যেন মনে রাখতে পারি, তাওহিদের কোন বিকল্প নেই; আল্লাহর একক প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার যে-সংগ্রাম তার চেয়ে বড় কোন কাজ নেই; এবং সমগ্র বিশ্বের সার্বিক নেতৃত্বে মহানবী (সাঃ)এর প্রতিষ্ঠিত প্রজ্জ্বলিত যে-তাওহিদী আমানতের শাশ্বত আলোকবর্তিকা, তাকে বিজয়ী করার চেয়ে মুসলিম মিল্লাতের জন্য জরুরি কোন কর্তব্যকর্ম নেই। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লাবিল্লাহ।

www.pathagar.com

রাসুল (সাঃ)এর সুন্দরতম শত নাম

পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জগতে জ্বিন ইনসান সবার কাছে শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয়তম নাম হলো দু'টি। এক. আল্লাহ, নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক একক অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বের অধিকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এবং দুই. মোহাম্মদ, আল্লাহপাকের প্রেরিত রাহমাতাল্লিল আলামীন মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)।

সমগ্র মানবমণ্ডলীর কাছে এই দুই পবিত্র মহিমান্বিত নাম, মনে ও মুখে সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণযোগ্য। এবং যিনি যত বেশি এই নামের সঙ্গে নিজেকে সরবে-নীরবে সজনে-বিজনে সঙ্গ-নিঃসঙ্গতায় একাত্ম করে রাখতে পারেন, আশা করা যায়, আল্লাহপাকের অপার অনুগ্রহে তিনি তত বেশি কামিয়াব; এবং এই আশাও করা যায়, তিনি হবেন আল্লাহপাকের প্রীতি ও ক্ষমা ও অনুগ্রহলাভে ধন্য; এবং ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর অবস্থান হবে জান্নাতের সুরম্য অভ্যন্তরে। যাই হোক, আমরা এখানে রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র নামসমূহের একটি মোটামুটি তালিকা প্রণয়ন করতে প্রয়াসী। এটা আমাদের একটি সানুরাগ প্রচেষ্টা; আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করি, তিনি তাঁর অপরিমিত সাহায্য ও অনুগ্রহ দান করুন।

মহানবী (সাঃ)এর মূল নাম (Proper Name) হলো মোহাম্মদ। ভূমিষ্ঠ হবার পরেই জননী আমিনা এই নাম রাখেন। অবশ্য এটা মা-আমিনার নিজস্ব ইচ্ছাপ্রসূত নয়। এটা মহান আল্লাহপাকের ইচ্ছা, এবং আল্লাহপাক কর্তৃকই নির্ধারিত এই নাম। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এই নামের উল্লেখ থাকার কারণে এবং হিজাযে শীঘ্রই এই নামে একজন রাসূল জন্মগ্রহণ করবেন, লোকপরম্পরায় এই কথা জ্ঞাত হয়ে তিন ব্যক্তি তাঁদের পুত্রের নাম রেখেছিলেন মোহাম্মদ। সীরাত ইবনে হিশাম থেকে জানা যায়, তাঁরা হলেন সুফিয়ান বিন মুজাশি, উহাইহা ইবনে আল জাল্লাহ এবং হিমরান ইবনে রাবিয়াহ।

যাই হোক, জননী আমিনা গর্ভাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, একজন অপরিচিত আগন্তুক এসে তাঁকে বললেন, 'আপনি যাঁকে গর্ভে ধারণ করেছেন, তিনি মানবজাতির মহানায়ক; ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর নাম রাখবেন মোহাম্মদ'। আমাদের বিশ্বাস, নিশ্চয়ই আল্লাহর হুকুমে কোনো ফেরেশতাই মা-আমিনাকে এই স্বপ্ন দেখিয়ে থাকবেন। তারপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো; খবর পেয়ে পিতামহ আবদুল মুত্তালিব দেখতে এলেন। মা-আমিনা তাঁকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানালেন, এবং নবজাতকের নাম রাখা হলো মোহাম্মদ।

অতএব রাসূল (সাঃ)-এর এটাই প্রথম ও প্রধান নাম, এবং এই মোহাম্মদ নামেই তিনি আশৈশব অভিহিত ও পরিচিত। তাঁর চরিত্রমাধুর্য সততা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে মক্কার লোকেরা তাঁকে 'আল আমীন' বলেও সম্বোধন করতো। অবশ্য এটা

www.pathagar.com

ছিল জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত একটি গুণবাচক অভিধা, যা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং এখনো প্রসিদ্ধ। তবে তাঁর মূল নাম সর্বদায়ই মোহাম্মদ; যে-কারণে হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে 'মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ' ছাড়া আর কোনো-কথা কুরাইশরা সংযুক্ত করতে সম্মত হয় নি।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)কে তাঁর সকল সাহাবা সম্বোধন করতেন 'ইয়া রাসুলুল্লাহ'। এমনকি তাঁর প্রিয়তম সকল স্ত্রী আমাদের জননী, তাঁরাও কখনো কদাচিৎ 'আবুল কাসিম' বললেও, বেশিরভাগ সময় 'ইয়া রাসুলুল্লাহ' বলেই সম্বোধন করেছেন। হজরত জিবরাইল (আঃ) একবার তাঁকে 'ইয়া আবু ইবরাহিম' বলে সম্বোধন করেছিলেন; সেই থেকে কখনো কখনো তাঁকে আবু ইবরাহিম অর্থাৎ ইবরাহিমের পিতা, এই কুনিয়াত বা উপনামেও ডাকা হতো। যাই হোক, এখানে যা-আলোচ্য তা হলো, 'মোহাম্মদ' এই মূল নামটি ছাড়াও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) অনেক পরিচিত-জ্ঞাপক ও গুণবাচক নামের অধিকারী। আল্লাহ'র তরফ থেকে নাজিলকৃত পূর্ববর্তী কিতাব ও সহীফাসমূহ, রাসূল (সাঃ)-বর্ণিত পবিত্র সহীহ হাদীসের সংকলন এবং সর্বোপরি আল-কোরআনকে সামনে রেখে অনেক বুজুর্গ-গবেষক রাসূল (সাঃ)এর মোবারক নামের কিছু কিছু তালিকা সযত্নে প্রণয়ন করেছেন। রাসূল (সাঃ)এর পবিত্র সীরাত অনুধাবনে এই ধরনের তালিকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান ও ফলপ্রসূ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

ইবন আল আরাবীর (রঃ) সূত্র থেকে শাইখ ইবনুল ফারিশ (রঃ) জানিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)এর ২০২০ টি গুণপ্রকাশক পবিত্র ও অনন্য নাম-বিশেষণ গণনা করেছেন। পবিত্র বোখারি-শরীফের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার ইমাম আল কাসতালীনী (রঃ) অত্যধিক যত্ন ও অভিনিবেশ সহকারে গণনাকরত মহানবী (সাঃ)এর ১০০০টি সুন্দরতম নামের একটি অনবদ্য তালিকা প্রস্তুত করেছেন। শাইখ ইমরান আল জান্নাতী (রঃ) কর্তৃক রাসূল (সাঃ)এর পবিত্র ২১০ টি নামের সমন্বয়ে দালাইল আল খায়রাত শীর্ষনামে একটি অতীব মূল্যবান সংকলন প্রণীত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই ধরনের কাজ সম্ভবত হয়নি; অন্তত বর্তমান লেখকের চোখে পড়ে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ইংরাজীতে 'The Most Beautiful Names' শিরোনামে একটি অনূদিত পুস্তক আছে। এই গ্রন্থে আল্লাহপাকের অনেক পবিত্র নামের সঙ্গে শেষের দিকে একটি অধ্যায়ে দালাইল আল খায়রাত গ্রন্থ থেকে গৃহীত রাসূল (সাঃ)এর পবিত্র-সুন্দর নামের একটি তালিকাও সযত্নে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি এখন আর খুব একটা সহজলভ্য নয়; তবে আল্লাহপাকের রহমত যে আমার এক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু প্রায় ষোল বছর পূর্বে উক্ত বইয়ের একটি কপি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। যাই হোক, আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও অর্থসহ মহানবী (সাঃ) এর ১০১ টি মোবারক-নামের তালিকা সসম্ভ্রমে উপস্থাপন করছি। অবশ্য উল্লেখ করা একান্তভাবেই আবশ্যক যে, এই সংখ্যা (১০১)

www.pathagar.com

একেবারেই অপ্রতুল ও কৃশ। কারণ, আল্লাহপাক এরশাদ করেন তুমি যদি আল্লাহর নেয়ামতকে গণনা করতে চাও, গণনা করো; দেখবে (তা এমনই অফুরন্ত) তুমি কোনোদিন শেষ করতে পারবে না। পৃথিবীবক্ষে সর্বদেশ ও সর্ব-সময়কালের প্রেক্ষাপটে আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত হলো আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। অতএব এতবড় এই নেয়ামতের পরিচয় স্বল্পসংখ্যক বিশেষ্য-বিশেষণের মধ্যে তুলে ধরা অসম্ভব; এবং সকল মানুষের জন্য চিরদিন অসম্ভবই থেকে যাবে। তবু এই চেষ্টা ও কর্মের কিছু মূল্য হয়ত আছে। কারণ কে-জানে, আল্লাহপাক হয়ত স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর প্রিয়তম হাবীবের এই মহিমান্বিত নামসমূহের বরকতে আমদের পার্থিব ও পারলৌকিক নাজাতের সুরাহা করে দেবেন।

১. **মোহাম্মদ :** সর্বোচ্চ প্রশংসিত। সৃষ্টিকুলে তাঁর চেয়ে অধিক প্রশংসার পাত্র দ্বিতীয় আর কেউ নেই। আর এই প্রশংসার বিষয়টি বর্ণনাতীতরূপে ব্যাপক। কারণ, শুধু মানুষ নয়, ফেরেশতা, জ্বীন প্রাণী পর্বত নদী বৃক্ষ সবাই তাঁকে স্ব স্ব ভাষায় ও নিয়মে নিরন্তর প্রশংসা-জ্ঞাপন করছে, যা সর্বদা অব্যাহত আছে ও থাকবে। এবং এমনকি সকল ক্ষমতা ও প্রশংসার যিনি মালিক, তিনিও তাঁর রাসূল (সাঃ)এর প্রশংসা করেন ও সবাইকে যথাযথভাবে প্রশংসাজ্ঞাপনের তাগিদ দেন।

২. **আহমদ :** সর্বাধিক প্রশংসাকারী। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহপাকের প্রশংসায় রত, কৃতজ্ঞতায় অবনত। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এক্ষেত্রে শীর্ষে। আল্লাহর প্রশংসাকারী হিসাবে তাঁর চেয়ে একাগ্র ও অগ্রগামী ও একনিষ্ঠ আর কেউ নেই। এবং এইজন্যই তাঁকে বলা হয় 'আহমদ আল হামিদীন' অর্থাৎ সর্বাধিক প্রশংকারীদের মধ্যে যাঁর স্থান সর্বোচ্চ।

৩. **হামীদ :** তিনিই একমাত্র, যিনি আল্লাহর সর্বোচ্চ প্রশংসাজ্ঞাপনের তাওফিক লাভ করেছেন।

৪. **মাহমুদ :** এই নামের অর্থও সর্বোচ্চ প্রশংসিত। শুধু এই নশ্বর পৃথিবীতে নয়, আখেরাতে শেষ বিচারের দিনেও তিনি সকলের হৃদয়-নিংড়ানো প্রশংসা লাভ করবেন। পরকালের সেই কঠিন দিবসে কেবল তাঁর সুপারিশই আল্লাহাপাকের নিকট গ্রাহ্য হবে। তাছাড়া অন্য একটি কারণেও তাঁর নাম মাহমুদ। তাঁর জন্যই আল্লাহপাক নির্দিষ্ট রেখেছেন গৌরব ও সম্মানের সর্বোচ্চ প্রশংসনীয় স্থান ' মাকামাম মাহমুদা'(The station of the highest glory)।

৫. **অহীদ :** তিনি তাঁর উম্মতদের অগ্নিময় জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তাবিধানকারী। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) চাবি-সদৃশ; যাঁর কল্যাণে সাতটি দোজখের দরজাসমূহ বন্ধ এবং আটটি জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হবে; এবং সমগ্র বিশ্বে তিনিই মহান আল্লাহপাকের রহমত ও করুণা।

www.pathagar.com

৬. **রাসূল :** আল্লাহর বাণীবাহক ও আল্লাহর বাণীকে বাস্তব-রূপদানকারী।

৭. **নবী :** আল্লাহর কথা বর্ণনাকারী ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী।

৮. **হাশীর :** একত্রীকরণ ও ঐক্যবদ্ধকারী। ইহলোক ও পরলোকে সকল ঈমানদার তাঁরই চতুর্দিকে সমবেত হবে।

৯. **জামী :** সর্বাধিক প্রজ্ঞার অধিকারী ; আল্লাহপাক যাঁকে প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান ও হিকমত দান করেছেন।

১০. **কাইয়ীর :** সত্য ও শুভত্বের অধিকারী, যিনি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সর্বাধিক উদার ও দয়ার্দ্র।

১১. **মাহী :** সকল অন্ধকার ও মিথ্যার বিলোপ সাধনকারী। আল্লাহপাক তাঁকে পাঠিয়েছিলেন এক দুর্ভেদ্য আইয়ামে জাহেলিয়াতের মধ্যে। এই জাহেলিয়াতকে নিঃশেষে অপসারণ করে তিনি মানববিশ্বকে উপহার দিয়েছেন এক আলোর সওগাত।

১২. **ওয়াহিদ :** একক অনন্য। অতুলনীয়। তিনি যদিও মানুষের মধ্যে মানুষের মতোই ছিলেন; কিন্তু তাঁর অনুপম দেহসৌষ্ঠব, অভাবিত চরিত্রমাধুর্য, সর্বোচ্চ হিকমত ও প্রজ্ঞা, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অপার অফুরন্ত দরদ ইত্যাদি তাঁর মধ্যে আল্লাহপাক এমনভাবে সন্নিবেশিত করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোনো দ্বিতীয় উদাহরণ নেই।

১৩. **কামিল :** শুদ্ধতম, পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

১৪. **ইকলিল :** মুমেনদের যিনি শিরোভূষণ বা মুকুট।

১৫. **আকীব :** সকল রাসূল ও নবীর (আঃ) উত্তরাধিকার নিয়ে তিনি চূড়ান্তভাবে অবতীর্ণ সর্বশেষ নবী 'খাতামুন্নাবীয়ীন'। তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই। নবী-আগমনের পরম্পরা তার মধ্য দিয়েই পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

১৬. **তা'হা :** বিশুদ্ধ পবিত্র ও সঠিক-বিশ্বাসের দিশারী। তা'হা আল্লাহপাকের একটি পবিত্র নাম; এবং এই নামে কুরআনুল কারীমে একটি সূরাও আছে। আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়তম হাবীবকেও তাঁর নাম ও গুণাবলী দ্বারা অনেক সময় বিশেষিত ও সম্মানিত করেছেন। অনেক বুর্জুগ ব্যক্তি 'তা' অর্থ শুদ্ধতা ও পবিত্রতা, এবং 'হা' অর্থ হাদী অর্থাৎ পথপ্রদর্শক বলে বর্ণনা করেছেন।

১৭. **হাবীবুল্লাহ :** যিনি আল্লাহ'র প্রিয়তম বন্ধু।

১৮. **আবদুল্লাহ :** আল্লাহপাকের সর্বাধিক অনুগত বান্দাহ। আল্লাহর নিঃশর্ত দাসত্বের প্রশ্নে যাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই।

১৯. **মুদ্‌দাস্‌সীর :** দুশমনের প্রতিও সর্বোচ্চ সহনশীলতা প্রদর্শনকারী।

www.pathagar.com

২০. **মুহাইয়্যি :** ঈমানের স্পর্শে মৃত কাল্‌বকে যিনি জীবন দান করেন।

২১. **সাফিউল্লাহ :** সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্য থেকে আল্লাহপাক কর্তৃক যিনি এককভাবে মনোনীত। স্বয়ং আল্লাহর নিকট থেকে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত। সকল অপূর্ণতা ও সকল কুশ্রীতাকে নিঃশেষে অপসারণ করে যাঁর মধ্যে দান করা হয়েছে সার্বিক পরিশুদ্ধতা।

২২. **কালিমুল্লাহ :** যিনি আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি বাক্যালাপ করেছেন। পবিত্র মিরাজ রজনীতে তিনি আল্লাহপাকের নিকটতম সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে নানা বিষয়ে ৯০,০০০(নব্বই হাজার) শব্দ ব্যক্ত করার অনন্য সৌভাগ্য লাভ করেন।

২৩. **মুজাক্কির :** বিশ্বস্রষ্টা এবং আখেরাত ও শেষ বিচারদিবসকে যিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

২৪. **মানসুর :** পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জগতে যিনি বিজয়ী ।

২৫. **নূর :** পবিত্র আলোকবর্তিকা ।

২৬. **তাইয়িব :** যিনি প্রীতিকর সৌরভে সর্বাধিক সুবাসিত। রাসূল (সাঃ)এর শরীর-মোবারক ছিল সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপের চেয়েও সুগন্ধময়। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) প্রমুখ আমাদের জননীরা রাসূল(সাঃ)এর দেহ-মোবারক থেকে নির্গত স্বেদবিন্দু সুগন্ধিরূপে ব্যবহারের জন্য শিশিতে ধরে রাখতেন। তিনি যে-পথ দিয়ে যেতেন, সেই পথের বাতাসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দেহের সৌরভ জড়িয়ে থাকতো। সবাই বুঝতে পারতো, এই পথ দিয়ে রাসূল (সাঃ) কোনদিকে গমন করেছেন।

২৭. **সাইয়ীদ :** বিশ্ব-মানবসম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেতা। অনেকে অনেকভাবে এই সাইয়ীদ নামটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তিনিই সাইয়ীদ, যিনি আল্লাহর বিচারে সর্বাধিক অনুগ্রহশীল'। কাতাদা (রাঃ)-এর মতে 'সাইয়ীদ উপাধি তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাঁর ইবাদত পরিপূর্ণরূপে খাঁটি ও নিখাদ, যিনি সর্বাধিক ধর্মনিষ্ঠ ও পবিত্র, যিনি অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ না-নিয়ে ক্ষমা করে দেন এবং এমনকি দুশমনের সঙ্গেও যাঁর ব্যবহার অত্যন্ত মধুর'। ইকরামা (রাঃ) বলেন, 'তিনিই সাইয়ীদ, ক্রুদ্ধ কি সন্তুষ্ট উভয় অবস্থাতেই যিনি একইরকম'। রাসূল (সাঃ) নিজে বলেছেন, 'আমি সাইয়ীদ, শেষ বিচার দিবসে আমি সমগ্র মানবমণ্ডলীর নেতা'।

২৮. **সাইয়ীদ আল মুরসালীন :** নবী-পরগম্বরদের যিনি নেতা।

২৯. **ইমামুল মুত্তাকীন :** খোদাভীরু মুত্তাকীদের যিনি নেতা।

৩০. **সাদীক :** বিশ্বস্ত, সত্যবাদী।

৩১. **নাবীউত্‌তাওবাহ :** সর্বাধিক তাওবাহকারী এবং সমগ্র মানবসম্প্রদায়ের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকারী ও আল্লাহ'র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।

www.pathagar.com

৩২. **শাহীদ :** আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী; সত্যের সাক্ষীদাতা।

৩৩. **তাহীর :** সর্বতোভাবে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। শুধু নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে নয়, বাহ্যিকভাবেও সকল অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে তিনি মুক্ত। তিনি তাঁর বিশ্বাস ও ইবাদতে পবিত্র, কথায় ও কর্মে পবিত্র। এবং এমনকি তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, শরীর মোবারকের স্বেদবিন্দু, থু থু, রক্ত সবই পবিত্র। ওহুদের জিহাদে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জখম হয়েছিলেন। হজরত মালিক ইবনে সিনান (রাঃ) যখন ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছিলেন, তখন রাসূল (সাঃ) তাঁকে বাধা না-দিয়ে বললেন, 'মালিক, এই রক্ত তোমাকে পৃথিবীতে সুস্থতা এবং আখেরাতে দোজখের আগুন থেকে নিরাপত্তা দান করবে'।

৩৪. **ইয়া-সীন :** পরিপূর্ণতম মানব, ইনসান-ই-কামিল; যিনি সকল মানুষের অনুসরণযোগ্য নেতা। এই নামে আল কোরআনে একটি সূরাও বর্তমান। অনেক তফসিরকার বলেন, 'ইয়া-সীন' বলতে আল্লাহ বুঝিয়েছেন, 'ইয়া ইনসান' অর্থাৎ 'হে মানব', অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের হে শ্রেষ্ঠতম মানব। সূরা ইয়াসীন-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত লক্ষ্য করলে এই রকমই মনে হয়। আল্লাহপাকই ভালো জানেন।

৩৫. **মুতাহ্হার :** আল্লাপাক স্বয়ং যাঁকে পবিত্র করেছেন। এবং 'মুতাহ্হার' হিসাবে রাসূল (সাঃ) সকল পাপ, অবিশ্বাস, পার্থিব কদর্যতা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মানবমণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ করেছেন।

৩৬. **মুবাশশির :** জান্নাত ও আল্লাহ'র রহমতের সুসংবাদ আনয়নকারী।

৩৭. **আফু :** করুণাশীল।

৩৮. **মুজ্জাম্মিল :** চাদরাবৃত। এই নামে কুরআনুল কারীমে একটি সূরা আছে ; যেখান আল্লাহপাক তাঁর রাসূলকে প্রথম আয়াতে 'ইয়া আইয়্যুহাল মুজ্জাম্মিল' অর্থাৎ ' হে চাদরাবৃত' বলে সম্বোধন করেছেন।

৩৯. **নাজীবুল্লাহ :** যিনি পরিত্রাতা। যিনি মুক্তির দিশারী।

৪০. **নাজীর :** ভয় প্রদর্শনকারী ; যিনি আল্লাহ'র ক্রোধ ও শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেন।

৪১. **শাফী :** রোগ নিরাময়কারী ; রুগ্ন হৃদয়ে সুস্থতা আনয়নকারী।

৪২. **আমীন :** পরম বিশ্বস্ত। মক্কাবাসীরা তাঁকে বলতো, 'মোহাম্মদ আল আমীন' অর্থাৎ পরম বিশ্বস্ত মোহাম্মদ।

৪৩. **মামুন :** যিনি পূর্ণমাত্রায় মানুষের আস্থাভাজন।

৪৪. **সাহিব আল ফাদীলাহ :** আল্লাহপাকের ক্ষমা ও অনুগ্রহের যিনি উৎস; এবং অনুগ্রহলাভের মাধ্যম। অর্থাৎ রাসুল (সাঃ)কে নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করার মধ্যে নিহিত রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

www.pathagar.com

৪৫. **বাআলীঘ** : আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে যিনি উপনীত হয়েছেন।

৪৬. **মুনীর** : সমগ্র বিশ্বকে যিনি আলোয় উদ্ভাসিত করেন।

৪৭. **মাহ্‌দী** : নির্ভুল পথপ্রদর্শক ; সঠিক জ্ঞান, ইবাদত ও আনুগত্যের পথে যিনি নির্ভুল দিশারী। এইজন্যই আল্লাহপাক বলেন : রাসূল যা-প্রদান করেন তা গ্রহণ করো, যা নিষেধ করেন, তা-থেকে বিরত থাকো।

৪৮. **মাতীন** : যিনি পূর্ণ দৃঢ়তা নিয়ে সত্যের পথে সর্বদা অবিচল।

৪৯. **মুবীন** : সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্দেশসহ যিনি নির্ভুল ব্যাখ্যাদানকারী।

৫০. **খলীল উর রাহমান** : পরম করুণাময় আল্লাহপাকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

৫১. **রাসুল আল মালাহীম** : আল্লাহ'র পথে সর্বস্ব নিয়ে যারা জিহাদে অবতীর্ণ হয়, সেই মুজাহিদদের জন্য যিনি সুসংবাদদাতা।

৫২. **মিসবাহ** : এমন প্রদীপ, যা-থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ঈমান এবং ইসলামের পবিত্র আলোকরশ্মি।

৫৩. **হাফী** : সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা।

৫৪. **বাশীর** : বিশ্বাসীদের কাছে যিনি সুসংবাদবাহী।

৫৫. **হাক্ক** : যিনি সত্য, এবং যিনি সত্যের অবিকল প্রতিরূপ।

৫৬. **মুকতাফী** : স্বয়ংসম্পূর্ণ ; একমাত্র আল্লাহ ছাড়া দৃশ্য-অদৃশ্য কোনো-কিছুর উপরে যাঁর কোনোরূপ নির্ভরতা নেই।

৫৭. **মাআলুম** : সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

৫৮. **মোস্তফা** : যিনি আল্লাহপাক কর্তৃক নির্বাচিত।

৫৯. **মূতা** : ঈমানদারদের অকুণ্ঠ নিঃশর্ত আনুগত্য-লাভকারী।

৬০. **উম্মী** : অক্ষরজ্ঞানহীন (Unlettered)। মানুষের মধ্যে যাঁর কোনো শিক্ষক নাই; স্বয়ং আল্লাহপাকের নিকট থেকে যিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত।

৬১. **আজীর** : যিনি মুমেনদের জন্য মহামূল্য পুরস্কার, অমূল্য সওগাত।

৬২. **মুশাফ্‌ফা** : যিনি আল্লাহ'র নিকট সুপারিশ করার অধিকারপ্রাপ্ত।

৬৩. **সিদ্‌ক** : যিনি সততা ও বিশ্বস্ততার দৃশ্যমান আধার এবং অবয়ব।

৬৪. **কাফীল** : নিশ্চয়তা প্রদানকারী।

৬৫. **সাহিব আল ওয়াসিলা** : আল্লাহপাকের ক্ষমা ও অনুগ্রহলাভের যিনি মাধ্যম, পথ ও পাথেয়।

৬৬. **সাহিব আল সায়ীফ** : আল্লাহর সকল শত্রুর মোকাবিলায় যিনি শাণিত তরবারির অধিকারী।

www.pathagar.com

৬৭. **সাহিব আল ফারজ :** উম্মতদের মধ্যে যিনি শান্তি ও সান্ত্বনার সৌরভ ছড়িয়ে দেন। দুঃখে দুর্দিনে, বিপদে মুসীবতে রাসূল (সাঃ)এর জীবন ও জীবনাদর্শই মুসলিম উম্মাহর জন্য সান্ত্বনা ও সাহসের শাশ্বত প্রেরণা।

৬৮. **সাইফুল্লাহ :** আল্লাহ'র তরবারি।

৬৯. **সাবীক :** শুভত্ব ও কল্যাণের প্রশ্নে যিনি সকল ক্ষেত্রে অগ্রগামী ও অগ্রবর্তী।

৭০. **সিরাজ :** সঠিক পথচলার জন্য উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

৭১. **মিফতাহ আল জান্নাহ :** জান্নাতের চাবি। অর্থাৎ যাঁর জীবনাদর্শের অনুসরণ ও আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে জান্নাতলাভের নিশ্চয়তা ও সৌভাগ্য।

৭২. **নিয়ামাতুল্লাহ :** বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ।

৭৩. **উরওয়াহ উস্‌কা :** আল্লাহ ও সত্যের সঙ্গে মানবের যিনি দৃঢ় সেতুবন্ধন।

৭৪. **সাহিব আল মাকান :** চরিত্রমাধুর্যে ও নৈতিকতায় সর্বোচ্চ শীর্ষদেশে যাঁর অবস্থান।

৭৫. **আইনান্ নায়ীম :** যাঁর মধ্য দিয়ে নেমে আসে আল্লাহপাকের আশীষ ও করুণাধারা।

৭৬. **আইনাল কূর :** আলো ও উজ্জ্বলতার যিনি উৎস।

৭৭. **হিদায়াতউল্লাহ :** নিখিল বিশ্বের জন্য যিনি আল্লাহ'র সওগাত।

৭৮. **সাহিব আদ দারাজাতার রাফীয়াহ্ :** সর্বোচ্চ মর্যাদায় যিনি অভিষিক্ত ; সর্বোচ্চ গৌরবান্বিত অবস্থানে যিনি অধিষ্ঠিত।

৭৯. **ফাসীহ আল লীসান :** যিনি সর্বোত্তম ভাষাশৈলী ও বাকভঙ্গির অধিকারী।

৮০. **ইজ আল আরাব :** আরববাসীদের পরমতম গৌরব।

৮১. **সাহিব আল খাতাম :** মোহরে-নবুয়তের অধিকারী, যে-মোহর তাঁর স্কন্ধদেশে স্থাপিত ছিল।

৮২. **সায়ীদ আল কাওনাইন :** পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জিন্দিগীতে যিনি সকল সৃষ্টির অবিসংবাদিত নেতা।

৮৩. **মিফতাহ :** জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত এবং দোজখের দ্বারগুলো বন্ধ করে দেয়ার চাবি।

৮৪. **মুকীম আল সুন্নাহ :** আল্লাহপাক-প্রেরিত নির্দেশাবলীর যিনি ধারক ও অনুসরণকারী। আল্লাহপাক বলেন, আপনি বলে দিন 'ইন আত্তাবিয়ু ইল্লামা ইউহা ইলাইয়া' আমার কাছে যা প্রত্যাদেশ করা হয়, আমি তারই অনুসরণ করি (সুরা আহকাফ)।

৮৫. **সিরাতউল্লাহ :** এমন পথ, যা মানুষকে আল্লাহ এবং সত্যের দিকে নিয়ে যায়।

৮৬. **মুকাদ্দাস :** যিনি সর্বতোভাবে পবিত্র, পরিশুদ্ধ।

৮৭. **মুতাওয়াক্কিল :** যিনি তাঁর সততা, বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা, সকল ইবাদত-বন্দেগী কেবল

www.pathagar.com

একমাত্র আল্লাহতে সমর্পণ করেছেন।

৮৮. **মুসলিহ** : সর্বমানবিক শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। সকল বিভেদ বৈষম্য অবিচার ও জাহেলিয়াতকে অপসারণ করে যিনি নিখিল-মানববংশের জন্য ছড়িয়ে দিয়েছেন শান্তির সুবাতাস।

৮৯. **সাহিব আল বায়ান** : নবুয়তের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ও অভিজ্ঞান কুরআনুল কারীম দ্বারা যিনি মহিমান্বিত।

৯০. **মুজতাবা** : আল্লাহপাক কর্তৃক মনোনীত।

৯১. **মুনযির** : যিনি মানুষকে পাপ ও দুষ্কর্ম থেকে সতর্ক করেন, নিবৃত্ত করেন।

৯২. **নাসীর** : সাহায্যকারী। আল্লাহ'র রাসূল (সাঃ) জীবনের শুরু থেকেই ছিলেন মানুষের সাহায্যকারী। কেউ কখনো সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর নিকট বিমুখ হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত নেই। দেবার মতো কিছু না-থাকলে, ধার করে হলেও তিনি মানুষের অভাব মোচন করেছেন।

৯৩. **শাফীক** : পরদুঃখকাতর, করুণাশীল, সহমর্মী।

৯৪. **হাদী** : পথপ্রদর্শক।

৯৫. **হিযবুল্লাহ** : আল্লাহ'র দলভুক্ত, আল্লাহ'র দুশমনদের ধ্বংসসাধনে যিনি সংকল্পবদ্ধ।

৯৬. **সিরাত আল মুসতাকীম** : আল্লাহ'র কাছে পৌঁছবার যিনি সর্বাধিক সরল ও সহজ ও সংক্ষিপ্ততম পথ।

৯৭. **কীদাম আস্ সিদ্ক** : যিনি অব্যাহতভাবে বিশ্বস্ত; যাঁর অকপট ও নিখাদ-নির্মল সততার মধ্যে অণুমাত্র সংশয়েরও অবকাশ নেই।

৯৮. **বুশরা** : শুভবার্তা। রাসুল (সাঃ) শুধু আল্লাহপাকের নাজিলকৃত সংবাদই পৌঁছে দেন-নি; এতদ্সঙ্গে তিনি নিজেও পরম অত্যুৎকৃষ্ট এক পয়গাম।

৯৯. **নাসীহ্** : সঠিক পরামর্শদাতা, যাঁর পরামর্শ সর্বদা সর্বতোভাবে নির্ভুল ও কল্যাণকর।

১০০. **সাহীব আল কাদীব** : যাঁর হাতে রয়েছে একটি দণ্ড; যা-দ্বারা মক্কাবিজয়ের দিনে রাসূল (সাঃ) কাবাশরীফের অভ্যন্তর ও চতুর্দিকে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি ভেঙ্গে দেন।

১০১. **মুকাফ্ফি** : সকল নবী ও রাসূলের নেতা হিসাবে সর্বাগ্রে যাঁর স্থান। সকল নবী-রাসূলের অবস্থান যাঁর পশ্চাতে ; এবং তাঁরা সবাই যাঁর দ্বারা সত্যায়িত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহ আমাকে সবার উপরে নেতৃত্বদানে সম্মানিত করেছেন। কোনো নবী আমার পর্যায়ে ও আমার মতো আল্লাহ'র এত নিকটে পৌঁছতে পারেন-নি। তাঁদের সবারই অবস্থান আমার পশ্চাতে।

www.pathagar.com

প্রিয়তম নবী : সর্বোচ্চ মর্যাদায় তুমি সমাসীন

নামত মুসলমান, বছর দুই-তিন আগে অসম দুঃসাহসে রাসূল (সাঃ)কে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে একজন কুশিক্ষিত ঘৃণ্য জাহান্নামী বিস্তর আত্মতৃপ্তি ও বিস্তর কুখ্যাতি লাভ করেছিল। অনেকদিন আগে ১৯৩২-৩৩ সালে শ্রদ্ধানন্দ বলে অপর এক মূর্তিপূজক জাহান্নামী একটি বই লিখেছিলো 'রঙ্গিলা রাসূল'; বইয়ে মহানবী (সাঃ)এর অনুপম চরিত্রে কালিমালেপনের গর্হিত অপচেষ্টা ছিলো। এই অপচেষ্টা আমাদের পরিচিত দাউদ হায়দার এবং বিশ্বকুখ্যাত সালমান রুশদীর কলমেও দেখা গেছে। কারো অজানা নয়, তসলিমা নাসরীনও এই অপকর্মে বিশ্বব্যাপী 'সুখ্যাতি' অর্জন করেছে। অনেক পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ অজ্ঞতা ও প্রতিহিংসাবশত রাসূল (সাঃ)কে 'কামদুর্বল' 'নিষ্ঠুর' ও 'স্বৈরাচারী' আখ্যা, দিয়েছে।

অবশ্য এসব নিয়ে কথা বলার আবশ্যকতা কম। কারণ এসব হলো জাহান্নামীদের স্বভাবসিদ্ধ অভিব্যক্তি। তবু আরেকটি কথা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করি। জীবনীকারদের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, রাসূল (সাঃ) দেখতে ছিলেন অপূর্ব সুন্দর। অবশ্য এটা কোন অভিনব বিস্ময়ের কথা নয়; তাঁর শরীর মোবারক যে অভাবনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহপাক বলেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন উৎকৃষ্টতম অবয়বে (সূরা তীন)। সাধারণভাবেই যদি মানুষ উৎকৃষ্ট অবয়বের অধিকারী হয়, তাহলে আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়তম হাবীব, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবকে যে চূড়ান্ত সৌন্দর্য সুষমা দান করবেন, দান করবেন অপার্থিব নান্দনিকতাসমৃদ্ধ এক বিস্ময়কর দেহসৌষ্ঠব, এটাই স্বাভাবিক। সাহাবীরা (রাঃ) কেউ কেউ বলেছেন, তাঁরা অনেক সময়ই পূর্ণিমার রাত্রে একবার চাঁদের দিকে, একবার আল্লাহর রাসূলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন, সৌন্দর্যের সুষমা কোন্‌দিকে অধিক বিকীর্ণ। আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু এই রাসূল (সাঃ)কে দেখেই একবার এক ঈর্ষাদগ্ধ ইহুদি বলেছিল, 'এই ব্যক্তি-তো আসলে দেখতে খুব কদাকার'। নাউজুবিল্লাহ! একজন সাহাবী এই কথা শুনে ইহুদিকে বললেন, 'শোন, আল্লাহর রাসূলকে দেখা যায় না; তিনি স্বচ্ছ মসৃণ দর্পণের মতো। তাঁর সামনে প্রতিবিম্বিত হয়ে তুমি আসলে নিজেকেই দেখছো'। জবাবটি মোক্ষম, আর এই সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহুর অনুকরণে জাহান্নামীদের মোকাবিলায় আমরাও এই জবাবই দেব এবং এতদসঙ্গে এই কথাটিও উল্লেখ করবো যে, সব দেশে সর্বকালেই এ-রকম দু-একটা মতলবি উন্মাদ থাকবেই, যাদের কাজই হলো চোখভরা অন্ধত্ব ও মাথাভরা গোময় নিয়ে শুধু প্রলাপ বকা। এরা কে এবং কী, সে সম্পর্কে আল্লাহপাক স্বয়ং যা বলেছেন, সেটাই চূড়ান্ত, 'ছুম্‌মুন বুকমুন উমইউন ফাহুম লা-ইয়ারজিউন' - অন্ধ বধির ও বাকহীন এই দুর্ভাগারা আর ফিরবে না (সূরা বাকারা)।

www.pathagar.com

কিন্তু অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের ইসলামগ্রহণের খোশনসীব হয়-নি বটে, কিন্তু তাঁরা অনেকটাই চক্ষুষ্মান। তাঁরা রাসূল (সাঃ)কে ভালোভাবে চিনতেও পেরেছেন এবং সে-কথা সর্বাধিক শ্রদ্ধা নিয়ে অকপটে প্রকাশও করেছেন। একজন-দু'জন নন, এঁদের সংখ্যা অসংখ্য; এবং আধুনিক পৃথিবীতে এঁরা মনীষীরূপে জগদ্বিখ্যাত। দু'একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা যায়, আশা হয়, আল্লাহপাকের বিশেষ অনুকম্পায় মোহাম্মদ (সাঃ)এর দুশমনরূপী আমাদের অনেক কট্টর ইসলামবৈরী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর মধ্যে অল্পাধিক পরিবর্তন আসতেও পারে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আনীত মহাগ্রন্থ সম্পর্কে গ্যেটে বলেছেন, 'This book will go on excercising through all ages a most potent influence'. 'Through all ages' অর্থাৎ সর্বকালে সর্বদেশে এই গ্রন্থের সর্বাধিক প্রভাব অক্ষত থাকবে। জি. সি. ওয়েলসও সমসাময়িক ও অনাগত কালের মানবমণ্ডলীর কাছে একটি সত্য-তথ্য দ্ব্যর্থহীনভাবে পেশ করেন, 'আরবদের ভিতর দিয়েই মানবজগৎ তার আলো ও শক্তি সঞ্চয় করেছে।' দার্শনিক কোঁতে (Comte) তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন, 'স্বাধীন চিন্তানায়ক ও যুক্তিনির্ভর ধর্মের প্রবর্তক' হিসেবে। অতি সম্প্রতি মাইকেল হার্ট তাঁকে বলেছেন 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব'। মেজর লিওনার্দ বলেছেন, 'এমন সৎ ও বিশ্বস্ত মানুষ পৃথিবী কখনো চোখে দেখেনি; যাঁর প্রশ্নাতীত বিশ্বস্ততা ছিলো নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি এবং সর্বোপরি তাঁর প্রতিপালক প্রভুর প্রতি'। জন স্টুয়ার্টের মতে, 'তিনি বিশ্ব ইতিহাসের সর্বাধিক নিষ্কলঙ্ক মানুষ'। এ-ভাবে টমাস কার্লাইল, আলফ্রেড ল্যামারতিন, জন মিলটন প্রমুখ কত-যে অসংখ্য কবি মনীষী গবেষক মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি তাঁদের সর্বোচ্চ সশ্রদ্ধ অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন, তার কোন শেষ নেই।

সকলের সব কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করলেও একটি বিশাল ও বিপুলাকার গ্রন্থ হতে পারে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যা বলেছেন, তারই কিয়দংশের উদ্ধৃতি দিয়ে এই অধ্যায়টি সমাপ্ত করতে চাই। নেপোলিয়ন তাঁর যে গভীর আস্থা ও অনুরক্তি প্রকাশ করেন, তা মুসলিম-অমুসলিম সবার জন্যই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'মোহাম্মদ ছিলেন এক যুবরাজ, যিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে নিজের পাশে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তারপর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলমানেরা অর্ধেক পৃথিবী জয় করে নিলো। এবং মাত্র ১৫ বছর, তারই মধ্যে তারা মিথ্যা দেবতাগুলোর প্রভাব নিশ্চিহ্ন করে দিলো, ধূলিসাৎ করে দিলো সকল মূর্তি ও পৌত্তলিকদের দেবালয়। এবং এই কাজ তারা করেছিলো মাত্র পনর বছরের মধ্যে, যা করতে মূসা ও যীশুর অনুসারীরা পনরশ' বছরেও সক্ষম হয় নি'। রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সর্বাত্মক বিশ্বাস নিয়েই নেপোলিয়ন আরো বলেছিলেন, 'আমি আশা করি, সেই দিন খুব দূরবর্তী নয়, যখন পৃথিবীর জ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষদেরকে একত্রিত করে একটি অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আমি সক্ষম হবো, যার ভিত্তি হবে আল-কোরআনের নীতি নির্দেশনাসমূহ। এই

www.pathagar.com

কোরআনই একমাত্র সত্য; এবং একমাত্র কোরআনই পারে মানবজাতিকে শান্তির কাছে নিয়ে আসতে'।

কিন্তু আমাদের অনেক তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর মতিগতি যেহেতু খুবই অস্থির ও দুর্বোধ্য, কে-জানে সাহেবদের সসম্ভ্রম উক্তিসমূহ তাঁরা উপেক্ষায় উড়িয়েও দিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যাঁদেরকে প্রায় দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, আশা করা যায়, তাঁদের বক্তব্য তাঁরা নিশ্চয়ই উপেক্ষা ও অবহেলা করবেন না। করলে, সেটা তাঁদের জন্য ঘোরতর স্ববিরোধিতা হবে; অবশ্য স্ববিরোধিতা ও আবশ্যকমতো বর্ণপরিবর্তন এই বুদ্ধিজীবীদের একটি ব্যসন বটে, তবু কিছু ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তাদের অন্তরে জন্ম নিলেও নিতে পারে। ঐতিহাসিক শ্রী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আজ যদি জগতের লোক সেই বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংসারপথে বিচরণ করিতে পারে, সেই পূর্ণ-কীর্তির চরিত্রকথা যদি সর্বত্র প্রচারিত হয়, তাহা হইলেই আইন-কানুনের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য হাজার হাজার প্রহরী নিযুক্ত করিবার কোনো আবশ্যকতা থাকিবে না। তাহা হইলে হিংসা দ্বেষ কলহ বিবাদ ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায়।' আচার্য কেশবচন্দ্র বলেন, 'ভারতের ব্রহ্মবাদীগণ যেন নিরন্তর এই প্রেরিত পুরুষের সম্মান করিতে পারেন, এবং তিনি স্বর্গ হইতে যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা যেন গ্রহণ করিতে সমর্থ হন।' ডক্টর তেজবাহাদুর সাপ্রু একটি খুব সাহসী মন্তব্য করেছেন, 'হিন্দুদেরকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় ইসলাম ধর্মের কতিপয় মূলনীতি আল্লাহর একত্ববাদ ও মানবের বিশ্বজনীনতা'। 'মানুষ যে অস্থির ও নরকের দিকে ধাবমান, তার একমাত্র কারণ, ইসলামের নবীর প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই'। কথাটা কোনো কবি, সাহিত্যিক বা সাধারণ মানুষের নয়, শিখ সম্প্রদায়ের অসংখ্য অনুগত ভক্তের প্রাণপুরুষ গুরু নানকের। শিশির দাস একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন 'প্রিয়তম নবী'। এই অনবদ্য গ্রন্থের ভূমিকাটুকু পাঠ করলেই বোঝা যায়, রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি কী অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ও বিনয়ে তিনি অবনত। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক কে. এস. রামাকৃষ্ণ রাও-এর একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও হৃদয়দ্রাবী প্রবন্ধেও ফুটে উঠেছে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি এক অফুরন্ত শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি। দ্বিতীয় অপর একজন রামাকৃষ্ণ রাও, যিনি এক সময়ে কেরালার গভর্নর ছিলেন, তিনি একদা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বলেছিলেন, 'মোহাম্মদ (সাঃ) বহন করে এনেছিলেন যে-পয়গাম, তা সমগ্র বিশ্বের জন্য'। লালা লাজপত রায় আরো পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, 'এ কথা ঘোষণা করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, আমি ইসলামের নবীর প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা পোষণ করি। আমার বিবেচনায় বিশ্বের সকল ধর্মীয় গুরু ও সংস্কারকের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম'। আধুনিক ভারতের রূপকার পণ্ডিত জওহরলালও রাসূল (সাঃ) ও ইসলাম সম্পর্কে অনেক অকৃত্রিম ও অকপট অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ তাঁর উক্তি উষ্মাভরে প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন; কারণ অতিরিক্ত 'বিচক্ষণেরা' এই

www.pathagar.com

যুক্তি পেশ করবেন যে, পণ্ডিত নেহেরুর সব কথাই 'ধর্তব্য' নয়। তিনি-তো এই উক্তিও মাঝে মাঝে করেছেন যে, 'তোমরা আমাকে গাধা বলো সেও ভালো, কিন্তু হিন্দু বলো না'। কিন্তু গান্ধীকেও কি অবজ্ঞা করা যায়? তিনি-তো সর্বস্বীকৃত 'মহাত্মা'; এবং তিনি, তাঁর কথার মূল্য যাতে হ্রাস না পায়, এজন্য সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত পালন করতেন। এই গান্ধী বলেন, 'মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন এমন অভাবনীয় সাহসের অধিকারী, যিনি একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে কখনো ভয় করেন নি। এমন কখনোই দেখা যায় নি যে, তিনি বলেন এক রকম কিন্তু করেন অন্যরকম। তাঁর চিন্তা ও কর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। তিনি ছিলেন নিঃসম্বল ফকির; অথচ ইচ্ছে করলেই প্রভূত সম্পদের মালিক হতে পারতেন। যখন আমি তাঁর ও তাঁর পরিবার পরিজন, সঙ্গী সাথীদের স্বেচ্ছাবৃত ব্যক্তিগত অভাব ও কৃচ্ছ্রতার কথা পাঠ করি, আমার দু'টি চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। আমার মতো একজন সত্যসন্ধানী মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা না-করে কি পারে, যিনি তাঁর সমস্ত অন্তরকে সর্বদা নিবদ্ধ রাখেন আল্লাহর দিকে, পথ চলেন আল্লাহর ভয়কে সামনে রেখে এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি যাঁর অপরিসীম মমতা'। এবং এই গান্ধী আল্লাহ'র রাসূলের জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করার পর এমন অভিভূত হন যে, পড়বার মতো আর কোনো খণ্ড হাতের কাছে না-থাকায় তিনি খুবই কষ্ট বোধ করেন।

উদ্ধৃতি আরো অনেক বাড়ানো যায়, কিন্তু সেটা বাহুল্য হবে। কারণ, আল্লাহপাক যাদের সম্পর্কে বলেছেন, 'আসলে চোখ তো অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়' তাদের বোধোদয় ঘটানো শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। তবু রবীন্দ্রনাথ কী বলেন, সেটা সবশেষে লক্ষ্য করা যেতে পারে। তিনি যেহেতু অনেকেরই আরাধ্য দেবতা, তাঁর কথায় আমাদের মৃত-কলব-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যথাযথ বোধোদয় না ঘটুক, রাসূল (সঃ)কে নিয়ে তাদের অন্ধত্ব ও অসূয়াপ্রসূত যে-অবাধ উদ্ধত বুরবাকি, তার কিছুটা অন্তত আশা করা যায়, উপশম হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'জগতের এখন বড় প্রয়োজন (মোহাম্মদ (সাঃ) এর মতো) একজন মহামানবের, যাঁর শক্তি ও গভীর প্রজ্ঞা পৃথিবীতে মানবগোষ্ঠীর জন্য সহজ ও স্বাভাবিক সত্যের পুনরাবিষ্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম'।

অবশ্য এতসব উদ্ধৃতি তুলে ধরা বর্তমান নিবন্ধকারের মূল লক্ষ্য নয়। অনেকের অনেক কথা উপস্থাপন করা হলো শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, রাসূল (সাঃ)এর নক্ষত্রচুম্বী মহত্ত্ব ও মহিমা শুধু মুসলমানের কাছে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছেই আলো ও ভালোবাসার এক অফুরান সম্পদ। সত্যই আল্লাহপাকের যে-ঘোষণা, তার কার্যকারিতা কত অমোঘ ও শাশ্বত! কতকাল আগে সেই কোরআন নাজিল হওয়ার প্রথম সময়ে আল্লাহপাক বলেছিলেন, 'ওয়া রাফানা লাকা জিকরাক' আপনার নামকে সুউচ্চে তুলে ধরা হয়েছে (সূরা ইনশিরাহ)। সকল কালের মুসলিম-অমুসলিম অসংখ্য মানুষের সশ্রদ্ধ অভিব্যক্তির মধ্যে সেই ঘোষণারই নিরন্তর অনুরণন। সেই-যে রাসূল (সাঃ)-এর জন্মের পর থেকে

www.pathagar.com

অদ্যাবধি কত কবি কত মনীষী কতভাবেই-না কত ভাষায় প্রশংসাকীর্তন করলেন; কিন্তু প্রশংসার শেষ নেই, প্রশংসাজ্ঞাপনের কথারও শেষ নেই। আসলে মানুষের শক্তি ও অনুভবশক্তির একটি সীমাবদ্ধতা আছে, ভাষাশৈলীরও আছে। অতএব মানুষ যত যা-ই বলুক, রাসুল (সাঃ)এর অনুপম সৌন্দর্যের বর্ণনা তার সাধ্যের অতীত। এইজন্যই আল্লাহপাক স্বয়ং তাঁর হাবীবের যথার্থ পরিচয় এমনভাবে আল কোরআনে উপস্থাপন করেছেন, যা-থেকে মানুষ সম্যক অনুধাবন করতে পারে, রাসূল (সাঃ)-এর মর্যাদা কী নিঃসীম সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ বলেছেন, 'ওয়ামা আরসাল্‌নাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন' বিশ্বজগতের রহমতস্বরূপ আপনি প্রেরিত (সুরা আম্বিয়া)। একটি ছোট্ট সংক্ষিপ্ত বাক্য; কিন্তু সারা পৃথিবীর সকল মানুষ তাদের বুকভরা সম্মিলিত প্রজ্ঞা ও অনুরাগ নিয়েও এই কথা আবিষ্কার করতে পারতো না। 'ইন্নাকা লাআলা খুলুকীন আজীম', নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম স্বভাবের উপর অধিষ্ঠিত (সূরা কলম); এমন সহজ কিন্তু প্রশংসার এমন অভাবনীয় সৌকর্য, এমন অনবদ্য ভাষারূপ লক্ষ প্রাণের মুহাব্বত একত্রীভূত করেও আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আল্লাহপাক যাকে বোধশক্তি দিয়েছেন, সেই মানুষ কেবল এ-টুকু বোঝে, রাসূল (সাঃ) অত্যুচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু সেই অত্যুচ্চতা কতখানি, সেটা তার ধারণার বাইরে, প্রকাশ ক্ষমতার তো বটেই। অথচ আল্লাহপাক যখন বলেন, 'ওয়া মাকানাল্লাহু লিইউয়াজ্জিবাহুম ওয়া আন্‌তাফিহিম' আপনি উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না (সূরা আনফাল); আমরা বুঝতে পারি, তাঁর প্রকৃত মর্যাদা এবং বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর রহমতস্বরূপ তাঁর অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞান কত প্রশ্নাতীত!

আল্লাহপাক তাঁকে পাঠিয়েছিলেন মানুষকে সাবধান করবার জন্য, অনন্তদিনের জাহান্নাম থেকে বাঁচাবার জন্য, ইবলিসের মনোরম হাতছানি থেকে সতর্ক করবার জন্য। তেইশ বছরের নবুয়তি জিন্দিগীতে তিনি চব্বিশ ঘণ্টা এই কাজেই নিয়োজিত ছিলেন; কিন্তু বহু মানুষের দুর্ভাগ্য, তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করে নি। বহু দুর্ভাগা আবু লাহাব, আবদুল্লাহ বিন উবাই জাহান্নামকেই তাদের প্রকৃষ্ট ঠিকানা হিসাব বেছে নিয়েছে। স্বভাবতই, রাসূল (সাঃ)এর মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে, এটা হয়ত তাঁরই কোনো ব্যর্থতা। কিন্তু না, আল্লাহপাকের কাছে তাঁর ভূমিকা এমন শত-শতাংশ যথাযথ বলে গৃহীত হয়েছে, বিবেচিত হয়েছে এত প্রিয়, যে-কারণে আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'ইন্না আরসাল্‌নাকা বিল হাক্কি বাশিরাঁউ ওয়া নাজীরা ওয়ালাতুছআলু আন আছহাবীল জাহীম'- নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি; এবং জাহান্নামীদের সম্পর্কে আপনাকে কোনরূপ প্রশ্ন করা হবে না (সূরা বাকারা)। আল্লাহপাকের এই-যে অগ্রিম ঘোষণা, এ-এক অভাবিত সম্মানের সনদ, যা

www.pathagar.com

স্বয়ং আল্লাহপাক কর্তৃক স্বাক্ষরিত। কোনো মানুষের-তো প্রশ্নই ওঠে না, দ্বিতীয় কোনো নবী-রাসূলকেও আল্লাহ তাঁর এই সনদ প্রদান করেন নি। 'ওয়ামা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুজুহু ওয়ামা নাহাকুম আনহু ফান্‌তাহু' রাসূল যা প্রদান করেন তা গ্রহণ করো, যা নিষেধ করেন তা-থেকে বিরত থাকো (সূরা হাশর)। এমন নিঃশর্ত আনুগত্যলাভের অধিকার পৃথিবীতে আল্লাহপাক দ্বিতীয় আর কাউকে দেন নি।

আল্লাহ তাঁর নিজের পক্ষ থেকে এই-যে ঘোষণা প্রদান করলেন, তার কারণ মোটামুটি দু'টি। এক. বিশ্বমানবগোষ্ঠীর জন্য রাসূল (সাঃ)কে নিঃশর্তভাবে মেনে নেয়া ও তাঁকে অনুসরণ করা ফরজ; এবং দুই. মানুষের অনুভবশক্তি ও প্রকাশক্ষমতার সীমাবদ্ধতাহেতু রাসূল (সাঃ)এর প্রকৃত মূল্য ও মহত্ত্বের যথাযোগ্য পরিমাপ ও ভাষা-দানের অক্ষমতা। আল্লাহপাক বিশ্ব-ইতিহাসের পটে রাসূল (সাঃ)কে শুধু অবিনশ্বর ও শাশ্বতরূপেই স্থাপন করেন-নি, এতদ্‌সঙ্গে ছোট ছোট বাক্য ও শব্দবন্ধের মধ্য দিয়ে তাঁর নক্ষত্রচুম্বী গরিমা ও অনন্তস্পর্শী মহিমাকেও পূর্ণরূপে উপস্থাপন করলেন।

ভাষা কোনো মানুষের সৃষ্টি নয়। ভাষা ও প্রকাশশৈলী আল্লাহপাকের একটা নেয়ামত। এটা ভাষাসৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন সত্য, ভাষা-ব্যবহারে মানুষের ব্যক্তিগত কুশলতার ক্ষেত্রেও সত্য। আল্লাহপাকের অশেষ করুণা যে, তিনি কেবল নিজে তাঁর হাবীবের প্রশস্তি বর্ণনা করে থেমে যান-নি, তাঁর অনেক প্রিয় বান্দাহদের মুখেও ভাষা জুগিয়ে দিয়েছেন। এমনকি অনেক কাফেরের মুখেও অত্যুচ্চ ও স্থায়ী প্রশংসাবাক্য উচ্চারিত হয়েছে। মক্কাবাসীরা রাসূল (সাঃ)-এর নবুয়তলাভের অনেক আগে থেকেই তাঁকে বলতো 'আল আমীন' অর্থাৎ পরম বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। পৃথিবীতে বহু মনীষীর জন্ম হয়েছে। 'ঋষি' 'মহর্ষি' 'Saint' 'সাধূসন্ত' 'পরমহংস' ইত্যাদি কত অভিধায়ই কত মানুষ অভিহিত হয়েছেন; কিন্তু 'আল আমীন', চরিত্রের এমন পরম ও নিখাদ মহিমান্বিত বিশেষণটি মোহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া আর কেউ কখনো পায় নি। এবং আশ্চর্যের কথা যে, এই উপাধি তিনি লাভ করেছিলেন মক্কার আপাদমস্তক পথভ্রষ্ট জাহেল মূর্খদের নিকট থেকে। এবং আরো আশ্চর্যের কথা, নবুয়ত-লাভের পর যখন এই উপাধিদাতারা তাঁর প্রাণঘাতী দুশমনে পরিণত হলো, তখনো কিন্তু এই 'আল আমীন' উপাধি তারা প্রত্যাহার করে নেয় নি। তারা কেউ কখনো বলে-নি, বলবার চিন্তাও কারো মনে উদয় হয় নি যে, 'মোহাম্মদ মিথ্যাবাদী বা অবিশ্বস্ত'। বরং আবু জেহেলের মতো কট্টর দুশমনও কখনো কখনো বলতো, 'ভাতিজা, তোমাকে আমরা মিথ্যাবাদী বলি-না, অবিশ্বাসও করি না, কিন্তু তোমার কথা আমাদের পক্ষে মেনে নেয়া অসম্ভব'। এ-থেকেই বোঝা যায়, রাসূল (সাঃ)-এর চরিত্রমাধুর্য মানবকল্পনার সম্পূর্ণ অতীত কী-উচ্চতম শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত! রাসূল (সাঃ) হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)কে সঙ্গে নিয়ে সেদিন হিজরতের পথে। পথিমধ্যে উম্মে মাবাদ নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলার তাঁবুতে সামান্য সময়

www.pathagar.com

বিশ্রাম করে তাঁরা আবার মদীনার পথে যাত্রা করলেন। এই মহিলা সাধ্যমত সমাদর করেছিলেন, কিন্তু তিনি ইসলামের কথাও জানেন-না, রাসূল (সাঃ)কেও চেনেন না। অথচ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর চিত্ত যে-এক অপার্থিব সশ্রদ্ধ অনুরাগে আন্দোলিত হলো, সেই অভিব্যক্তি সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের এক অনুপম সম্পদ হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। মহিলার স্বামী তখন তাঁবুতে ছিলেন না, স্বামী ফিরে এলে মহিলাটি বললেন, 'আজ তাঁবুতে দু'জন ব্যক্তি এসেছিলেন; তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অসাধারণ শোভমান পুরুষ। তিনি হ্রস্ব নন দীর্ঘও নন, একজন পুরুষের যে-আকৃতি হলে সর্বাধিক সুন্দর ও প্রাণবন্ত বলে প্রতীয়মান হয়, তিনি ছিলেন সেই রকম। তাঁর দৃষ্টি ছিল করুণাময়, পদক্ষেপ ছিলো ধীর ও শান্ত; একটি আশ্চর্য প্রভা ও প্রজ্ঞায় তিনি ছিলেন আলোকিত।' আশ্চর্যই বটে, একজন নিরক্ষর বেদুইন মহিলার মুখনিঃসৃত কী-অসাধারণ প্রশস্তি!

বলাই বাহুল্য, এই প্রশস্তি রাসূল (সাঃ)-এর জন্মের পর থেকে অদ্যাবধি মুসলিম-অমুসলিম সকল দেশে সকল জনপদে অবিরাম একইভাবে রচিত হচ্ছে, নিত্যনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে। শেখ সাদীর (রাঃ) মাতৃভাষা ছিলো ফারসি, কিন্তু বিশুদ্ধ আরবিতে কী হৃদয়-নিংড়ানো একটি চতুষ্পদী না'ত রচনা করলেন, যা রাসূলপ্রেমী মুমেনের মুখে ও অন্তরে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত, কখনো একক কণ্ঠে কখনো সম্মেলক ঐকতানে, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে-

'বালাগাল উলা-বি কামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি
হাসুনাত্ জামিউ খিসালিহি
সাল্লু আলাইহি ওয়ালিহি'।

পৃথিবী কবিতা কম দেখে নি; কিন্তু এমন শাশ্বত অবিনশ্বর কাব্যপংক্তির কোনো তুলনা নেই; কোটি কোটি কণ্ঠে কোটি কোটি বার উচ্চারিত হয়েও যার রং এতটুকু ফিকে হয় না, সৌরভ এতটুকু নিষ্প্রভ হয় না। এটা শেখ সাদীর কৃতিত্ব নয়; এটা আল্লাহপাকের অভিপ্রায়, এটা রাসূল (সাঃ)এর পবিত্র শান। আমাদের নজরুল ইসলামও রাসূল (সাঃ)কে নিয়ে বহু বর্ণময় অসাধারণ গীতপংক্তি রচনা করেছেন। নজরুলের নানা ধরনের রচনার সংখ্যা কম নয়, বলা উচিত বিশাল তাঁর রচনাসম্ভার। কিন্তু কেউ স্বীকার করুক না-করুক, সেই সব রচনা নান্দনিক মানে উৎকৃষ্ট হয়েও কালের স্রোতে সবই একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে, ইতোমধ্যে অদৃশ্য হয়েও গেছে অনেক। কিন্তু আশা করা যায়, আল্লাহপাক অমর ও অক্ষত করে রাখবেন তাঁর হাবীবকে নিয়ে রচিত নজরুলের কিছু গান ও গানের চরণ। অনেকে বোঝে অনেকে বোঝে-না, রাসূল (সাঃ)এর এটাও এক আশ্চর্য শান, এক অন্যতম বিরাট মোযেজা যে, তাঁকে নিয়ে মানুষের যে-কোনো

www.pathagar.com

ক্ষুদ্রতম আন্তরিক কাজও অমরত্ব লাভ করে। নজরুল ইসলামের কত গান কত কবিতা, কিন্তু রাসূল (সাঃ)এর প্রশস্তিমূলক না'ত রচনায় নজরুল বাংলাভাষায় এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নমুনাস্বরূপ একটি গান পুরো উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি নাঃ

'মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে ॥
তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে ॥
ওরে গোলাব নিরিবিলি
বুঝি-নবীর কদম ছুঁয়েছিলি
তাই-তার কদমের খোশবু আজো তোর আতরে জাগে ॥
মোর নবীরে লুকিয়ে দেখে
তাঁর পেশানীর জ্যোতি মেখে
ওরে ও চাঁদ রাঙলি কি তুই গভীর অনুরাগে ॥
ওরে ভ্রমর তুই-কি প্রথম
চুমেছিলি নবীর কদম
আজো-গুনগুনিয়ে সেই খুশি-কি জানাস রে গুলবাগে ॥

অপূর্ব, অসাধারণ! জীবনে অনেক গান শুনেছি পড়েছি, নিজেও লিখেছি, কিন্তু এমন আর হয় না। সত্যই মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নামের কী-মহিমা, কী গগনস্পর্শী শান যে, কবিকে একদিন মানুষ ভুলে গেলেও যেতে পারে, কিন্তু এই ধরনের লাইনগুলো বড় মুহাব্বত নিয়ে মুসলমান বহুদিন মনের মণিকোঠায় মহার্ঘ মুক্তোর মতো আগলে রাখবে।

অবশ্য এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি হলেন আল্লামা ইকবাল। রাসূল (সাঃ)এর সুউচ্চ মর্যাদার কথা, তাঁর প্রতি প্রেম ও অনুরাগ ও মুহাব্বতের কথা অনেকের মুখে অনেক শুনেছি, সে-সবও মূল্যবান, কিন্তু সদ্যবিগত পুরো বিংশ শতাব্দীতে আল্লামা ইকবাল অদ্বিতীয়। অনুমান করি, সদ্যসূচিত একবিংশ শতাব্দীতেও তিনিই অদ্বিতীয় থাকবেন। ইকবালের বহু কাব্যপংক্তি আল্লাহ'র রাসূলকে নিয়ে রচিত; তার মধ্যে ভাষাশৈলী আছে, নান্দনিকতা আছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় যে-জিনিস, সেটা হলো বুকের মধ্য থেকে একেবারে অক্ষত হৃৎপিণ্ডটাকেই যেন পেশ করা হয়েছে। যেন ভাষা নয়, যেন শুধু আবেগ ও অনুরাগের প্রবাহ নয়, কোন্ সুদূর জান্নাত থেকে নিস্বনিত যেন এক সৌরভ ও সংগীত। 'দরদিলে মুসলিম মকামে মুস্তফা আস্ত, আবরুএ মা যে নামে মুস্তফা আস্ত' অর্থাৎ যে মুসলমানের হৃদয়ে মুস্তফার বাস, ওই নামের আলোয় সমুজ্জ্বল তার মুখশ্রী।

'খীরা না কর সেফা মাগরিব কি দাও অ দানেশ,
সুরমা থা আঁখ কা মেরা খাকে মদীনা'।

www.pathagar.com

অর্থাৎ
'পাশ্চাত্যের চাকচিক্য
আমার চক্ষুকে প্রতারিত করতে পারে নি,
কারণ মদীনার ধূলিকণা
আমার দু'চোখে জড়িয়ে ছিলো সুরমা হয়ে'।

রাসূল (সাঃ)-এর সুউচ্চ মর্যাদার কথা-তো অনেক দূরের বস্তু, তাঁর পুণ্য-পদস্পর্শে ধন্য মহিমান্বিত মদীনার ধূলিকণাও পদ্মরাগমণির চেয়ে মূল্যবান; সকল কুহক ও বিভ্রম ও বিভ্রান্তির অব্যর্থ প্রতিষেধক। সত্যই আল্লাহ'র নবীর প্রশস্তি-বন্দনায় কী প্রগাঢ় মুহাব্বতের পরাকাষ্ঠা!

এই পরাকাষ্ঠার আরো অনেক উজ্জ্বল উদাহরণ ছড়িয়ে আছে রাসূল (সাঃ)-এর সমসাময়িক বহু সাহাবী-কবি ও তৎপরবর্তী বহু তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীনের কবিতায়। বিশেষ করে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ), কবি ইবনে মালিক (রাঃ) ও হাসসান বিন সাবিতের (রাঃ) অনেক কবিতায় যে-রাসুলপ্রশস্তি, তা শুধু অনুপম কি অনবদ্য নয়, রীতিমত এক বহু উচ্চমার্গের আনুগত্য ও অতলান্তিক মুহাব্বতের অক্ষয় প্রতিধ্বনি। তবে সর্বাপেক্ষা পরম ও চরম ও সর্বোচ্চ প্রশংসার এক অভিব্যক্তি পেলাম আমাদের জননী মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহার কাছে। তিনি বললেন —

'মিশরের মহিলারা
ইউসুফের সৌন্দর্যদর্শনে অভিভূত হয়ে
তাদের নিজেদের আঙ্গুল কেটে ফেলেছিলো।
সেই মহিলারা যদি
আমার প্রিয়তমের চরিত্রমাধুর্য অবলোকন করতো
তাহলে তারা তাদের
হৃৎপিণ্ডই কর্তন করে ফেলতো'।

একটুও অতিশয়োক্তি নয়। বরং এটাই সত্য যে, রাসূল (সাঃ)-এর সৌন্দর্য ও মর্যাদা ও চারিত্রিক মাধুর্যের যে-সুউচ্চ প্রতিষ্ঠা আল্লাহপাক দান করেছেন, তার বর্ণনায় কোনো কবি কোনো প্রেমিক এখনো তার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারে নি। পারার কথাও নয়। কারণ আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'ছিবগাতাল্লাহ ওয়া মান আহছানু মিনাল্লাহি ছিবগাতাঁউ ওয়া নাহ্নু লাহু আবিদুন'- তোমরা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও, আল্লাহর রঙ অপেক্ষা আর কার রঙ উত্তম এবং আমরা তাঁরই ইবাদত করছি (সূরা বাকারা)। এই আয়াতের নিখুঁত ও নির্ভুল ও বিশ্বস্ততম প্রতিবিম্ব কে? নিঃসন্দেহে আল্লাহ'র প্রিয়তম হাবীব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম। অতএব আল্লাহপাকের রঙে সর্বচিত্ত সর্বাঙ্গ রঞ্জিত এই রাসূল (সাঃ)-এর প্রশস্তি রচনায় মানুষ আর কতখানিই

www.pathagar.com

সাফল্য লাভ করতে পারে! 'ক্বাদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূরুঁউ' আল্লাহপাকের তরফ থেকে এসেছে এক আলোকবর্তিকা (সূরা মায়িদা)। যত প্রতিভাবানই হোক, যতই অধিষ্ঠিত হোক মারেফাত ও কামালিয়াতের সুউচ্চ মকামে, মানুষের সাধ্য কী যে, তার ছোট্ট ক্ষীণশক্তি মাটির প্রদীপ নিয়ে ভুবনপ্লাবী এই আলোকবর্তিকার প্রশস্তি রচনা করে! আল্লাহপাক নিজে এবং তাঁর অগণিত ফেরেশতা যাঁর উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করেন, আমাদের সীমাবদ্ধ ভাষাশক্তির আধারে তাঁকে-কি ন্যূনতম মাত্রায়ও তুলে ধরা যায়? অসম্ভব, একেবারে পুরোপুরিই অসম্ভব।

কিন্তু অসম্ভব হলেও আমাদের চেষ্টা নিরর্থক নয়। একটি ছোট্ট উপমার অবতারণা করতে পারি। পৃথিবী নামক এই গ্রহটি অনেক বড়। জলস্থল সমুদ্র মহাসমুদ্র নদী অরণ্য হ্রদ মরুভূমি পর্বতমালা ইত্যাদি নিয়ে কী-বিশাল এই পৃথিবী, যার ব্যাসই আট হাজার মাইল, পরিধি পঁচিশ হাজার। উত্তর মেরু,দক্ষিণ মেরু বিষুবরেখা, কত দেশ, মহাদেশ নিয়ে এক ধারণাতীত বিশাল আয়তনের এই পৃথিবী। কিন্তু স্কুল পাঠরত কিশোর-কিশোরীদের সামনে শিক্ষক তুলে ধরেন ফুটবলের মতো একটি কমলাকৃতি গ্লোব। কোথায় গ্লোব আর কোথায় পৃথিবী। তবু এই ছোট্ট গ্লোবটির মধ্য দিয়েই কিশোরমনে পৃথিবীর আকার আয়তন ও বিশালতা সম্পর্কে একটু একটু ধারণা তৈরি হয়।

অনেকটা এই রকমই। আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়তম নবী মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে যা-বলার তা চূড়ান্তভাবে কোরআনপাকে এরশাদ করেছেন, কিন্তু তাঁর অপর একটি অভিপ্রায়ও আছে। তিনি চান, মানুষও কিছু বলুক ; ক্ষুদ্রাকৃতি গ্লোবের মতো করে হলেও, মানুষ রাসুল (সাঃ)এর মর্যাদার নক্ষত্রস্পর্শী উচ্চতাকে নিজের প্রাণে ও প্রণয়ে যথাসাধ্য অনুধাবন করুক। তাঁদের খোশসীব, আল্লাহপাক যাঁদেরকে এই ক্ষেত্রে ভাষা দিয়েছেন, হৃদয় দিয়েছেন, বুকভরা মুহাব্বত দিয়েছেন। বর্তমান নিবন্ধকার এই আমারও খোশনসীব ! আমার কিছুই নেই, আল্লাহপাক স্বীয় অনুগ্রহে আমার বিপুল অক্ষমতার মধ্যেও একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার তওফিক এনায়েত করলেন। লাখো কোটি শুকরিয়া আল্লাহপাকের উদ্দেশ্যে। যাঁরা ভাগ্যবান, তাঁরা কতভাবে কত দরদমাখা ভাষায় রাসূল (সাঃ)এর প্রতি প্রশস্তি নিবেদন করেছেন, কিন্তু আমি কী বলি ? আমি শুধু বলি, আল্লাহপাক-যে আমাকে জন্মসূত্রে তাঁর প্রিয়তম হাবীবের একজন নগণ্যতম উম্মত হিসাব পরিচয় দেবার সৌভাগ্য দান করেছেন, এটাই আমার ইহকাল-পরকালের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, শ্রেষ্ঠতম গৌরব।

www.pathagar.com

[পরিশিষ্ট]

নবী মোহাম্মদ (সাঃ)

মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে মোহাম্মদ (সাঃ) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে মরুময় আরবভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। 'মোহাম্মদ', এই নামের অর্থ 'সর্বোচ্চ প্রশংসিত'। আসলেও তাই, আমার বিবেচনায় আরবের শ্রেষ্ঠতম ও সুউচ্চতম ও মহত্তম আত্মার অধিকারী এই সন্তান। এবং এই কথার অর্থ, তাঁর আগে ও পরে রক্তাভ বালুকাকীর্ণ অপরাজেয় আরব্য মরুভূমিতে যত কবি কি সম্রাট জন্মগ্রহণ করেছেন, কোন সন্দেহ নেই, তাঁদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁরই স্থান সর্বশীর্ষে।

নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবকালে আরবদেশ একটি মরুভূমি মাত্র - নিতান্ত ই শূন্য বিশুষ্ক এক মরুভূমি। কিন্তু এই নিরঙ্কুশ শূন্যতার মধ্য থেকে মোহাম্মদ (সাঃ) এর সর্বজয়ী পরম আধ্যাত্মিকতার কল্যাণস্পর্শে জেগে উঠলো এক নতুন পৃথিবী, জেগে উঠলো নতুন জীবন ও সংস্কৃতি, এক নবীনতম সভ্যতা, যে প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো তিন মহাদেশ, এশিয়া আফ্রিকা ও ইয়োরোপের চিন্তায় ও জীবনে ও মানসতায়; এবং প্রতিষ্ঠিত হলো এমন এক নতুন সামাজ্য, যা মরক্কো থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ও সম্প্রসারিত।

কিন্তু নবী মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কিছু লিখবো, এইকথা ভাবলেই আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। দ্বিধাগ্রস্ত, কারণ এ এমন এক ধর্ম সম্পর্কে লেখা যে-ধর্মে আমি নিজে দীক্ষিত নই। তাছাড়া এটা একটা সূক্ষ্ম ও নাজুক ও সংবেদনশীল বিষয়ও বটে, কারণ বহু মানুষ বহু ধর্মে যেমন দীক্ষিত, তেমনি নানারূপ চিন্তা-দর্শনেরও অনুগামী, এবং একই ধর্মের মধ্যে নানাবিধ বিভক্তিও বিরাজমান। যদিও কখনো কখনো এই দাবী প্রাধান্য লাভ করে যে, ধর্ম নিতান্তই একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, কিন্তু এই সত্যও অস্বীকার করা অসম্ভব যে, ধর্মের একটি মৌলিক প্রবণতা হলো, দৃশ্যমান কি অদৃশ্য-সমগ্র বিশ্বজগতকেই আপনার মধ্যে আত্মস্থ করা, এবং যেভাবেই হোক, ধর্ম যেহেতু এক অন্তর্গামী শক্তির অধিকারী, সে আমাদের হৃদয় মন ও আত্মার চেতন অচেতন ও অবচেতন স্তরে প্রবেশ করতে পারে ও করে। সমস্যা আরো সর্বপ্লাবী গুরুত্ব বহন করে, যখন এই গভীর বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে যে, আমাদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই কোমল ও সূক্ষ্ম এক মনোরম রেশমি-রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ। এবং আমরা যদি আর একটু অধিক স্পর্শকাতর হই, আমাদের অন্তর্মধ্যস্থ মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু একটি অসম্ভব মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে। অতএব এই সকল দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য ধর্ম সম্পর্কে যত কম বলা যায় তত ভালো। কারণ ওষ্ঠের উপর একটি শক্ত সীলমোহর আমাদের অন্ত

www.pathagar.com

র্জগতকে যে-কোন বহিরাক্রমণ থেকে যেমন নিরুপদ্রব রাখতে পারে, ধর্মকেও তেমনি গভীর ও অপ্রবেশ্য গোপনতার মধ্যে রাখতে পারে অক্ষত।

কিন্তু এই সমস্যার অন্য একটি দিকও বর্তমান। মানুষ এক সমাজবদ্ধ জীব। ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, পরোক্ষ কি সরাসরি আমাদের অস্তিত্ব বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত। একই ভূমিতে উৎপাদিত ফসল আমাদের খাদ্য, একই প্রস্রবণ থেকে আমরা আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করি এবং একই বায়ুতে আমাদের জীবনধারণ। তাই এমনকি আমরা যখন একান্তভাবেই আমাদের স্বমতের কট্টর ও আপসহীন ধারক, তখনো পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেয়া কল্যাণকর। আমাদের যারা প্রতিবেশী, তাদের মন কখন কী কারণে তরঙ্গায়িত হয়, তাদের কর্মপ্রবাহের মূল সূত্র ও প্রবণতাগুলি কী রকম, এইসব যদি অন্তত কিছু পরিমাণেও জানতে পারি, আমাদের অনেক লাভ। এইদিক থেকে এটা বিশেষভাবে কাঙ্ক্ষিত যে, আমরা আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমঝোতা বৃদ্ধিকল্পে, নিকট কি দূরবর্তী যাই হোক, এক মধুর ও সখ্যময় প্রতিবেশিতার স্বার্থে বিশ্বের সকল ধর্মকেই জানবার চেষ্টা করবো। অধিকন্তু আমাদের ভাবনার সূত্রগুলি দৃশ্যত উপর থেকে যতটা বিক্ষিপ্ত বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা নয়। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের নিয়ন্ত্রক ও চালিকাশক্তি যে-ভাবনাগুলি তারা আসলে বিচ্ছিন্ন নয়, তারা কয়েকটি বৈশ্বিক ধর্মচেতনা ও জীবন্ত কিছু বিশ্বাসের অবয়বে আমাদের অন্তর্নিহিত কেন্দ্রস্থ কতিপয় বিন্দুর চারপাশে ঘনীভূত। এবং আমরা যদি বিশ্বনাগরিকত্বে বিশ্বাস করি তাহলে এটা আমাদের কর্তব্যও বটে যে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মবিশ্বাস ও তার দার্শনিক পদ্ধতি, যা সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবার চেষ্টা করা।

অবশ্য এই প্রাথমিক মন্তব্য কি বিবেচনা সত্ত্বেও, ধর্মবিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রটি বুদ্ধি ও আবেগের পারস্পরিক বৈরিতাহেতু এতটাই পিচ্ছিল যে, সততই শুধু মনে পড়ে, 'দেবদূতেরা যে পথে চলতে আতঙ্ক বোধ করে নির্বোধেরা সেখানে ভীড় জমায়'। অবশ্য অন্য একদিক থেকে কাজটা খুব জটিলও নয়, কারণ এমন এক ধর্মের নীতিসমূহ আমার আলোচনার বিষয়, যে ধর্ম ঐতিহাসিক এবং যার প্রবর্তক একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। এমনকি স্যার উইলিয়াম মূরের মত একজন বৈরী সমালোচকও কোরআন শরীফ সম্পর্কে বলতে বাধ্য হন, 'পৃথিবীতে সম্ভবত এমন আর একটিও গ্রন্থ নেই যা বারো'শ বছর ধরে এমন বিশুদ্ধ ও অবিকৃত রূপ নিয়ে বিরাজমান'। আমি এই সঙ্গে এই কথাও যুক্ত করতে পারি যে, নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এমন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনা অতীব যত্ন ও সীমাহীন সতর্কতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ, এমনকি তাঁর জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম ও আরচণগুলিও উত্তরকালের জন্য সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষিত। তাঁর জীবন এবং কর্ম কিছুই কিছুমাত্র রহস্যের আবরণে আচ্ছাদিত নয়;

www.pathagar.com

সবকিছুই এত সুস্পষ্ট অবিকৃত ও তথ্যানুগ, এত সুরক্ষিত ও সুবিন্যস্ত যে, সঠিক তথ্যের জন্য আজ আর কাউকে গবেষনায় প্রবৃত্ত হতে হয় না, সত্য-উদ্ধার কি উদঘাটনে দুরূহ কোন অভিযানেও নামতে হয় না। প্রাপ্ত তথ্যাদি এত নির্ভুল এত খাঁটি যে, খোসা ছাড়িয়ে কি আবর্জনামুক্ত করে সত্যের দানাগুলিকে আলাদা বেছে নেবার দরকার পড়ে না।

তাছাড়া আমার এইকাজ এখন কিছুটা সহজ, কারণ রাজনৈতিক কি অন্য কোন কারণে কিছু কিছু সমালোচক একদা ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিল, সেই ভূমিকা এখন নিষ্প্রভ এবং ইসলাম সম্পর্কিত প্রমাদবহুল আলোচনার সেই দিনগুলিও এখন দ্রুত অস্তমিত হচ্ছে। প্রফেসর বেভান তাঁর 'ক্যামব্রীজ মধ্যযুগের ইতিহাসে' যথার্থই উল্লেখ করেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং ইসলাম সম্পর্কে ইয়োরোপে যা-কিছু ছাপা হয়েছে, তা সবই এখন শুধু সাহিত্যিক কৌতূহলের উপজীব্য মাত্র'। অতএব এই নিবন্ধ রচনায় আমার যে সমস্যা, সেই ভার আজ অনেকখানি লঘু ও সহজ অনুভব করি, কারণ ওই ধরনের ইতিহাস আজ আর বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না এবং তা নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করারও প্রয়োজন নেই।

উদাহরণত, ইসলাম যে তরবারি-নির্ভর এই ধরনের মন্তব্য কোন উল্লেখযোগ্য মহল থেকে আজ আর তেমন শোনা যায় না। ধর্মে কোন প্রকার জবরদস্তি নেই, এটাই ইসলামের একটি সুপরিচিত নীতি। অথচ বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন বলেছিলেন, 'ইসলামের একটি ক্ষতিকর নীতি হলো তরবারির সাহায্যে সকল ধর্মকে উৎখাত করা'। উল্লেখ করা বাহুল্য, এই অভিযোগ নিতান্তই গোঁড়ামি ও অজ্ঞতাপ্রসূত। এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিকেরাও এই কথাই বলেন যে, এই ধরনের কোন অভিযোগের সামান্যতম ভিত্তিও কোরআন শরীফে নেই। এবং খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি বিজয়ী মুসলিম জাতির যে সার্বিক আচরণ, আইন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে সহিষ্ণুতা তা থেকেও প্রমাণিত হয়, এই অভিযোগ কত অসার ও অন্তঃসারশূন্য। প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদ (সাঃ)এর জীবনের যে অসাধারণ সাফল্য, তার সঙ্গে তরবরির কোন সম্পর্ক নেই; সেই সাফল্য একমাত্র তাঁর নৈতিক শক্তির উপরই পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত। সত্য যে, তাঁকে জেহাদে অবতীর্ণ হতে হয়েছে, কিন্তু সে কেবল আত্মরক্ষার্থে ও সকল শান্তিপ্রচেষ্টা বার বার ব্যর্থ হওয়ার কারণে পরিস্থিতি তাঁকে রণক্ষেত্রে যেতে বাধ্য করেছে। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক, নবী মোহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধক্ষেত্রের পুরো চেহারাটাই বদ্‌লে দিয়েছিলেন। স্মরণ করতে পারি, সম্পূর্ণ আরব উপদ্বীপ ইসলামের পতাকাতলে আসা পর্যন্ত তাঁর সমগ্র জীবনে যত যুদ্ধ হয়েছে তাতে সর্বমোট হতাহতের সংখ্যা কয়েকশ'র অধিক নয়। এবং এই যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি বর্বর আরববাসীকে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে আবশ্যিকভাবে রীতিমত জামাতবদ্ধ হয়ে নামাজ পড়বার শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি যুদ্ধের ভয়াবহ প্রচণ্ডতার মধ্যেও দিনে পাঁচবার এই জামাতবদ্ধ নামাজ আদায়ের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে

www.pathagar.com

নি। একদল মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে যখন সেজদারত অন্যদল তখন শত্রুর মোকাবিলা করছেন; নামাজশেষে নামাজীরা যুদ্ধে যাচ্ছেন, আর যাঁরা ছিলেন যুদ্ধরত তাঁরা আসছেন নামাজে। কী বিস্ময়কর কল্পনাতীত এই দৃশ্য। অথচ এই সেই আরবদেশ যেখানে ভুলক্রমে এক গোত্রের একটি উট অপর গোত্রের চারণভূমিতে প্রবেশ করার মত তুচ্ছ কারণে পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন ভয়াবহ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, যা একাদিক্রমে চল্লিশ বছর ধরে চলে, যে যুদ্ধে সত্তর হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটার পরেও আক্রোশ প্রশমিত হয় না, এবং উভয় গোত্রেরই প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার মত অবস্থা হয়। ইসলামের নবী সেই আরববাসীকে সর্বোচ্চ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার এমন শিক্ষা দান করলেন, যার মহিমা এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও নামাজের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চরম বর্বরতার যুগে রণক্ষেত্র আলোকিত হয়ে ওঠে মানবিক মহিমায়। নবী মোহাম্মদ (সাঃ)এর কঠোর নির্দেশ : প্রতারণা করা যাবে না, বিশ্বাসভঙ্গ করা যাবে না, নিহত ব্যক্তির অঙ্গচ্ছেদ করা যাবে না। তাঁর নির্দেশ ঃ শিশু নারী ও বৃদ্ধদের হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, কোন ফলের গাছ বিনষ্ট কি কর্তন করা নিষিদ্ধ; নিষিদ্ধ, শত্রু হলেও প্রার্থনারত কোন ব্যক্তিকে আঘাত করা। নিকৃষ্টতম শত্রুর প্রতিও তাঁর নিজের আচরণ তাঁর অনুসারীদের জন্য এক অদৃষ্টপূর্ব মহত্তম দৃষ্টান্ত। মক্কাজয়ের পর তিনি ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত। এই সেই মক্কা নগরী যেখানে তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, তাঁর কথায় কেউ কণামাত্র কর্ণপাত করে নি; এই সেই মক্কা, যে নগর তাঁকে ও তাঁর অনুগামীদের উপর সীমাহীন অত্যাচার করেছে, তাড়িয়ে দিয়েছে, নির্দয়ভাবে বয়কট করেছে, এমনকি দু'শো মাইল দূরে গিয়েও তিনি রেহাই পান নি। সেই মক্কা আজ তাঁর পদতলে। যুদ্ধের নিয়মানুযায়ী তিনি সংগতভাবেই তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যা-কিছু শত্রুতা ও নির্দয়তা ও প্রতিহিংসা, আজ তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কী ব্যবহার তিনি প্রদর্শন করলেন? কোন প্রতিশোধ কি প্রতিহিংসা নয়, মোহাম্মদ (সাঃ)এর হৃদয় আজ মমতাপ্লুত ; তিনি ঘোষণা করলেন, 'তোমাদের কারো বিরুদ্ধে আজ আর কোন অভিযোগ নেই, তোমরা সবাই মুক্ত'। ঘোষণা করলেন, ' মানুষে মানুষে বিভেদ ও ঘৃণা আজ আমার এই দুটি পদতলে পিষ্ট ও বিনষ্ট হোক'। কোন সন্দেহ নেই, এই ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। তাই তিনি আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছানোমাত্র নিকৃষ্টতম শত্রুও তাঁর ক্ষমা ও মার্জনা লাভ করে। এমনকি যারা তাঁর প্রিয়তম পিতৃব্য হজরত হামজা (রাঃ)কে হত্যা করে তাঁর বক্ষপিঞ্জর ভেঙ্গে কলিজা চর্বণ করেছে, তারাও তাঁর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয় নি।

বিশ্বভ্রাতৃত্বের নীতি ও মানবসাম্যের যে মতবাদ তিনি ঘোষণা করেছিলেন, মানবতার বাস্তব ও সামাজিক উত্তরণে বিশ্বসভ্যতায় সে এক বিরাট অবদান। অবশ্য যে-কোন উল্লেখযোগ্য ধর্মই এই একই আদর্শবাদ ব্যক্ত করে, কিন্তু ইসলামের এই নবীর মধ্যেই কেবল আমরা তার প্রকৃত ও পরিপূর্ণ বাস্তব প্রয়োগ অবলোকন করি। এবং এই

www.pathagar.com

বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রয়োগের যে মূল্য ও মহত্ব, তা অবশ্যই স্বীকার্য, বিশেষ করে যখন আজ পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক বোধ জাগ্রত হচ্ছে, যখন বর্ণ গোত্রের সকল কুসংস্কার ও ভেদরেখার অবসানে আজ অস্তিত্বময় হয়ে উঠছে মহত্তর মানবিক ও ভ্রাতৃত্বচেতনা। এবং ইসলামের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মিস সরোজিনী নাইডু যথার্থই উল্লেখ করেন, 'ধর্ম হিসাবে ইসলামের মধ্যে গণতন্ত্রের সর্বপ্রথম উন্মেষ ও প্রচার ও রূপায়ণ। কারণ আজানের সঙ্গে সঙ্গে যখনই নামাজীরা মসজিদে এসে প্রত্যহ পাঁচবার সমবেত হন, তখন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এমন এক বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে, যেখানে রাজাপ্রজা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই কথা ঘোষণা করেন যে, একমাত্র আল্লাহই সকল মহত্বের অধিকারী'। ভারতবর্ষের এই বিশিষ্ট মহিলা কবি আরো বলেন, 'ইসলামের এই অবিচ্ছেদ্য ঐক্যবোধ অবলোকন করে আমি বার বার মুগ্ধ হই, কারণ এ এমন এক ঐক্য যা মানুষের মধ্যে সহজেই জাগিয়ে তোলে এক স্বতঃস্ফূর্ত ভ্রাতৃত্ববোধ। কেউ যখন লণ্ডনে কোন মিশরবাসী কি আলজিরীয়, ভারতীয় কি তুর্কী মুসলমানের সাক্ষাৎ পায়, সে বুঝতে পারে মাতৃভূমির বিভিন্নতায় কিছু এসে যায় না, সবাই মুসলমান, সবাই এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ'। মহাত্মা গান্ধী তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলেন, 'কে একজন একদা বলেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত ইয়োরোপীয়দের কাছে আতঙ্কের বস্তু ছিল ইসলামের আগমন, সেই ইসলাম যা স্পেনকে সুসভ্য করেছে, সেই ইসলাম যা মরক্কোতে বহন করে এনেছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা এবং পৃথিবীকে শুনিয়েছিল বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী। দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়রা ইসলামকে ভয় পেয়েছিল, পাওয়ারই কথা। কারণ তারা সাদা চামড়ার মানুষের মধ্যে সাম্য কি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবী করতে পারে, কিন্তু সর্বমানবিক ভ্রাতৃত্ব যদি পাপ হয় তারা একটু বেশিই ভীত হবে। এবং যদি সাম্যের অর্থ হয় সকল বর্ণ গোত্রের সাম্য, যা তাদের কাছে আতঙ্কজনক, তাহলে সন্দেহ নেই, তাদের আতঙ্ক বেশ শক্তভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত'।

পৃথিবী সাক্ষী, প্রতি বছর হজ্ব মৌসুমে ইসলামী সাম্যের কী বিস্ময়কর আন্তর্জাতিক দৃশ্যই না ফুটে ওঠে, যেখানে বর্ণ গোত্র ও মর্যাদার সকল ভেদরেখা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেবল ইয়োরোপীয়রা নয়, আফ্রিকান, আরবি, ইরানী, ভারতীয়, চৈনিক সবাই এক স্বর্গীয় পরিবারের সদস্য হিসাবে মিলিত, সবার একই পোষাক, দুই প্রস্থ সাদা সেলাইবিহীন কাপড়, একটি কোমর পেঁচিয়ে পরা ও অন্যটি কাঁধের উপর দিয়ে ছড়িয়ে রাখা, সম্পূর্ণরূপে সাজসজ্জাহীন নগ্ন মস্তক, মুখে একই উচ্চারণ, 'প্রভু আপনার আদেশ পালনার্থে আমি উপস্থিত। আপনি এক এবং অদ্বিতীয়, প্রভু, আমি উপস্থিত'। এইভাবেই সেখানে উচ্চনীচের কোন ভেদ আর অবশিষ্ট থাকে না। এবং তারপর সকল তীর্থযাত্রী, স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, সঙ্গে নিয়ে যান ইসলামের এক তাৎপর্যময় আন্তর্জাতিক মহিমা ও সৌরভ।

www.pathagar.com

প্রফেসর হার্গরোন্জ (Hurgronje) এর বিবেচনা মতে 'ইসলামের নবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (League of Nations) তা আন্তর্জাতিক ঐক্য এবং সর্বমানবিক ভ্রাতৃত্বকে এমন এক বৈশ্বিক ভিত্তিভূমির উপর দণ্ডায়মান করে, যা অন্য বহু জাতির কাছে আলোকবর্তিকা স্বরূপ'। এই অধ্যাপক আরো বলেন, 'আসলেই বহুজাতিক ঐক্যের যে বৈশ্বিক ধারণা ও উপলব্ধি ইসলাম উপহার দিয়েছে, তার তুল্য কোন উদাহরণ পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ইতিহাসে নেই। সন্দেহ নেই, গণতন্ত্রের যে সর্বোৎকৃষ্ট রূপ তা ইসলামের নবীই পৃথিবীকে প্রদর্শন করেছেন। খলিফা ওমর (রাঃ), মোহাম্মদ (সাঃ)এর জামাতা খলিফা আলি (রাঃ), খলিফা মনসুর, আব্বাস মামুনসহ বহু খলিফা এবং বাদশাহকে একজন সাধারণ অপরাধীর মত বিচারকের সম্মুখীন হয়ে ইসলামী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। আমাদের কারো অজানা নয়, আজকের দিনেও কালো নিগ্রোদের প্রতি সভ্য সাদা মানুষদের কী আচরণ। অথচ আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)এর সময়ে একজন নিগ্রো ক্রীতদাস হযরত বেলাল (রাঃ) কী মর্যাদা পেয়েছিলেন, তা স্মরণ করলে বিস্মিত হতে হয়। ইসলামের প্রথম যুগে মুয়াজ্জিনের কাজটা ছিল অতীব মর্যাদাপূর্ণ। এই সম্মান লাভ করেছিলেন হজরত বেলাল (রাঃ)। মক্কা বিজয়ের পর নবী মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁকে নামাজের জন্য আজান দিতে বললেন। কৃষ্ণবর্ণ পুরু ঠোঁটের এই নিগ্রো মানুষটি ইসলাম জগতের সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক ও পবিত্রতম কাবা শরীফের ছাদে গিয়ে যখন দাঁড়ালেন, কিছু গর্বিত আরব তখন আর্তনাদ করে উঠলো যে, 'কী নিদারুণ, কী বেদনাদায়ক। আজ এক কালো নিগ্রো ক্রীতদাস পবিত্র কাবাগৃহের ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আজান দেবার জন্য'! সেই মুহূর্তে মোহাম্মদ (সাঃ) কোরআন পাকের আয়াত থেকে ঘোষণা করলেন ঃ

'হে মানবজাতি,
নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে
বিভিন্ন পরিবার ও গোত্রে,
যাতে একে অপরকে তোমরা জানতে পারো।
নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে
সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত,
যে সর্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যবান।
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সুপরিজ্ঞাত।'

www.pathagar.com

এবং কোরআন শরীফের এই ক'টি মাত্র পংক্তি এতই শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল, সাধন করেছিল এমন মানসিক রূপান্তর যে, এমনকি ইসলামের খলিফারা পর্যন্ত, যাঁরা জন্মসূত্রে বিশুদ্ধ আরব, এই নিগ্রো দাসের হাতে নিজ কন্যা সম্প্রদান করতে আগ্রহী হন। এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আমিরুল মুমেনীন হজরত ওমর (রাঃ)ও এই নিগ্রো ক্রীতদাসের সঙ্গে দেখা হলেই, দাঁড়িয়ে এই বলে সশ্রদ্ধ স্বাগত জানান, 'আসুন, আমাদের সর্দার, আমাদের নেতা'। সমসাময়িক জগতে যে আরব ছিল সর্বাপেক্ষা আভিজাত্য-গর্বিত, কোরআন সেই আরবদের মধ্যে কি অলৌকিক পরিবর্তনই- না সাধন করেছিল! এই হেতুই জার্মানের শ্রেষ্ঠতম কবি গ্যেটে কোরআন শরীফ সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলেন, 'এ এমন এক গ্রন্থ যার মহিমময় প্রভাব ও অনুশীলন যুগ যুগ ধরে একইভাবে অব্যাহত থাকবে'। এবং বার্নার্ড শ বলেন, 'আগামী এক শতাব্দীর মধ্যে কোন একটি ধর্মের দ্বারা যদি ইংল্যাণ্ড তথা ইউরোপ শাসিত হবার ঘটনা ঘটে, সে ইসলাম'।

এবং ইসলামের এই একই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নারীজাতিকেও পুরুষের নিগড় থেকে মুক্তি দিয়েছিল। স্যার চার্লস আর্চিবাল্ড হ্যামিলটন বলেছেন, 'মানুষ যে জন্মগতভাবে নিষ্পাপ এই কথা ইসলামই শিখিয়েছে। ইসলামই বলেছে, নারী পুরুষ একই উপকরণ থেকে সৃষ্ট, উভয়ে একই আত্মার অধিকারী, কোন তারতম্য নেই উভয়ের মধ্যে। তারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ও মানসিক উৎকর্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে সমশক্তি ও যোগ্যতাসম্পন্ন। আরবজাতির একটা বড় ঐতিহ্য ছিল, যে-সন্তান অস্ত্রচালনায় দক্ষ সেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। কিন্তু ইসলামের আগমনেই দুর্বল নারীজাতির সুরক্ষার ব্যবস্থা হলো, এবং তারা লাভ করলো পিতামাতার সম্পদের উত্তরাধিকার। নারীদের যে সম্পদের মালিকানা, বহু শতাব্দী পূর্বে ইসলামই তা নিশ্চিত করেছে। এবং বিস্ময়কর, যে ইংল্যাণ্ড আজ গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলে অভিহিত, সেই ইংল্যাণ্ড মাত্র এক'শ বছর আগে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে ইসলামের এই আদর্শ রূপায়ণে 'বিবাহিত মহিলা বিধান' নামে একটি আইন পাশ করেছে। কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্বেই ইসলামের নবী (সাঃ) স্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছিলেন, 'পুরুষ ও নারী পরস্পরের পরিপূরক, একে অপরের অর্ধাংশ। অতীব পবিত্র নারীর অধিকার, লক্ষ রেখো তাদের জন্য সংরক্ষিত অধিকার যেন পূর্ণরূপে অক্ষত থাকে'।

রাজনীতি কি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ইসলামের যোগ খুব প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি ইসলাম নির্ধারণ করেছে, যা মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। প্রফেসর ম্যাসাইনন-এর মতে, ইসলাম দুই চরমতম বিপরীতের মধ্যে রচনা করে হিতকরী ভারসাম্য, এবং যে উন্নত চরিত্র সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ, তা গঠনে ইসলামের ভূমিকা খুবই সহায়ক। কিন্তু কী করে সম্ভব

www.pathagar.com

হয় এই লক্ষ্য অর্জন? সম্ভব হয় ইসলামের উত্তরাধিকার আইন ও বাধ্যতামূলক জাকাত-এর যে বিধান, তার ব্যত্যয়হীন প্রয়োগের মধ্য দিয়ে; এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব ধরনের অপতৎপরতা, যেমন একচেটিয়া বাজার, সুদ, পূর্বনির্ধারিত অনর্জিত আয় ও মুনাফা, কৃত্রিম অভাবসৃষ্টির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, এ-সব সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধকরণের মধ্য দিয়ে। ইসলামে জুয়া বেআইনী। অন্যদিকে স্কুল মসজিদ হাসপাতাল, পানীয়জলের ব্যবস্থা এতিমখানা, এ-সকল ক্ষেত্রে অর্থব্যয় ইসলামে অত্যন্ত উঁচুমানের পুণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত। মহানবী (সাঃ)এর শিক্ষার মধ্য দিয়েই এতিমখানার সর্বপ্রথম উদ্ভব। বস্তুত এতিমদের জন্য ব্যবস্থাপনার যে ধারণা, তা পৃথিবী এই নবী (সাঃ)এর নিকট থেকেই লাভ করেছে, যিনি নিজেও ছিলেন একজন এতীম। এই মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কার্লাইলের একটি বিখ্যাত উক্তি, 'যা কিছু উৎকৃষ্ট সেই সাম্য করুণা ও মানবতার এক স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, যেন প্রকৃতির মধ্য থেকে উঠে আসা সন্তানটির জবানে প্রকৃতিগতভাবেই উচ্চারিত'।

একদা এক ঐতিহাসিক বলেছিলেন, কোন মহামানবকে যদি বিচার করতে হয়, তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা করো। এক, তিনি কি তাঁর সমসাময়িক কালে পরিপূর্ণরূপে খাঁটি ও অকৃত্রিম বলে গৃহীত হয়েছেন? দুই, তিনি কি এতটা বড় ছিলেন যে তাঁর আপন সময়ে প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডের উর্ধে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন? এবং তিন, তিনি কি এমন কোন অবদান রেখে গেছেন যা পরবর্তী পৃথিবীর জন্য স্থায়ী সম্পদ? এই তালিকা আরো বাড়ানো যায় কিন্তু তা অনাবশ্যক। কারণ মহত্ব নিরূপণের এই তিনটি পরীক্ষাই যথেষ্ট, যা দিয়ে নবী মোহাম্মদ(সাঃ)এর শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করা সম্ভব। শেষোক্ত দু'টি বিষয়ে ইতোমধ্যেই কিছু আলোচনা হয়েছে; এখন প্রথম শর্তটির দিকে লক্ষ্য করি, নবী মোহাম্মদ (সাঃ) কি তাঁর সমসাময়িক জনগণের কাছে অকৃত্রিম ও খাঁটি বলে গৃহীত হয়েছেন? ঐতিহাসিক তথ্যাবলী থেকে এটা প্রমানিত, শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবাই একমত যে, মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন উৎকৃষ্টতম গুণাবলী ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর ছিল নিরঙ্কুশ সততা নিষ্কলুষ নির্মলতম চরিত্র, তিনি ছিলেন সর্ববিধ মহত্তম গুণের আধার, জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে পূর্ণতম বিশ্বস্ততার প্রতীক। এমনকি যারা তাঁর কথায় আদৌ বিশ্বাস করতো না, সেই ইহুদিরা পর্যন্ত তাঁর পূর্ণ পক্ষপাতহীনতার কারণে তাঁকেই নিজেদের যে-কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য বিচারক মেনে নিতো। এবং যারা তাঁর কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত করে নি, তারাও বলতে বাধ্য হয়েছে 'ওগো মোহাম্মদ, আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিনা, আমরা কেবল তাকে অস্বীকার করি, যে তোমাকে কেতাব দান করেছে এবং যে তোমাকে ওহি প্রেরণ করে'। আসলে তারা ভাবতো, তিনি ছিলেন কোন অশুভ ভূতগ্রস্ত। এবং তারা তাঁকে এই অশুভ আত্মার আচ্ছন্নতা থেকে নিরাময় করবার জন্যই নিপীড়নের আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু সেই তাদেরই শ্রেষ্ঠতম অংশ কিছু মানুষ তখনই অবলোকন করেছিলেন, মোহাম্মদ (সাঃ)এর মধ্য দিয়ে এক নতুন আলোর

www.pathagar.com

অভ্যুদয়, যে প্রভাত-আলোয় অবগাহন করবার জন্য দ্রুত ছুটে এসেছিলেন তাঁরা। এবং ইসলামের এই নবী মোহাম্মদ (সাঃ)এর জীবন ও ইতিহাসের এটা একটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তাঁর সেই নিকট আত্মীয়, ভাই বন্ধু পরিজন কেউই তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য কি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছুটে আসেন নি, এসেছিলেন তাঁর ঐশ্বরিক প্রেরণার যাথার্থ্য অনুভব করে। যদি এই সকল মানুষ, যাঁরা ছিলেন শিক্ষিত বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত, ছিলেন সর্বোপরি নবী-জীবনের সকল কিছু সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওয়াকিবহাল, তাঁদের চোখে সামান্যতম বিচ্যুতি চালাকি ফাঁকিবাজি, কিঞ্চিত্তম জাগতিক লোভ কি বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষুদ্রতম লক্ষণও ধরা পড়তো, মোহাম্মদ (সাঃ)এর যে- আশা, মানুষের মধ্যে নবজন্ম নবপ্রেরণার সঞ্চার ও আধ্যাত্মিক জাগরণের যে প্রচেষ্টা, সমাজ সংস্কারের যে কার্যক্রম, তা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো, তাঁর স্বপ্নসৌধ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়তো, সব কিছু ধূলিসাৎ হয়ে যেতো মুহূর্তের মধ্যে। অথচ কী দেখি আমরা? দেখি, তাঁর অনুগামীদের ভক্তি ও আনুগত্য এতই অপরিমেয় যে, তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আপনাপন জীবনের একমাত্র পরিচালক হিসাবে গ্রহণ করেছেন মোহাম্মদ (সাঃ)কে। সকল বিপদ ও নিগ্রহকে তাঁরা বরণ করে নিয়েছেন তাঁরই জন্য; অত্যাচারের কঠিনতম মূহূর্তে, শারীরিক-মানসিক পীড়নের দুঃসহতম অবস্থায়ও, এমনকি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে, তাঁরা তাঁদের আস্থায় ও শ্রদ্ধায় ও আনুগত্যে অটুট অবিচল। আর এইরকমই যদি হয়, ইতিহাস যদি এই কথাই বলে, তাহলে এটা কি সম্ভব যে, তাঁরা তাঁদের অধিনায়কের মধ্যে কখনো সামান্যতম স্খলনও লক্ষ করেছে। ইসলামে যাঁরা নবদীক্ষিত, সেই তাঁদের ইতিহাস যদি লক্ষ করি, দেখবো কী মর্মস্পর্শী দৃশ্য, কী নির্মমতম পীড়নই না জর্জরিত করেছে সেই সব নিরপরাধ-মানব-মানবীকে। সুমাইয়া (রাঃ) নাম্নী এক নির্দোষ মহিলা, তাকে বল্লমের আঘাতে আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। ইয়াসির (রাঃ) যাঁর দুটি পা দুই উটের সঙ্গে বেঁধে উট দুটিকে দুইদিকে তাড়া করা হলো। খাব্বাব (রাঃ)কে জ্বলন্ত কয়লার উপর শোয়ানো হয়েছে, তারপর অত্যাচারীরা তাঁর বুকের উপর এমন সজোরে পা তুলে দাঁড়িয়েছে যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন, তাঁর অগ্নিদগ্ধ পিঠের চামড়া ও চর্বি পুড়ে গলে গেছে। খাবান বিন আদীর (রাঃ) শরীরের মাংস কেটে কেটে এমন নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছে, যা লোমহর্ষক। এই অত্যাচারের এক পর্যায়ে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তুমি কি চাওনা, তোমার স্থলে মোহাম্মদকে এই শাস্তি প্রদান করা হোক'? খাবান (রাঃ) আর্তনাদ করে উঠলেন, 'অসম্ভব! মোহাম্মদ (সাঃ)কে রক্ষার জন্য আমি নিজে, আমার পরিবার, আমার সন্তান-সন্ততি সবকিছু হাসিমুখে উৎসর্গ করতে আমি বদ্ধপরিকর'। একটি দু'টি নয়, এ-রকম শত শত হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এই সকল ঘটনা কী প্রতিফলিত করে, কোন্ সত্য প্রমাণিত হয় এখানে? প্রমাণিত হয়, ইসলামের এই প্রথমকালের সন্তানেরা কেবল নিছক আনুগত্যই প্রকাশ করেন নি, মোহাম্মদ (সাঃ)

www.pathagar.com

এর পদপ্রান্তে তাঁরা তাঁদের সমগ্র প্রাণমন, হৃদয় আত্মা ও অন্তর নিঃশেষে উৎসর্গ করেছিলেন। অনুগামীদের এই-যে গভীর বিশ্বাস, এই-যে প্রস্তরকঠিন আস্থা, এ-থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন কত ঐকান্তিক ও বিশ্বস্ত, ছিলেন অর্পিত দায়িত্বের প্রতি কত সৎ ও নিষ্ঠাবান!

বলা বাহুল্য, এই সকল নবদীক্ষিতরা কেউই নিম্নবংশের কি নিম্নমানের ছিলেন না। ইসলমের সেই উন্মেষকালে যাঁরা মোহাম্মদ (সাঃ) এর পাশে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন মক্কার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সম্ভ্রান্ত মানুষ; অর্থ সম্মান ও সামাজিক অবস্থান, রুচি ও আভিজাত্যে তাঁরাই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং অনেকে তাঁর নিকট-আত্মীয়ও বটে, যাঁরা তাঁকে আদ্যোপান্ত আপাদমস্তক চিনতেন। উল্লেখযোগ্য, সুউচ্চ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইসলামের যে প্রথম চারজন খলীফা, তাঁরা সকলে এই সময়েরই মুসলমান। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে আছে, 'পৃথিবীর সকল নবী ও ধর্মবেত্তার মধ্যে মোহাম্মদ (সাঃ)ই সর্বাপেক্ষা সার্থক ও সফল'। এই উক্তি নিঃসন্দেহে যথাযথ। কিন্তু উল্লেখ করা আবশ্যক, এই সাফল্য কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। এই সাফল্যের প্রকৃত কারণ, তাঁর সমসাময়িক কালের মানুষ তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিল নিখাদ অকৃত্রিমতা ও খাঁটিত্ব। এই সাফল্য তাঁর উচ্চ-প্রশংসিত ও বিস্ময়কররূপে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বেরই ফসল। সত্যই কী অলৌকিক অসাধারণ ও বিস্ময়কর এই মোহাম্মদ (সাঃ) এর ব্যক্তিত্ব, যার সঠিক পরিচয় তুলে ধরা বাস্তবিকই অত্যন্ত দুরূহ। আমরা কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারি মাত্র, কিন্তু এটাই সমধিক সত্য যে, এই ব্যক্তিত্বের অতি সামান্যই কারো পক্ষে প্রতিফলিত করা সম্ভব। সত্যই তাঁর জীবন ও চরিত্রের মধ্যে কী নাটকীয় বহুবর্ণ দৃশ্যের সমাহার, জীবনের সর্ববিধ ঐশ্বর্যের কী চিত্রোপম সুষমা। একাধারে তিনি আল্লাহর সংবাদবাহী পয়গাম্বর, তিনি সেনাধ্যক্ষ, তিনি বাদশাহ, তিনি যোদ্ধা ব্যবসায়ী ও ধর্মপ্রচারক, তিনি বাগ্মী সমাজসংস্কারক, তিনি অসহায় এতীমের আশ্রয়স্থল, উৎপীড়িত ক্রীতদাসের রক্ষক, নারীসমাজের মুক্তিদাতা, তিনি আইনপ্রণেতা বিচারক ও জাগতিক মোহমুক্ত এক আধ্যাত্মিক তাপস। এবং আশ্চর্য, সকল ভূমিকা ও জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রেই তিনি সাফল্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক, এক অদ্বিতীয় মহানায়ক।

এতীম মানেই অসহায়ত্বের চূড়ান্ত, এই ভূপৃষ্টে এতীম অবস্থায়ই তাঁর জীবনের শুরু; বস্তুগত ক্ষমতার উচ্চতম শীর্ষ হলো বাদশাহী, এই বাদশাহী দিয়েই তাঁর জীবনের সমাপ্তি। এতীম বালক কি নশ্বর-জাগতিক সকল ক্ষেত্রেই মোহাম্মদ (সাঃ) একটি জাতির অবিসংবাদিত অধিনায়ক ও ভাগ্যনিয়ন্তা, যিনি সকল পরীক্ষা ও প্রলোভন, জীবনের সব উত্থান পতন ও পরিবর্তন, আতঙ্ক কি উজ্জ্বলতা সবকিছুর মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন জগৎসমক্ষে এক অনির্বাণ দীপশিখা; এবং তিনি বেরিয়ে এলেন বিজয়ীর বেশে সার্বিক মানবজীবনের অক্ষত অনাহত এক আদর্শরূপে। তাঁর সাফল্য জীবনের কোন একটি

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে কেবল সীমাবদ্ধ নয়, মানবজীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রেই তিনি অত্যুত্তম আদর্শ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিরঙ্কুশ নৈতিক অন্ধকার ও সর্বপ্লাবী বর্বরতা থেকে কোন জাতিকে মুক্ত ও পবিত্র করে তোলা যদি মহত্বের একটি পরিচয় বলে বিবেচিত হয়, তাহলে মোহাম্মদ (সাঃ) অবশ্যই মহৎ। কারণ তাঁর প্রখর ও অনবদ্য ব্যক্তিত্বের স্পর্শই আরবদেরকে অধঃপাতের নিম্নতম স্তর থেকে তুলে এনে পবিত্র পরিশুদ্ধ উন্নত এক মহান জাতিতে পরিণত করলো, যারা উঠে দাঁড়ালো গভীর অন্ধকূপ থেকে শিক্ষা ও সভ্যতার এক আলোকবর্তিকা হাতে। মহত্ব বলতে যদি একটি বহুধাবিভক্ত মানবমণ্ডলীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও করুণা, প্রেম ও সখ্যের বন্ধনে এক নিবিড় ঐক্যরচনা বোঝায়, উষর মরুভূমির বুকে আবির্ভূত এই নবী মোহাম্মদ (সাঃ) নিঃসন্দেহে মহত্বের মুকুট পরিধানের যোগ্য। মহত্বের অর্থ যদি হয় অন্ধ কুসংস্কার ও অহিতকর সকল কর্মধারার সমূল উৎখাত ও সংস্কারসাধন, তাহলে বলতেই হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তর থেকে তিনি নিঃশেষে উৎপাটন করেছিলেন এই কুসংস্কার, এই অলীক ও অতিপ্রাকৃতিক শঙ্কা। যদি বলি, মহত্ব এক উচ্চতর নৈতিক মান, তাহলেও স্মরণ করতে পারি, মোহাম্মদ (সাঃ) শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার কাছেই ছিলেন আল আমীন অর্থাৎ পরম বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। যদি ধরা যায়, দেশবিজয়ী কোন রাষ্ট্রনায়কই 'মহৎ' অভিধায় আখ্যায়িত হবার যোগ্য, তাহলে উল্লেখ করতে পারি, নিতান্তই করুণার পাত্র সহায় সম্বলহীন এতীম অবস্থা থেকে মোহাম্মদ (সাঃ) মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সমুদয় আরবের শাসনদণ্ডের অধিকর্তারূপে; যিনি ছিলেন যুগপৎ খসরু ও সিজরের যে-যোগফল তার সমতুল্য, যিনি এমন এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যা চৌদ্দশ বছর ধরে এখনো অক্ষত। নেতার প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য, তাকেও যদি মহত্বের অভিজ্ঞান বলে বিবেচনা করি, দেখবো এই নবীর নামের মধ্যেই কী ঐন্দ্রজালিক শক্তি ও মহিমা, যা আজো পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি হৃদয়কে সম্মোহিত ও অভিভূত করে রেখেছে। এই নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এথেন্স কি পারস্য, ভারতবর্ষ কি চীনের কোন বিদ্যাপীঠে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নি, কিন্তু কি বিস্ময়কর, তিনি যা ঘোষণা করলেন তা মানবজাতির জন্য অনন্তকালের প্রেক্ষাপটে চিরকল্যাণকর এক মহাসত্যের বাণী। নিরক্ষর, কিন্তু তাঁর বাকশৈলীতে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে এমন সৌরভ ও শিল্প ও বাগ্মিতা, যা শ্রোতার বিমুগ্ধ চোখ দুটিকে করে তোলে অশ্রুসজল। জাগতিকভাবে একেবারেই রিক্ত এক এতীম কিন্তু সকলেরই প্রিয়পাত্র, সবার প্রাণের মনিকোঠায় তাঁর স্থান। তিনি কোন সামরিক একাডেমীতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তাঁর সৈন্যদেরকে তিনি ভয়াবহতম অবস্থা, ক্রূরতম বৈরিতার বিরুদ্ধেও নিপুণ ও নির্ভুলভাবে সুবিন্যস্ত করতে জানেন; এবং তাঁর অধিনায়কত্বে শুধু নৈতিক শক্তি ও দৃঢ়তার কারণে জয়ও পুনঃ পুনঃ করায়ত্ত হয়।

মৌলিক প্রকৃতিদত্ত শক্তির অধিকারী এবং সর্বতোভাবে প্রতিভাবান, এমন প্রচারক পৃথিবীতে খুবই বিরল। হিটলারও তাঁর মেইন ক্যাম্পে এই একই অভিমত ব্যক্ত

www.pathagar.com

করেছেন। বলেছেন, 'বড় কোন তাত্ত্বিক খুব কমই একজন বড় মাপের নেতা হতে পারেন। বরং একজন আন্দোলনকারীর মধ্যেই এমন সব গুণ পরিদৃষ্ট হয়, যা তাকে একজন উৎকৃষ্ট নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কারণ নেতৃত্ব মানে জনগণকে আন্দোলিত ও চালনা করার শক্তি। অথচ তত্ত্বজ্ঞের মধ্যে সাধারণত নেতৃত্বদানের এই যোগ্যতার বিশেষ স্ফূরণ লক্ষ করা যায় না। তাই একই ব্যক্তির মধ্যে যুগপৎ তাত্ত্বিকতা, সাংগঠনিক শক্তি ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, এই তিনটি গুণের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে এমন মানুষ 'পৃথিবীতে দুর্লভতম; এবং একেই বলে মহত্ব'। ধরাপৃষ্ঠে বিচরণশীল একটি রক্তমাংসের মানুষ এই নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে পৃথিবী সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে এই দুর্লভতম মহত্ব। এবং আরো বেশি বিস্ময়কর, রেভারেণ্ড বসওয়ার্থ স্মিথ যা বলেন, 'তিনি ছিলেন একই সঙ্গে রাষ্ট্র এবং গীর্জা দুটোরই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, একই সঙ্গে সিজর এবং পোপ। কিন্তু পোপ হয়েও তিনি কখনো পোপের দাবী করেন নি; এবং তিনি সিজর বটে কিন্তু সম্পূর্ণ রিক্ত অনাড়ম্বর এক সিজর, যাঁর না ছিল কোন সদাপ্রস্তুত সৈন্যবাহিনী, না কোন দেহরক্ষী, না রাজপ্রাসাদ, না কোন নির্দিষ্ট বেতন ভাতা। কখনো কোথাও যদি এমন দাবী করবার মত কেউ থাকেন যে, তাঁর শাসন ও প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে এক অপার্থিব ঐশ্বরিক অধিকারপ্রসূত, তাহলে তিনি মোহাম্মদ (সাঃ)। কারণ ক্ষমতার সকল পার্থিব আনুষঙ্গিকতা ও ভিত্তি ও সহায়তা ছাড়াই তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। ক্ষমতার কোন আভরণ তাঁর প্রয়োজন নেই, ক্ষমতার সকল বাহ্যিক জৌলুষমুক্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরাভরণ; তাঁর ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক জীবন একই রকম অনাড়ম্বর সরলতার মধ্যে স্থাপিত ও আবর্তিত'।

মক্কাজয়ের পর দশলক্ষ বর্গমাইলেরও অধিক এক বিশাল এলাকা তাঁর পদানত, অথচ সমগ্র আরবের একচ্ছত্র অধিপতি এই নবী (সাঃ) নিজ হাতে নিজের জুতো ও মোটা পশমের কাপড় সেলাই করছেন, ছাগলের দুধ দোহন করছেন, ঘর ঝাড়ু দেয়া, আগুন জ্বালানো ইত্যাদি পরিবারের সব কাজই তিনি করছেন নিজ হাতে। যে মদীনায় তিনি বাস করেছেন, তাঁর জীবনের শেষ দিকে সেই মদীনা হয়ে উঠেছে বিপুলভাবে সম্পদশালী, সর্বত্রই ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। অথচ এমন প্রাচুর্যের মধ্যেও একাদিক্রমে অনেক দিন অনেক সপ্তাহ এই সম্রাটের গৃহে কোন উনুন জ্বলে নি, দিন অতিবাহিত হয়েছে শুধু শুকনো খেজুর আর পানি খেয়ে। তাঁর পরিজনদের উপর্যুপরি অনেক রাত কেটেছে খাদ্যাভাবে অনাহারে ক্ষুধার্ত অবস্থায়। তিনি কখনো নরম বিছানায় শয়ন করেন নি, তাঁর শয্যা ছিল খেজুর পাতার মাদুর। এবং ব্যস্ত পরিশ্রান্ত দিনের শেষে তিনি খুব কমই বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ রাত কেটে যেত নামাজে এবাদতে; আপন স্রষ্টার কাছে কেঁদে কেঁদে শুধু এই শক্তি ও সাহায্য প্রার্থনা করছেন, যাতে সুচারুভাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। এবং জানা যায়, তিনি স্রষ্টার কাছে কান্নায় এমনভাবে ভেঙে পড়তেন, কান্নার আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর এমনভাবে রুদ্ধ হয়ে যেত, যেন

www.pathagar.com

মনে হতো ফুটন্ত কোন জলপাত্র থেকে শব্দ উত্থিত হচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তিনি যেদিন মৃত্যুবরণ করলেন সেদিন তাঁর সম্পদ বলতে ছিল মাত্র কয়েকটি মুদ্রা, যার কিয়দংশ ঋণ পরিশোধে ও কিছু অংশ অভাবী লোকের মধ্যে বিতরণেই নিঃশেষ হয়ে যায়; যে কাপড় পরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেই কাপড় ছিল বহুস্থানে তালিযুক্ত। এবং যে গৃহ থেকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল আলো সেই গৃহ ছিল অন্ধকার, সেই গৃহে সেদিন তৈলাভাবে কোন প্রদীপ জ্বলে নি। অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু নবী (সাঃ) এর কোন পরিবর্তন নেই। জয়ে কি পরাজয়ে কি রিক্ততায়, সংকটে প্রাচুর্যে কি দারিদ্র্যে সর্বদা একই মানুষ, চরিত্রের একই প্রকাশ। সত্যই, ঈশ্বরের সকল নিয়ম ও বিধানের মত নবী পয়গম্বরেরাও অপরিবর্তনীয়।

কথা আছে, একজন সৎ মানুষ ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টি। মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সততার সর্বোচ্চ উদাহরণ। তিনি ছিলেন সর্বাংশে একজন মানুষ; মানবপ্রেম ও মানুষের জন্য করুণা ছিল তাঁর আত্মার সঙ্গীত। মানুষের সেবা, মহত্তর লক্ষ্যে মানুষের উত্তরণ, মানুষকে শিক্ষিত পূত পবিত্র করে তোলা, এক কথায় মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করাই ছিল তাঁর আদর্শ, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সমগ্র জীবনের লক্ষ্য। এবং কথায় ও কর্মে ও চিন্তায় সব কিছুতেই তাঁর যে মানব-কল্যাণকামিতা ও ব্রত, সে তাঁর আত্মা থেকে উৎসরিত প্রেরণা ও আত্মা - নির্দেশিত পথরেখারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি ছিলেন সর্বান্তঃ করণে সর্বাধিক অনাড়ম্বর ও স্বার্থশূন্য। কিন্তু কী পরিচয়ে তিনি আখ্যায়িত হতে চেয়েছেন? প্রথমে আল্লাহর একজন বান্দাহ (দাস) তারপর পয়গম্বর। এবং তিনি বলেন নি, তিনিই একমাত্র পয়গম্বর; বরং বলেছেন, জানা-অজানা আরো অনেক পয়গম্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এবং তাঁর এ-সকল কথা কোন একটিতে যদি কেউ অবিশ্বাস কি সন্দেহ পোষন করে, সে আর মুসলমানই থাকে না, এটা ঈমানেরই একটি অপরিহার্য শর্ত। একজন পশ্চিমী লেখক বলেছেন, 'সমসাময়িক অবস্থা এবং অনুগামীদের সীমাহীন শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দেখে বলা যায়, মোহাম্মদ (সাঃ) এর সর্বাপেক্ষা যে অলৌকিকত্ব, তাহলো তিনি কখনোই কোন অলৌকিক শক্তির দাবী করেন নি'। কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তা কাউকে আকৃষ্ট কি প্রভাবিত করার জন্য নয়; সে কৃতিত্ব সম্পূর্ণ আল্লাহর এবং তা আল্লাহরই কোন রহস্যময় প্রক্রিয়ার অধীন বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। তাঁর সরল ও সুস্পষ্ট ঘোষণা, তিনিও অন্য সকলের মত একজন মানুষ মাত্র। পৃথিবী কি স্বর্গের কোন ধনভাণ্ডার তাঁর হাতে নেই, এবং ভবিষ্যতের গর্ভে কী রহস্য লুক্কায়িত সে বিষয়ও তাঁর অজানা। এবং এসব কথা তিনি এমন এক সময়ে বলেছেন, যে-কালে অলৌকিকত্বের প্রতি বিশ্বাস ও দুর্বলতা একটি সাধারণ ঘটনা, যা এমনকি সাধারণ মানের সাধু পুরুষদেরও আয়ত্তাধীন বলে মানুষের ধারণা, এবং যে-কালে আরব ও আরবের বাইরে এমন পরিবেশ বিরাজমান, অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক বিশ্বাস যেখানে ঘনবদ্ধ। বরং তিনি তাঁর অনুগামীদের দৃষ্টি ও মনোযোগ ফিরিয়ে দিলেন

www.pathagar.com

প্রকৃতি ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের চর্চা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে, যাতে তাঁরা প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন ঈশ্বরের মহিমা। কোরআন পাক ঘোষণা করছে, 'আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা বর্তমান কিছুই তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করা হয় নি, সকল সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে এক পরম সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অনুধাবন করে না'। পৃথিবী অলীক ও অর্থহীন নয়; সৃষ্টির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত এক গভীর সত্য ও তাৎপর্য দ্বারা মণ্ডিত।

উল্লেখযোগ্য, পবিত্র কোরআন শরীফে প্রকৃতিবিজ্ঞানের চর্চা ও প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের দিকে আহবান জানিয়ে যত বাক্য নাজিল হয়েছে, তার সংখ্যা নামাজ রোজা হজ্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট বাক্যসমূহের যোগফল থেকে কয়েকগুণ বেশি। এবং এই প্রভাবহেতুই মুসলমানদের হাতে এমন এক বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার সূত্রপাত ঘটলো, যা গ্রীকদের নিকট ছিল অজ্ঞাত। ইবনে বাইতার নামে একজন মুসলিম উদ্ভিদবিজ্ঞানী পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে সংগৃহীত উদ্ভিদ নিয়ে এমন গ্রন্থ রচনা করেন যাকে অতুলনীয় বলে মেয়ার তাঁর Gesh der Botanicca-s' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে আলবিরুনী দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে দেশে দেশে ভ্রমণ করেন শুধু নানা প্রকার খনিজধাতুর নমুনা সংগ্রহের জন্য; এবং মুসলিম জ্যোতির্বিদরাও গবেষণাকর্মে যে দীর্ঘ অখণ্ড সময় ও শ্রম নিবেদন করেন তা স্মরণযোগ্য। অথচ এ্যারিস্টটল পদার্থবিজ্ঞানের উপর বই লিখেছিলেন, কিন্তু জীবনে তিনি একবারও কোন বিষয় পরীক্ষা করে দেখেন নি। তিনি প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়েও লিখেছেন, কিন্তু লিখেছেন খুবই অসতর্কভাবে; এইটুকু যাচাই করবার কষ্টও স্বীকার করেন নি যে, অন্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষের দন্তসংখ্যা সত্যই বেশি না কম। গ্যালেন, যিনি ধ্রুপদী শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত, বলেছিলেন মানুষের নীচের যে-চোয়াল তা দু'টি অস্থি দ্বারা গঠিত; এবং এই ধারণাই বহু শতাব্দী ধরে প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়ে আসছিল। কিন্তু আব্দুল লতীফ নামে একজন মুসলিম বিজ্ঞানী যখন নরকঙ্কাল নিয়ে সরাসরি পরীক্ষা করে দেখলেন, পৃথিবীর ভুল ভাঙ্গলো। এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত থেকে রবার্ট প্রিফল্ট তাঁর বিখ্যাত The Making of Humanity' গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আমাদের যে বিজ্ঞান, আরবদের কাছে তার ঋণ কেবল বিস্ময়কর কিছু আবিষ্কার ও বিপ্লবাত্মক তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সেই ঋণ আরো গভীর ও অপরিমেয়। বিজ্ঞান তার অস্তিত্বের প্রশ্নেই আরবদের কাছে ঋণী'। এবং এই রবার্ট প্রিফল্ট আরো বলেন - তত্ত্বীয় নিয়মমালা রচনা, নানা বিভাগে জ্ঞানের সুবিন্যাস ও শ্রেণীকরণ এ-সব গ্রীকদের অবদান, কিন্তু ক্লেশসাপেক্ষ অধ্যবসায়ী অনুসন্ধান, জ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপাদান সমূহের সংগ্রহ ও একত্রীকরণ, দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ-সবই ছিল গ্রীকদের স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলে আমরা যাকে বিজ্ঞান বলে জানি- পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার নবতর পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ,

www.pathagar.com

অঙ্কশাস্ত্রের উন্নয়ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে ইউরোপীয় আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ, তা গ্রীকদের অজ্ঞাত ছিল। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ইয়োরোপে বিজ্ঞানচর্চায় এই বোধ ও প্রবণতা, এই ধরনের গবেষণা-পদ্ধতি প্রথম সূচিত হয়েছে আরবদের দ্বারা। এবং মোহাম্মদ (সাঃ)এর শিক্ষাপ্রসূত এই একই বাস্তব চারিত্র্য, নবতর বিজ্ঞান-চেতনার যেমন জন্ম দিয়েছে তেমনি তথাকথিত পার্থিব ও প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মকেও নতুনভাবে মহিমান্বিত করেছে। কোরআন ঘোষণা করছে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর এবাদতের জন্য। কিন্তু ইসলামে এই 'এবাদত' কথাটি একটি বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত। এবাদত কেবল উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য ও মানবকল্যাণে কৃত সব কাজই এবাদত বলে গণ্য। ইসলাম মানুষের জীবন ও কর্মধারাকে অতি পবিত্র বলে ঘোষণা করে, যদি তা সুবিচার ও সততা ও সৎ নিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। পাপপুণ্যের যে বহু শতাব্দী-বাহিত ভেদরেখা ইসলাম তা মুছে দিয়েছে। কোরআন বলে, তুমি যদি হালাল খাদ্য খাও এবং আল্লাহর শোকর কর সেটাও এবাদত। মোহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস, কেউ যদি তার স্ত্রীর মুখে এক টুকরো খাবার তুলে দেয় সেটাও একটি পুণ্যের কাজ, আল্লাহ যার পুরস্কার প্রদান করবেন। অপর একটি বর্ণনামতে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি তার আপন অন্তরের আকাঙ্ক্ষা-বাসনাকে পূর্ণ করে, তার জন্যও সে পুরস্কৃত হবে; শর্ত এইটুকু যে তার ইচ্ছাপূরণের উপায় হবে বৈধ'। এই কথায় উপস্থিত একজন শ্রোতা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'হুজুর, সেই ব্যক্তি-তো আসলে প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ বাসনাকেই তৃপ্ত করলো।' সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মদ (সাঃ) জবাব দিলেন - 'মনের কোন কামনাকে অন্যায় পথে পূর্ণ করার জন্য কেউ যদি শাস্তি পায় তাহলে ন্যায় ও বৈধ পথে পূর্ণ করলে পুরস্কৃত হবে না কেন?' পার্থিব সংশ্রবশূন্যতা থেকে মুক্ত করে জীবনের মহিমাকে উচ্চে তুলে ধরার এই-যে ধর্মের এক নবতর ধারণা, এই ধারণাই সৃষ্টি করলো নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এক নয়া মেরুকরণ। প্রাত্যহিক ও পারস্পরিক মানবসম্পর্কের উপর ধর্মের এই-যে গভীর প্রভাব, সর্বমানবচিত্তের উপর তার এই-যে শক্তিশালী কার্যকারিতা, দায়িত্ব ও অধিকারবোধের এই-যে ধারণা ও সীমারেখা, এবং একই সঙ্গে, সুবিজ্ঞ দার্শনিক প্রাজ্ঞতা ও শিক্ষাদীক্ষাহীন অজ্ঞ মানসপট, উভয়ত একটি ধর্মের এই-যে একই রকম উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা, এটা ইসলামের এই নবী প্রবর্তিত শিক্ষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য এটাও বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, সৎকর্ম সমূহের উপর জোর ও গুরুত্ব প্রদানের যে-অর্থ, তা কিন্তু কোনক্রমেই বিশ্বাস বা ঈমানের শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেয় না। দেখতে পাই চিন্তার ক্ষেত্রে নানা ধরনের দার্শনিক মতবাদ। কোথাও কর্মের তুলনায় বিশ্বাসকেই বড় বলে বিবেচনা করা হয়, আবার কোথাও কর্মই বড়। কিন্তু ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, খাঁটি বিশ্বাস ও তদনুযায়ী সৎকর্মানুষ্ঠান, এই দুটোরই উপর। এখানে লক্ষ্য এবং অর্জনের পথ দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। দুইয়ে মিলে

www.pathagar.com

এটা এমন এক সুসংবদ্ধ ঐক্যের গ্রন্থনা, যা একত্রে খুবই প্রাণবান ও কার্যকর ও সমৃদ্ধি সঞ্চারক; কিন্তু পরস্পর-বিচ্ছিন্নতা মানেই উভয়ের ক্ষয় ও মৃত্যু। ইসলামে বিশ্বাস কখনো কর্ম থেকে আলাদা নয়। সঠিক ফলাফলের লক্ষ্যে সঠিক বিশ্বাস এখানে রূপলাভ করে সঠিক কর্মসাধনে। কোরআন শরীফে কত পুনঃ পুনঃই না ব্যক্ত হয়েছে এই কথা 'যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল একমাত্র তারাই প্রবেশ করবে জান্নাতে'। পঞ্চাশবারের কম নয়, পুনঃ পুনঃ এই একই কথার এমন পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যেন বিষয়টির প্রতি সম্যক গুরুত্বপ্রদানে ভুল না হয়। ধ্যাননিমগ্ন উপাসনাকে উৎসাহিত করা হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই উপাসনা কোন প্রকৃত লক্ষ্য কি গন্তব্য নয়। কর্মের সাথে সম্পর্কহীন কোন বিশ্বাসীর স্থান ইসলামে নেই; এবং যারা বিশ্বাসী অথচ অন্যায়কর্মে লিপ্ত, এমন ব্যক্তির কথা ইসলামে অচিন্তনীয়। কারণ ঐশ্বরিক যে বিধান, তা নিছক বিশ্বাস কি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা কার্যকারণের সাথে সম্পর্কিত। এই বিশ্বাস মানুষের অনন্তযাত্রায় এমন এক পথরেখা নির্দেশ করে, যেখানে জ্ঞান থেকে কর্ম এবং কর্ম থেকে সাফল্যের পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ সম্ভব হয়। কিন্তু কী সেই খাঁটি বিশ্বাস যা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক আমল (কর্ম) পূর্ণতম সাফল্যের দিকে ধাবিত হয়? ইসলামী বিশ্বাসের যে প্রাণকেন্দ্র তাহলো আল্লাহর একত্ব। এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, এই বিশ্বাসই কেন্দ্রবিন্দু, যা ইসলামের সকল শিক্ষা ও সাধনাকে ধারণ করে আছে। এবং তিনি (আল্লাহ) কেবল তাঁর ঐশ্বরিক ও অবিনশ্বর অস্তিত্বের কারণে নয়, উৎকৃষ্ট অনুপম গুণাবলীর কারণেও মহিমময়। এবং অন্য অনেক ক্ষেত্রে যেমন, আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কেও ইসলাম গ্রহণ করেছে সঠিক মধ্যপন্থা। আল্লাহর উৎকৃষ্ট ও মহত্তম গুণসমূহ বিস্মৃত থাকা যেমন ইসলাম অনুমোদন করে না, তেমনি অন্যদিকে এমন ধারণাও প্রত্যাখ্যান করে, যা তাঁকে বস্তুগত বিষয়বুদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। কোরআন একদিকে ঘোষণা করে, সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তুলনা হয় এমন কিছুই নেই এবং অন্যদিকে এইকথাও বলে যে, তিনি সর্বদর্শী ও সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। কিছুই নেই, যা তাঁর জানাশোনার বাইরে। তিনি এমন এক মহাসম্রাট যিনি সকল ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক। তাঁর অসীম ক্ষমতার অপরাজেয় জলপোত সততই সাম্য ও সুবিচারের মহাসমুদ্রে ভাসমান। তিনি করুণাময় ও দয়ালু; তিনিই সবার প্রতিপালক ও অভিভাবক। এবং আল্লাহ সম্পর্কে ইসলাম শুধু এই সকল ইতিবাচক বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না; বিপরীত দিক থেকেও ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইসলাম বলে, আল্লাহই একমাত্র অভিভাবক, তিনি ছাড়া কারো কোন অভিভাবক নেই; যে-কোন ধ্বংসের তিনিই একমাত্র সংশোধক ও ত্রাতা, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ত্রাতা কি মেরামতকারী নেই; সকল ক্ষতির তিনিই নিরাময়কারী এবং তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই যে ক্ষতি পূরণ করতে পারে। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনি অভাবমুক্ত, তিনি শরীর ও আত্মার সৃষ্টিকর্তা, বিচারদিবসের মহাপ্রভু, এক কথায় কোরআনের ভাষ্যানুযায়ী সকল মহত্তম উৎকৃষ্টতম

www.pathagar.com

গুণাবলীর তিনি আধার।

কিন্তু বিশ্বজগতের প্রেক্ষাপটে মানুষের কী অবস্থান? কী তার মর্যাদা ও পরিচয়? কোরআন বলে, 'বিশ্বজগতের যা-কিছু তা সবই মানুষের সেবায় নিয়োজিত।' সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানুষেরই শাসনাধীন। কিন্তু মানুষকে নিয়ে সৃষ্টিকর্তার কী অভিপ্রায়? এই প্রেক্ষিতে কোরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেন, 'হে মানুষ, আল্লাহ্ তোমাকে সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলীসহ সৃষ্টি করেছেন, দান করেছেন জীবন ও মৃত্যু, কিন্তু এ-সবই পরীক্ষার নিমিত্ত; দেখা হবে, কে সৎকর্মশীল আর কে পথভ্রষ্ট।' মানুষ যদিও কিছু পরিমাণে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী কিন্তু প্রত্যেকেরই জন্ম ও জীবন এমন একটি পূর্বনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পরিবেশের অধীন, যার উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এবং এই প্রেক্ষিতে ইসলামে দেখতে পাই, আল্লাহর ঘোষণা হলো — সবকিছু আমার ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণাধীন, আমি যা ভালো মনে করি সেটাই মানুষের নির্বন্ধ। মানুষের অস্থায়ী নশ্বরতার সঙ্গে মিলিয়ে এই মহাজাগতিক রহস্যময় পরিকল্পনা পুরোপুরি উপলব্ধি করা কঠিন, কিন্তু এটা সত্য যে, সম্পদে কি দারিদ্র্যে, স্বাস্থ্যে কি রুগ্নতায়, উত্থানে-পতনে আমি অবশ্যই মানুষকে পরীক্ষা করে দেখবো। নানা সময়ে নানা মানুষে এই পরীক্ষার ধরন ভিন্ন কিন্তু কোন সংকটেই তোমরা অধৈর্য কি হতাশাগ্রস্ত হয়ো না এবং অবলম্বন করো না কোন অবৈধ পন্থা। এটা এক ক্রান্তিকাল। ঐশ্বর্যে তোমরা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়ো না; মনে রেখো, আল্লাহর সকল নেয়ামতের তোমরা বিশ্বস্ত আমানতদার। তোমরা সততই পরীক্ষাধীন; প্রতিটি মুহূর্তে চলছে তোমাদের পরীক্ষা। পার্থিব জীবনের এই নশ্বর অধ্যায়ে এই পরীক্ষার কোন ছেদ নেই, এবং এমন প্রশ্ন উত্থাপনের কোন অবকাশ নেই যে, কেন এই পরীক্ষা? মনে রেখো, তোমার জীবন ও মৃত্যু আল্লাহরই জন্য।

অবশ্য কেউ কেউ এটাকে অদৃষ্টবাদ বলতে পারে। কিন্তু এই ধরনের অদৃষ্টবাদ মানুষের জন্য শক্তিবর্ধক ও কর্মোদ্দীপক এবং সর্বদা সতর্কতা রক্ষারও সহায়ক। পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবন মানব-অস্তিত্বের শেষ কথা নয়; মৃত্যুর পর অন্য এক অনন্ত জীবন অপেক্ষমান। এই জীবন এই মৃত্যু একটি দ্বার, একটি মধ্যবর্তী যোজক মাত্র, যা অনন্ত জীবনের এক অদৃশ্য বাস্তবতাকে উন্মোচন করে। যত ক্ষুদ্র কি তুচ্ছই হোক প্রতিটি কর্মই রচনা করে এক-একটি স্থায়ী অভিঘাত; এবং এই কর্মের সঠিক হিসাবও কোন-না কোন উপায়ে নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত। আল্লাহর রহস্যময় প্রক্রিয়ার কিছু সামান্য বুঝা গেলেও অধিকাংশই মানব বুদ্ধির অগম্য। আজ যা-কিছু মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখা হয়েছে তা সবই একদিন উন্মোচিত হবে। এবং তখন যারা পুণ্যবান তারা আল্লাহপাকের এমন করুণা ও পুরস্কার লাভে ধন্য হবে, যা কোন চক্ষু কখনো দর্শন করে নি, কোন কর্ণ কখনো শ্রবণ করে নি এবং কোন হৃদয়ও কখনো কল্পনা করে নি। তারাই পর্যায়ক্রমে উত্তীর্ণ হবে উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থানে। কিন্তু জীবনে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে

www.pathagar.com

যারা ব্যর্থ হয়েছে, এক অনিবার্য নিয়মে তারা তাদের প্রতিফল পাবে; তারা এমন এক কঠিন আত্মিক শাস্তির মধ্যে নিপতিত হবে, যা তাদেরই নিজস্ব উপার্জন। এ-এক ভয়াবহতম অগ্নিপরীক্ষা। দৈহিক যন্ত্রণা তবুতো কোনভাবে সহনীয় কিন্তু আত্মিক যন্ত্রণা অসহ্য। যে ইচ্ছা ও প্রবণতা অন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত করে, প্রলুব্ধ করে, তার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের জন্যই এই জীবন। এবং এই পথেই জেগে ওঠে জাগতিক মোহমুক্ত বিবেকের উপলব্ধি; এই পর্যায়েই আত্মা তার পারমার্থিক উৎকর্ষতা লাভের জন্য হয়ে ওঠে ব্যাকুল ও সর্বপ্রকার আত্মবিনাশী অপশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। এবং এইভাবেই সেই চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তরণ, যেখানে আত্মা লাভ করে অবিচল স্থৈর্য, স্রষ্টার তৃপ্তিময় নৈকট্য, অনন্ত আলোকময় শান্তি। আত্মার সম্মুখে আর কোন প্রতিরোধ নেই, সংগ্রামের দিন শেষ; সত্য হয়েছে জয়ী, মিথ্যা পরাভূত। সকল সংকট ও জটিলতা ও আত্মবিভক্তির অবসান। মানুষের সম্পূর্ণ সত্তা আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পিত, পরম আনুগত্যের মধ্যে বিলীন ও একাকার। সমস্ত সংগুপ্ত শক্তির উন্মোচন, আত্মার স্থিতি তখন এক পরম শান্তির আলয়ে। আল্লাহ তখন বলবেন, 'হে পুণ্যাত্মাগণ, এই সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তনের এই সেই পূর্ণতম শান্তি ও পরিতৃপ্তি। তোমরা আজ আনন্দিত, তোমাদের প্রভুও সন্তুষ্ট, আমার অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং প্রবেশ করো জান্নাতে'। মানবজীবনের এই হলো চূড়ান্ত গন্তব্য। একদিকে বিশ্বজগতের উপর তার আধিপত্য অন্যদিকে মহাপ্রভুর নৈকট্যের মধ্যে তার স্থিতি ও প্রশান্তি। এই পর্যায়ে প্রভুর সন্নিধানে সেও আনন্দিত প্রভুও আনন্দিত। এখানেই পরিতৃপ্তি, পূর্ণতম পরিতৃপ্তি; প্রশান্তি, পূর্ণতম প্রশান্তি। এবং এই পর্যায়ে স্রষ্টার প্রতি প্রেমই তার আত্মার খাদ্য; এবং জীবনের গভীরতম স্তর থেকে উৎসরিত সলিল তার তৃষ্ণা-নিবারক পানীয়। দুঃখ কি পরাজয় তাকে আর বিচলিত করে না এবং সাফল্য করে না গর্বিত কি উল্লসিত। বলতে হয়, পশ্চিমা জাতিসমূহ আজ শুধু মহাজাগতিক প্রভুত্ববিস্তারে সচেষ্ট কিন্তু তাদের আত্মা বড় অস্থির ও অশান্ত ও তৃপ্তিহীন। এবং ইসলাম প্রদর্শিত জীবনের এই দার্শনিকতায় অভিভূত টমাস কার্লাইল লিখেছেন, 'এবং তারপরও ইসলাম, স্রষ্টার কাছে আমাদের সবাইকে সমর্পণ করতেই হবে, আমাদের সমস্ত শক্তি তাঁরই চরণে নিবেদিত। মৃত্যু হোক কি মৃত্যুর চেয়েও গুরুতর কিছু হোক, তিনি যা করেন, আমাদের জন্য যা প্রেরণ করেন, তা সবই কল্যাণকর ও উত্তম। স্রষ্টার পদপ্রান্তে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করাই আমাদের কাজ'। এই লেখক একই সঙ্গে আরো উল্লেখ করেন - 'গ্যেটে যে-কথা বলেছেন, একে যদি ইসলাম বলে, আমরা কি সবাই ইসলামের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েই বেঁচে নেই'? গ্যেটের এই প্রশ্নের জবাবে কার্লাইল নিজেই আবার বলেন, 'অবশ্যই। কোন সন্দেহ নেই, আমাদের জীবন ইসলামের মধ্যেই নিমজ্জিত ও পরিক্রমারত। এবং এই মানব-অধ্যুষিত ধরাপৃষ্ঠে স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ ও প্রকাশিত যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, এখনো পর্যন্ত ইসলামই তার সর্বোচ্চ শীর্ষদেশ'।

www.pathagar.com